ম্যাহ্‌ফিল

কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়



দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৩৬৭

প্রচ্ছদ : ডাটা পয়েন্ট

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
বর্ণ-সংস্থাপনা : দিলীপ দে। লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্‌স
১৫৭বি মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬
মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

আমার কঠোরতম সমালোচক
শ্রীমতী রমলা মুখোপাধ্যায়কে

প্রথম পরিচ্ছেদ

বছর কয়েক হলো সত্তর পার হয়েছি। সত্তরের চৌকাঠ ডিঙোনোর পর থেকেই দেখছি কিছু বারোয়ারি বায়নার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এক নম্বর, গান নয়, যত্রতত্র বক্তৃতা দেবার নেমন্তন্ন। তার বেশিরভাগই ছোট বড় সংগীতসভায় যেখানে গানবাজনার আগে আমজনতা অন্তহীন ভ্যাজর ভ্যাজর শুনতে অনভ্যস্ত। এ সব সভায় পাওনা একটি মিষ্টির বাক্স, একটি বাসি ফুলের মালা, খুব জোর ধুতি ও আটগজি একটি বাটিকের চাদর। এ সব স্থানে নিজের তেল পুড়িয়ে যাওয়াই সমীচীন কারণ ফেরত পাঠাবার ব্যাপারে কর্মকর্তারা উদাসীন। দু নম্বর তাগিদ আসছে লেখার জন্য। বইয়ের স্টলগুলোতে আজকাল নানা আকারের ইংরেজি বাংলা রঙবেরঙের সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও শারদীয় সংখ্যার ছড়াছড়ি। তাদের পাতা ভরাবার দায়িত্ব যে সব লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের হাতে তাঁদের হেভি বুকিং, অতএব আমাদের মত চুনোপুঁটিদেরও ঘনঘন ডাক পড়ছে। যদি বলি বিষয়বস্তু খুঁজে পাই না, কিছু বক্তব্য না থাকলে লেখা আমার আসে না কারণ, ফেনিয়ে গল্প উপন্যাস লেখার ক্ষমতা আমার নেই, তখন তাঁরা উপদেশ দেন, 'কেন? সেকালের সংগীতের জলসা আর আজকালকার গানবাজনা নিয়ে লিখুন। ও সব তো আপনার বাঁ হাতের খেলা।' নতুনরা যে পুরাতনকে চিরকালই অবজ্ঞা করে সেও তাঁদের জানা। বিড়বিড় করে আমাদের মতো বুড়ো হাবড়াদের 'নস্‌ট্যালজিক ওল্‌ড ফুলস্‌' আখ্যা দিয়ে থাকে, সেও তাঁদের অবিদিত নয়। কেউ কেউ আমাকে সেই এক ঘড়িওয়ালা ছিল তাঁর সঙ্গে তুলনা করেন যে ঘুরেফিরে সেই ঘড়িরই গল্প করত। আর সত্যিকথা কি সম্পাদকের কাছে যে প্রকারের চিঠিপত্র আসে এবং ছাপা হয়, তাতে আমারও বদ্ধমূল ধারণা যে যাঁরা অজন্তা দেওয়াল ঘড়ি ও টাইমেক্স

রিস্টওয়াচের কারবার করেন তাঁদের চতুর্দশ লুইয়ের আমলের 'অর্মলু ক্লকে'র বিবরণ শোনানো নেহাতই আহাম্মকি। বার্নাড শ বেশ কয়েক বছর ড্রামা ক্রিটিক ছিলেন এবং যথারীতি প্রচুর শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি করে অবশেষে এক পাতার একটি ভ্যালেডিক্টরি লেখেন, তার শেষ সেনটেন্সটি ছিল 'দা সাবজেক্ট ইজ্ এগ্জস্টেড, সো অ্যাম আই।'

আমার বাল্যকালের সহপাঠী নীরেন চক্কোত্তি, বেশ কিছুকাল 'পদ্য' লিখে নাম করেছে। সেদিন উপদেশ দিল আত্মজীবনী লিখতে। পঞ্চাশের দশকে আমাদের সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর কফি হাউসের আড্ডায় কমলকুমার মজুমদার এক বামপন্থী যুবকের খবর দিয়েছিলেন যে নাকি স্ট্রাগ্ল করবে বলে সিঁড়ির তলায় ঘর ভাড়া করেছিল। কমলবাবুর মতে সেটা নাকি অটোবায়োগ্রাফি লেখার প্যাঁচ। এবংবিধ নাটকীয় ঘটনা আমার জীবনে কখনো ঘটেনি, আর উত্তরাধিকার সূত্রে যে সব বিখ্যাত লোকেদের সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠতা অর্জন করেছি তা ন্যা রং চড়িয়ে লিখলেও পাঠকরা নেম ড্রপিং-এর অপবাদ দেবেন। সত্যের খাতিরে আমি নিরুপায়, কারণ আমার মতো ছোটখাটো মনিষ্যিও কপালজোরে বিরাট বিরাট লোকেদের সংস্পর্শে আসতে পারে, এও হয়ে থাকে।

মনে পড়ে চার বছর বয়সে লখনউ-এ অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে 'রবিবাবু, একটা কবিতা বলুন না' বলে উত্যক্ত করে তাঁর কোল ঘেঁসে 'পঞ্চনদীর তীরে' আবৃত্তি শুনেছি। শরৎ চাটুজ্যের কাছে প্লেগে মরা বর্মি ভূতের গল্প শুনেছি। আর একবার বালিগঞ্জে আমার পৈতৃক বাড়িতে এমনই এক সাপের গল্প উনি জুড়লেন যে কিছুক্ষণের মধ্যেই চার-পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রোতারা সোফার ওপর পা গুটিয়ে বসলেন। প্রমথ চৌধুরী, সেই অসাধারণ ব্রিলিয়ান্ট মানুষটির তখন জরাজীর্ণ অবস্থা। একে মৃদুস্বরে কথা বলতেন, তায় অর্ধেক কথা কিছুটা জড়ানো। তার অর্থ উদ্ধার করতে বাল্যকালে আমাকে সমূহ বেগ পেতে হত। বাইরে গেটের সামনে মস্ত হুডওয়ালা গাড়ি পার্ক করে ওঁর ড্রাইভার মাখনবাবু (ইনি নাকি সম্পর্কে বঙ্কিম চাটুজ্যের কী রকম যেন নাতি হতেন) বেল দিলে আমার মা বা কাকা বিমলাপ্রসাদ আমাকেই পাঠিয়ে দিতেন। 'যা গাড়িতে বসে বুড়োর কথা শোন্। আমার দ্বারা হবে না।' ভাবতে কষ্ট হয় সেই এককালীন চৌকস অতি ধারালো বিদগ্ধ 'বীরবলের' কী দশা!

মনে পড়ছে আলিগড়ে আমার বাবা চেয়ারম্যান হয়ে যাওয়ার পর আমার মার হাতের তৈরি সন্দেশ খেয়ে ডাঃ জাকির হুসেনের শায়েরি মারফত অকুণ্ঠ প্রশংসা। উনি যখন বিহারের গভর্নর হয়ে এলেন তখন আমি এন সি ডি সি অর্থাৎ ন্যাশনাল কোল ডেভেলপ্মেন্ট কর্পোরেশনের চাকুরে। আমার একটি সহকর্মী চীফ মাইনিং এন্জিনিয়ার বি. এল. ওরি ওঁর হাত দেখে বলেছিল 'আপনি ভাইস

প্রেসিডেন্ট হবেন।' উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার পর আবার ওরি ওঁকে বলেন 'আপনার রাষ্ট্রপতি হওয়া কে ঠেকায়!' যখন রাষ্ট্রপতি হলেন তখন ওরি রাঁচি ক্লাবে আমাদের বললেন 'এর ওপর আর কোনো পোস্ট নেই, এর ওপরে উঠতে হলে জাকির সাহেবকে বেহেশ্‌তে যেতে হয়।' এ আলোচনার কিছুকাল পরেই জাকির সাহেব পরলোকগমন করেন।

রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন ওঁর প্রাসাদে একাধিক জলসায় গেছি। একবার নয়না দেবীর উদ্যোগে 'শাম্‌ এ গজল' হলো রাষ্ট্রপতি ভবনে। হাফিজ্‌ আহ্‌মদ গাইলেন, হিলাল আহ্‌মদ গাইলেন, গাইলেন নয়না দেবীও। শেষে বম্বে ফিল্‌মস্‌-এর সুরকার, দিল্লি রেডিওর লাইট মিউজিকের চীফ প্রোডিউসার অনিল বিশ্বাস বসলেন। অনিলদা পুরাতনী বাংলা গান ও কীর্তন অসম্ভব ভাল গাইতেন। ইদানীং গজলও। সেদিন উনি জাকির সাহেবকে ইম্‌প্রেস করার উদ্দেশ্যে এক ফার্সি গজল গাইলেন। তার আগে আমাদের সিনিয়র এক বন্ধু নকী বিলগ্রামীকে ধরে উনি মহড়া দিয়ে ফার্সি উচ্চারণ দোরস্ত করে নিয়েছিলেন। গানের শেষে জাকির সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হলো ওঁর কী রকম লাগল ফার্সি গজল। উনি বললেন 'ওটা ফার্সিতে গজল গাওয়া হয়েছিল নাকি? হবেও বা। আমার প্রচণ্ড সর্দিতে কানে তালা ধরেছিল, কিছুই বুঝতে পারিনি।' আমাকে আলাদা ডেকে আমার সদ্যপ্রয়াত পিতার সম্পর্কে অনেক দুঃখ করে বললেন 'আমার জীবনে আমি ডি. পি-র মত ইন্‌সাইসিভ্‌ এনসাইক্লোপিডিক মাইন্ড দেখিনি। ওঁর লাইব্রেরিটা আলিগড় ইউনিভার্সিটিকে দান কোরো।' সে কথা শুনিনি। বছর পঁয়ত্রিশ বইগুলি আগলে আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থনীতি, মার্কস্‌ইজম্‌, সমাজতত্ত্ব ও দর্শনের অধিকাংশ বই দান করেছি।* যতদূর জানি সে সব অবহেলিত অবস্থায় পড়ে মার খাচ্ছে। উত্তরাধিকার সূত্রে বই কেনার অভ্যাস আমারও বাল্যকাল থেকে। যা আছে তার কী গতি হবে আমরা চোখ বুজলে, ভেবে পাই না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল সৈয়দ নুরুল হাসান পঞ্চাশের দশকে আলিগড়ে ইতিহাসের অধ্যাপক। দিল্লিতে দেখা হল। বললেন 'লখনউ থেকে দিল্লি যাচ্ছিলাম প্লেনে। আমার ঠিক সামনের সীট দুটিতে বসেছেন আমার দেখা দুজন শ্রেষ্ঠ ভাইস-চ্যান্‌সেলার। তাঁদের কথোপকথনের বিষয়বস্তু ডি. পি. মুখার্জি। তোমার বাবাকে নিয়ে দুজনের টাগ অফ ওয়ার চলছে।' শেষ অবধি জাকির সাহেবেরই জিৎ হলো। হারলেন লখনউ-এর আচার্য নরেন্দ্র দেব। ১৯৫৬ সালে

* প্রকাশকের টীকা। 'ঝিলিমিলি'তে আছে একশো বাদে এক হাজার ইকনমিক্‌স-এর বই ধূর্জটিপ্রসাদ আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। দ্র. 'ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী', ৩য় খণ্ড, ২য় সম্ভার, পৃ. ২৩৮ : দে'জ পাবলিশিং।

ধূর্জটিপ্রসাদ ফিরলেন ল্যারিংক্সে ক্যান্সার অপারেশন করিয়ে। শরীর খুবই দুর্বল, গলার স্বরও অর্ধেক হয়ে গেছে। উনি পদত্যাগ পত্র পাঠিয়েছিলেন। অ্যাকাডেমিক কাউনসিলে জাকির হুসেন বলেন যতদিন ডি. পি. জীবিত আছেন উনি আলিগড়েই থাকবেন। ওঁর পড়াবার দরকার নেই। উনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অলংকার স্বরূপ।

আমার দেখা আর এক বিখ্যাত ভাইস-চ্যান্সেলার বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ্, পরে ইনিও রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। বার দুয়েক ওঁকে কাছে পেয়েছিলাম আর শুনেছিলাম প্যাসকালের ওপর ওঁর অসাধারণ বক্তৃতা। পর পর দুদিনের বক্তৃতায় একটি কথাও ওঁকে মুহূর্তের জন্য অন্বেষণ করতে হয়নি। ইংরেজি বলার সময়ে মা সরস্বতী মেম হয়ে ওঁর জিহ্বায় ভর করতেন। আর এই বক্তৃতায় গভীরতা ছিল অসাধারণ যেটা 'কর্তা'দের মতে নাকি সাধারণত পাওয়া যেত না।

আমাদের লখনউ ইউনিভার্সিটিতে আমার সময়ে একাধিক রদ্দি উপাচার্যের দর্শন হয়েছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ইঁট, কাঠ, তৎকালীন যুক্তপ্রদেশের নবাব-তালুকদারদের পয়সায় কেনা, অতএব সেইরকমই ভাইস-চ্যান্সেলার মনোনীত হতেন। শেখ হবিবুল্লা অনবরত ভুল ইংরেজি বলতেন, সেই কারণে সাহেবসুবোদের প্রিয়পাত্র ছিলেন। (লালমুখো চ্যান্সেলার অর্থাৎ গভর্নর সাহেব একদিন সকালে রাইডিং করে গলদঘর্ম অবস্থায় ফিরেছেন। হবিবুল্লা একগাল হেসে বলেছিলেন 'ইওর এক্সেলেন্সি ইজ্ লুকিং ব্লাডি')। যাঁর কাছ থেকে আমি বি. এ এবং এম. এ ডিগ্রি হাত পেতে নিই, তাঁর নাম ছিল রাজা বিশ্বেশ্বর দয়াল শেঠ। কন্‌ভোকেশনে ডিগ্রি দেওয়ার সময়ে তাঁকে বলতে হত 'বাই, ভার্চু অফ্ দা অথরিটি ভেস্টেড্ ইন মি, আই কন্‌ফার অন ইউ' ইত্যাদি। মাইক্রোফোনে ভেস্টেড্ কথাটি ওঁর উচ্চারণে 'ওয়েস্টেড' শোনাত। আমার শৈশবে ইউনিভার্সিটির প্রায় প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর নাম করা বাঙালি আর ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন জ্ঞান চক্রবর্তী, প্রচণ্ড সাহেব। এঁরই স্ত্রী পরে মেমসাহেবিয়ানা পরিত্যাগ করে আলমোড়া জেলার মিরতোলা আশ্রমের 'যশোদা মা' নামে খ্যাত হন। লখনউ মেডিকাল কলেজের ডাঃ অ্যালেকজাণ্ডার ও ইউনিভার্সিটির রীডার নিক্সনও কাজ ছেড়ে এই আশ্রমবাসী হন। 'আঙ্কল্' নিক্সনের নতুন নাম হয় কৃষ্ণপ্রেম। পরেও যখন আসতেন আমাদের লখনউ-এর বাড়িতে তখন উনি মুণ্ডিতমস্তক ও গেরুয়াধারী, তামাক ও পাইপটি কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত পরিত্যাগ করেননি।

জ্ঞান চক্রবর্তীর সাহেবিয়ানার একটি গল্প মনে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ লখনউএ প্রোফেসর নির্মল সিদ্ধান্তর বাড়িতে উঠেছেন এ খবর শুনে ভাইস-চ্যান্সেলার

সাহেব একটি ফর্মাল ডিনারের আয়োজন করেন এবং সে ডিনারে সম্মানিত অতিথি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নন, যুক্তপ্রদেশের সাহেব গভর্নর এবং ইউনিভার্সিটির চ্যান্‌সেলার। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছিলেন এবং নির্মলকাকা ও আমার বাবার সামনে প্রচণ্ড উষ্মা প্রকাশ করেন। 'আমি বার্লিনে ক্যায়জারের ডান পাশে বসে খেয়ে এসেছি আর এই ব্যাটা হুইলার (চক্রবর্তী) আজ টেবিলে আমায় বসাল কিনা তার বাঁয়ে।' বাবা বলতেন জীবনে একবারই উনি ওঁর (রবিবাবুর) ইগোর এবংবিধ বিস্ফোরক বহিঃপ্রকাশের নিদর্শন পেয়েছেন।

লখনউ ইউনিভার্সিটির কয়েক যুগের আকালের সমাপ্তি ঘটল যখন আচার্য নরেন্দ্র দেব উপাচার্যের পদে এলেন (তখন আমি পাশ করে কলকাতায় চাকরি করছি), ছুটিতে বাবার কাছে লখনউ গেলে ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হত। পণ্ডিত মানুষ ছিলেন এবং ওঁর স্পেশালাইজেশন ছিল মহাযান বৌদ্ধধর্ম। লোকে ওঁকে জানে দেশ স্বাধীন হওয়ার পুর্বে কংগ্রেসের একজন বড় নেতা হিসেবে। শুনেছি মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছে ছিল উনি প্রথম রাষ্ট্রপতি হন এবং ভাইসরয়েব বাসভবন পরিত্যাগ করে সাধারণ একটি বাড়িতে থেকে স্বাধীন ভারতের এক নম্বর নাগরিকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। আচার্য কংগ্রেস ছেড়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রামমনোহর লোহিয়ার সঙ্গে যোগ দেন। নেহরুর অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো আপস করেননি।

মনে আরও পড়ছে বারো বছর বয়সে পণ্ডিত নেহরুর উপস্থিতিতে চায়ের পেয়ালায় চামচ দিয়ে অন্যমনস্ক চিনি নাড়ার জন্য 'কিয়া কর্ রহে হ্যাঁয় আপ? ভাঙ ঘোঁট রহেঁ হ্যাঁয় কিয়া?' বলে ধমক খেয়েছি। যতদূর মনে পড়ছে চুয়াল্লিশ অথবা পঁয়তাল্লিশের গ্রীষ্মে উনি আলমোড়া জেল থেকে খালাস হলেন। আমরা তখন গ্রীষ্মের ছুটিতে রানীখেতে। কর্তা দেখা করতে গেলেন খুব দামি 'ম্যাসপেরো ফ্রিয়ার' এক টিন ইজিপশিয়ান সিগারেট নিয়ে। সন্ধ্যাবেলা আমাদের ডেরায় এসে কফি খেলেন এবং ওয়ালটার ডি লা মেয়ার ও রবার্ট গ্রেভ্‌সের কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন।

শেষ দেখা হয়েছিল আলিগড়ে। এক সকালের ঘটনা। আমার বাবা তখন অসুস্থ, কাকা বিমলাপ্রসাদ এসেছেন দেখতে কলকাতা থেকে, আমিও এসেছি দিন দুয়েকের জন্য। সকাল নটা হবে, কাকা বাইরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, পোর্চে একটা বড় গাড়ি এসে থামল, অদূরে মাত্র একখানি পুলিশের জীপ। গাড়ি থেকে জওহরলাল নেহরু নেমে জিজ্ঞেস করলেন 'ইজ্ ডি পি ইন?' যথারীতি স্নানাদি সেরে টেব্‌লে বসে কর্তা লেখাপড়ায় ব্যস্ত ছিলেন, খবর পেয়ে উঠে এসে ভিতরে বসাতে বললেন। এক লহমা হাতঘড়ি দেখে পণ্ডিতজী বললেন 'সরি, সময় বেশি নেই, হাথরসে একটা চোখের হাসপাতাল খোলা হচ্ছে, সেখানে

পৌঁছতে হবে সাড়ে নটায়, একটু দেখে গেলাম তোমায়, আছ কেমন?' দু চার কথার পর পণ্ডিতজী গাড়িতে উঠতে উঠতে ঘাড় ফিরিয়ে স্মিত মুখে বললেন, 'Well, D. P. Still philosophising?' ঈষৎ হেসে কর্তা জবাব দিলেন, 'Yes, better than muddling along, isn't it?' ডি. পি-র তির্যক রসিকতার সঙ্গে নেহরু পরিচিত। উচ্চ হাস্য হেসে গাড়িতে উঠে পড়লেন।

প্রমথ চৌধুরী, প্রশান্ত মহলানবিশ, সুশোভন সরকার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু এঁরা এবং পরিচয় গোষ্ঠীর পিতৃবন্ধুদের সম্পর্কে অনেক কথাই আত্মজীবনীর মালমশলা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যেমন ধরুন আমার সত্যেনকাকাকে নিয়ে। বাবার মুখে শুনেছি যে এম. এস-সি ফাইনাল পরীক্ষায় শেষ পেপারের দিন ওঁকে দেখা গেল দেড় ঘণ্টার মাথায় হলের সিঁড়ির ওপর বসে সিগারেট ফুঁকছেন। 'কিরে পরীক্ষা-টরীক্ষা দিচ্ছিস না, ব্যাপার কী?' উত্তরে হেসে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন সত্যেন বোস, 'হয়ে গেছে, আয় একটা সিগারেট ধরা।' রেজাল্ট বের হলো যখন দেখা গেল উনি ফার্স্ট; আর সেকেন্ড যিনি তিনি যে সে লোক নন, মেঘনাদ সাহা শতাধিক নম্বর পিছিয়ে আছেন। এই মানুষটিকে 'পরিচয়ের আড্ডা'য় বিদগ্ধজনের কচকচির মধ্যে টানবার চেষ্টা করলে উনি বেরিয়ে এসে, অন্তঃপুরে ছেলেপুলেদের সঙ্গে গল্পে জমে যেতেন। ওঁকে এতই গেরস্থ মানুষ বলে মনে করতাম যে একবার ট্রেনে একত্র যেতে যেতে ফরাসি ভাষায় রশেফুকো পড়তে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আর একবার ১৯৫৬ সালে সুইজারল্যান্ডে জুরিখ্ হাসপাতালে আমার বাবা ঘোরতর অসুস্থ। উনি দেখতে এসে বসে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, পা টিপে দিচ্ছেন, এমন সময়ে লাগোয়া ইউনিভার্সিটি থেকে জনা তিনেক নোবেল লরিয়েট এসে ওঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন। সত্যেনকাকার মুখে চোস্ত জার্মান শুনে অবাক হয়েছিলাম। পরে মনে পড়ল এই আলাভোলা নিরহংকারী সাধারণ ব্যক্তিটি যিনি মা-মাসিদের সঙ্গে রান্নার রেসিপি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চর্চা করেন, ইনিই বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্‌টিকসের জন্মদাতা এবং ইনি বিজ্ঞান জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন কারণ 'জিরো স্পিন' ও 'ইনটিগ্রাল স্পিন' পার্টিক্‌লসের এঁর নামে নামকরণ করা হয় 'বোসন্'।

এঁর সম্পর্কে আরও আশ্চর্য গল্প শুনেছি বাবার মুখে। অর্থনীতিতে এম. এ দেবার আগে ধূর্জটিপ্রসাদ ইতিহাসে এম. এ পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। তার আগে উনি বি. এস-সি পাশ করেছিলেন অঙ্ক, কেমিস্ট্রি ও ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে। এও হত সে যুগে। সে যাক—পরীক্ষার মাসখানেক আগে টাইফয়েডে ভুগে কিয়ৎকালের জন্য উনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। রাইটার নিয়ে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। পরীক্ষার ফল বের হবার পর যিনি অ্যাসিরিয়ান ইতিহাস পড়াতেন খোদ

অধ্যাপকমশায় বাড়িতে এসে হাজির হলেন। সরাসরি ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করলেন 'হ্যাঁরে তুই আমার পেপারে এত ভাল করলি কী করে? তুই তো অ্যাসিরিয়ান হিস্ট্রিতে বরাবর কাঁচা ছিলি।' ধূর্জটিপ্রসাদ জানালেন 'সত্যেন এসে পড়িয়ে দিত, আমি তো চোখে দেখতে পেতাম না, রোজ ঘণ্টা তিনেক পাশে বসে পড়াত।'*

'ও তাই বল্, ওই তো এডিক্টগুলো উদ্ধার করার ব্যাপারে খুব উৎসাহী হয়ে পড়েছিল, কিছু মূল্যবান কাজও করেছে, কেন যে ছোঁড়াটা ফিজিক্স নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে জানি না।' এই ইতিহাসের অধ্যাপকের ক্লাসে বরাদ্দ এক ঘণ্টা অধিকাংশ ছাত্রদেরই ভাল লাগত না। প্রথমে রোল কল্, তারপর দু-চার মিনিট গৌরচন্দ্রিকার পর খাতা খুলে নোট দিতে শুরু করেন। ছাত্ররা মাথা হেঁট করে লিখত। কেউ কেউ ঝিমোতো। সুমের আক্কাদ ব্যাবিলনের কেঠো ইতিহাস আরো নীরস হয়ে যেত। বংশের পর বংশের তালিকা, কতকগুলো রাজার খটমট নামের লিস্ট আর মৃত রাজাদের গোরের তালিকা। আমার বাবা প্রায়ই ক্লাস পালাতেন, আর মাঝে মাঝে যখন ক্লাসে বসার ইচ্ছে হত, তখন বাংলার পাঁচ মুখ করে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে থাকতেন। অন্য বই পড়তেন, খাতায় হাবিজাবি লিখতেন, ছবি আঁকতেন। একদিন অধ্যাপক প্রশ্ন করে বসলেন 'কি ব্যাপার ধূর্জটি,ভাবছ কি? লিখছ না কেন?' গম্ভীরভাবে ধূর্জটিপ্রসাদ বললেন 'না স্যার, ভাবছিলুম "They were more buried than born"'. এ আমার কাকাকে বলা ধূর্জটিপ্রসাদের সহপাঠী ত্রিপুরারি চক্রবর্তীর গল্প। উনি বড় হয়ে ওই কলকাতা ইউনিভার্সিটিতেই ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। এঁর পুত্রের নামও ধূর্জটি, আমার বাল্যবন্ধু। সে বয়সে রোগা তাল ঢ্যাঙা চেহারা। এম্. এ পড়ার সময়ে এক সন্ধ্যায় 'জিগফিল্ড ফলিজ্'-এর শ খানেক অর্ধোলঙ্গ সুন্দরী মেম দেখে এসে পাইপ বেয়ে দোতলায় উঠে বাপকে গালমন্দ করে। পরের দিনই ত্রিপুরারিবাবু তাকে 'লুম্বিনী হাসপাতালে' ভর্তি করে দেন মানসিক চিকিৎসার জন্য। খবর পেয়ে ওর সহপাঠীরা ত্রিপুরারিবাবুর কাছে গিয়েছিল। সকলের উদ্বিগ্ন প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপকসুলভ অন্যমনস্কতার সঙ্গে ত্রিপুরারিবাবু বললেন 'ভালই আছে, রাত্রে ছ সাত খানা রুটি খায়, স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে।' বেরিয়ে এসে প্রভাত গুহ বলল 'যা ব্বাবা, গিয়েছিলাম ছোঁড়াটার মাথার

* ধূর্জটিপ্রসাদের ভাষায়, 'একদিন ভোরবেলা সত্যেন এসে হাজির। ভোরবেলাই আসত। বল্লাম ইজিপ্ট পড়েছি, কিন্তু এসিরিয়া হিটাইট প্রভৃতি কিছুই মনে আসছে না। আসুর-বানিপালের ৯২টা আর আসরীহীসের ৮২টা—কোন্‌টা কী কিছুই মনে নেই...সত্যেন চুপ করে থেকে বল্লে "দে আমাকে।" দিলাম, সন্ধ্যে [য] ছ'টার মধ্যে জিনিসটা ঠিক করে দিলে।' ধূ-র-৩ পৃ.২৬৫। প্রকাশকের টীকা।

অবস্থা জানতে, জবাব পেলাম সাত আট খানা রুটি খায়। আগে রোগা পাগলা ছিল, এখন না হয় মোটা পাগলা হবে। কী গেরো!'

পরবর্তীকালে দেখেছি বায়োকেমিস্ট্রির ছেলেরা সত্যেন বোসের তত্ত্বাবধানে থিসিস্ লিখছে। সে যুগের মানুষরা বহুমাত্রিক হতেন কিন্তু এমন মাপের মানুষ ওঁদের কালেও দেখা যায়নি। বুড়ো বয়সে শান্তিনিকেতনে উপাচার্য হয়ে উনি যথেষ্ট নাকাল হয়েছিলেন শুনেছি। মহাপুরুষরাই বেকায়দায় পড়েন—এ তো রামায়ণ মহাভারতের কাল থেকে হয়ে আসছে।

আমার বাবার শাকরেদ-স্থানীয় অশোক মিত্র (আই সি এস্) তাঁর 'তিন কুড়ি দশ' নামক আত্মজীবনীতে সত্যেন বসুর সম্পর্কে লিখেছেন :

> সত্যেন বসুর ছাত্র ও অনুরাগীরা বিজ্ঞানজগতে তাঁর অবদানের কথা অনেক লিখেছেন, তবে, খুব কম লোকেই তাঁর এসরাজ ও বেহালায় পারদর্শিতার কথা লিখেছেন, বা বলেছেন। রমনায় তাঁর বাড়িতে থাকাকালে দু দিন সন্ধ্যায় তাঁর বাজনা শুনেছি। একদিন সন্ধ্যায় কথাচ্ছলে ট্র্যাজেডির তত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি প্রায় একঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে বলে গেলেন, অ্যারিস্টট্‌ল্ থেকে শুরু করে রাসীন, শীলার, নীট্‌শে, গোয়েটের রচনার বিশদ উল্লেখ করে। অধ্যাপক শহীদুল্লা, ডাঃ সুশীল দে, মিস্ ম্যাকাই, সকলেই সুবিখ্যাত পণ্ডিত, সবাই যেন বাকরুদ্ধ হয়ে শুনলেন। আরেক সন্ধ্যাবেলা তিনি নেপোলিয়ন এবং জার্মানির একীকরণ এবং সে বিষয়ে গোয়েটের স্থান সম্বন্ধে আশ্চর্য আলোচনা করেন। এই আলোচনার কয়েক বছর পরে আমি টমাস মানের 'লটে ইন্ হ্বাইমার' উপন্যাসটি পড়ি; তখন সত্যেনবাবুর আলোচনা বইটির পশ্চাদ্‌পট হিসাবে আমার বার বার মনে পড়ে।[১]

১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মে বিষ্ণুবাবুর বাড়িতে প্রথম সত্যেন বসু মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হয়।...তাঁর কিংবদন্তীখ্যাতিতে আমরা এমনিতেই নত হয়ে থাকতুম। আমাদের মজা লাগত তিনি বিষ্ণুবাবুর বাড়িতে দুপুরে এসে যখন জিজ্ঞেস করতেন : আজ কার রেকর্ড বাজাবে? সব সঙ্গীতেই তাঁর অনুরাগ ছিল, বিশেষত জন সিবাস্টিয়ান বাখের। বিষ্ণুবাবু গ্রামোফোনে দম দিয়ে যখন রেকর্ড চড়াচ্ছেন, তার মধ্যেই সত্যেনবাবু মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে কুশন টেনে শুয়ে পড়েছেন। বাজনা শুরু হতে না হতেই দেখা যেত তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি বুশ চেম্বার অর্কেস্ট্রার প্রশংসা করতেন। আমরা ধরেই

১. 'তিন কুড়ি দশ' অশোক মিত্র : ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭, দে'জ পাবলিশিং।

নিয়েছিলাম আমাদের ফেলে তিনি প্রণতিদি আর বড় মেয়ে ইরার সঙ্গে গল্প করতে চাইবেন।[১]

১৯৪৩ সালে মুন্সীগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজের বার্ষিক দিবস উপলক্ষ্যে তিনি ঢাকা থেকে মুন্সীগঞ্জে এসে আমাদের কাছে একদিন ছিলেন। বাড়িতে দীনেশচন্দ্র সেনের দুই খণ্ড 'বৃহৎ বঙ্গ' দেখে তিনি মহা খুশি। গড়গড় করে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের অনেক অংশ মুখস্থ বলে গেলেন। কবিকঙ্কণ আবৃত্তি করার মুহূর্তকাল আগে শিশুকে কী করে মায়ের দুধ ছাড়িয়ে অন্য খাদ্য ধরাতে হয় সে বিষয়ে তিনি আভার সঙ্গে আলোচনা করছিলেন।[২]

গম্ভীর, সস্নেহ, ব্যারিটোন গলায় তিনি এমন ভাবে কথা বলতেন যেন ঘরকন্নার কথা হচ্ছে। তাঁর কথা বলার ধরন থেকে আপনাআপনি যেন তাঁর কথার বা বিষয়ের অসামান্যতা বেরিয়ে আসত।...তাঁর কথা বলার ধরনে গুরুগম্ভীর বা পাণ্ডিত্যের ভারে চমকে দেবার ভাব একেবারেই থাকত না। দুরূহ বিষয়েরও যখন আলোচনা করতেন এমনভাবে করতেন যেন সমানে সমানে কথা বলছেন। অতি জটিল চিন্তা ও ভাব ব্যক্ত করতেন সহজ সরল ভাষায় অনেকটা বাউলদের অথবা কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত। অ্যারিস্টটলের ভাষায়, চিন্তায় মহাজ্ঞানী, কথোপকথনে সরল কৃষক। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, দখল, জ্ঞান ও বিনয় না থাকলে আমাদের দেশের পণ্ডিতরা এত সহজ ভাষায়, সাধারণ লোকের মত কথা বলেন না।[৩]

শাঁটুলবাবুর ভাষায় সত্যেন বোস মশায় আলু পটল দিয়ে কোয়ান্টাম থিওরি বুঝিয়ে দিতে পারতেন গোলা লোকেদের।

সুধীন কাকার নতুন ন্যাশ সেলুন গাড়ি, সুন্দর চেহারা সাজপোশাক ও পকেট ভর্তি করে মোটা মোটা চকোলেটের বার নিয়ে আসার অভ্যাসের দরুণ, ইনি আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। সে বয়সে ওঁর কবিতার মর্মোদ্ধার করবার মত ক্ষমতা না থাকলেও উনি এত বড় জাঁদরেল সম্পাদক ছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা না ছেপে ফেরত পাঠিয়েছিলেন, শুনে শিশুকালে আমার বিস্ময়ের ও ওঁর প্রতি সাতিশয় সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়েছিল। পাশটাশ করে পরবর্তীকালে কলকাতায়

১. তদেব ; পৃ. ৫৫-৫৬, দে'জ পাবলিশিং।
২. ঐ : পৃ. ৫৭-৫৮। দে'জ পাবলিশিং।
৩. ঐ : পৃ. ৫৬। দে'জ পাবলিশিং।

থাকার সময় ওঁরা ছুটিতে গেলে আমাকে ওঁদের রাসেল স্ট্রিটের ফ্ল্যাট আগলাতে হত। অনেকে জানে না ওঁর স্ত্রী রাজেশ্বরী দত্ত, রবীন্দ্রসংগীতের খ্যাতনামা গায়িকা, আমার বাবার পরামর্শে টানা পনেরো বছর যামিনী গাঙ্গুলির কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নিয়েছিলেন এবং কলকাতার সব কনফারেনসে আমার সঙ্গে যেতেন, তবে সর্বসমক্ষে খেয়াল গাইতেন না। ওঁদের বাড়িতে গানের আসরও বড় একটা হত না। একবার কেসরবাইয়ের আজন্ম সঙ্গী সারেঙ্গিয়া মজিদ খাঁর দুই ছেলের গান ওঁর ফ্ল্যাটে হয়েছিল। ওই আসরে অবনী চ্যাটার্জি আই. সি. এস্-এর সঙ্গে বসে সুধীন্দ্রনাথকে রাম খেতে দেখে দস্তুরমত শকড্ হয়েছিলাম। বলেছিলাম 'মনে হচ্ছে একটা যুগ আজ শেষ হয়ে গেল।' উত্তরে উনি বললেন 'বাজার থেকে আই রিফিউজ টু বাই স্কচ্ অ্যাট ব্ল্যাকমার্কেট প্রাইসেস।' মনে পড়ল ইনিই যৌবনে অসুস্থ অবস্থায় ইয়োরোপে ব্ল্যাক ফরেস্টের স্যানেটোরিয়ামে থাকাকালীন তাঁর হাত খরচার ব্যাপারে পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্তর কৃপণতার জন্য চিঠি লিখেছিলেন 'ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু রুইন মাই হেল্‌থ বাই ড্রিংকিং চীপ ওয়াইন?'

হাবুল কাকা, যাঁর ভাল নাম হিরণকুমার সান্যাল, আমাদের বালিগঞ্জের বাড়ির অনতিদূরে তেতলা বাড়ি করেছিলেন। সে বাড়ির দোতলা ও তিনতলার ভাড়াটে অধ্যাপক সুশোভন সরকার। শৈশবে উনি ঠাকুরদা রামব্রহ্ম সান্যালের সঙ্গে আলিপুর জু-তে থাকতেন। ঠাকুরদা ছিলেন ইংরেজ আমলের জু-গার্ডেনের ডিরেক্টর। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য হিরণকুমারের নামে কবির চিঠি আসত হিরণ সান্যাল কেয়ার অফ রামব্রহ্ম সান্যাল, ডিরেক্টর Alipoor Zoo, Human Section.

কোথায় ভাল সিঙাড়া পাওয়া যায়, কোথাকার কমলাভোগ বিখ্যাত, কোন দোকানের মোগলাই পরোটার সঙ্গে আলুর তরকারি কলকাতা শহরে শ্রেষ্ঠ এইসব সন্ধান হাবুলকাকার কাছে পাওয়া যেত। 'পরিচয়ে'র আড্ডায় উনি বিদূষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া পছন্দ করতেন। ভায়রাভাই অমল হোম তখন কর্পোরেশনের 'ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটে'র সম্পাদক। প্রচণ্ড ফ্যাশনেব্‌ল মানুষ, উনিই আমার দেখা একমাত্র ভারতীয় যিনি 'স্প্যাট্‌স' পরতেন। একবার শ্রীলঙ্কা থেকে আগত ভগবান বুদ্ধের শিষ্য সারিপুত্ত ও মৌদগল্লায়নের অস্থি মাথায় নিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মিছিলের পুরোভাগে হেঁটেছিলেন। জাপানি হাইকুর কায়দায় হাবুলকাকার এক লাইনের পদ্য, 'ছিল হোম, হলো ডোম' 'পরিচয়ে'র সভ্যবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছিল। এ প্রকারের ওঁর বিখ্যাতরচনার মধ্যে পড়ে :

'বুদ্ধদেব বসুর একমাত্র কসুর
বাঙাল দেশে জন্মেছেন
ওঁর পিতা এবং শ্বশুর।'

আরও আছে :

'মওলানবিশ গুষ্টির,
বৌঝিদের পুষ্টির,
অভাবিত বহরে,
তাক লাগে শহরে।'

সুশোভন সরকারের মেয়ে কাজলা (শিপ্রা সরকার)কে লেখা পোস্টকার্ড :

'বোঁ বনবন ঘুরতিসে ঐ ইস্টিমারের সাকা,
কাজল সোনা আজকে আমি দিসসি পাড়ি ঢাকা।
বাটলারেরে কইয়া দিসি খামু আমি পক্ষী
ফিরমু আমি দিন সারেকে বুসোনি লক্ষ্মী?
আসমানেতে ক্যাবল ম্যাঘ ভুঁয়ে শুধু বৃষ্টি।
মা বাবারে কইয়ো, মণি, হাবলমামা মিষ্টি।'

উত্তর প্রদেশের প্রথম গভর্নর সরোজিনী নাইডুর প্রতি দু লাইনের শ্রদ্ধাঞ্জলি ভুললে চলবে না :

অলিন্দে দণ্ডায়মানা গণ্ডারগামিনী
মণ্ডাপুষ্ট যণ্ডাদেহ লাট সরোজিনী।।

বেশ ছিলেন, শেষের দিকে হঠাৎ কট্টর কম্যুনিস্ট হয়ে গেলেন নীরেন কাকার (নীরেন্দ্রনাথ রায়) পাল্লায় পড়ে। একদিন, গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবা এসেছেন লখনউ থেকে। ছুটির দিন, শুনি বসবার ঘরে প্রচণ্ড শোরগোল। দেখি এক কোণে বিষ্ণু দে বসে আছেন, তাঁর ট্রেডমার্ক ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক বিদগ্ধ হাসিটি অন্তর্হিত হয়েছে আর হাবুলকাকা তারস্বরে চিৎকার করছেন 'আপনার মত সিউডো ইনটেলেকচুয়ালদের ছাতাপেটা করা উচিত।' হাবুলকাকা ছাতা ঘুরোতে ঘুরোতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরে বাবা প্রশ্ন করলেন বিষ্ণুকাকাকে, হাবুল সান্যালের এবংবিধ উত্তেজনার কারণ কি? শোনা গেল দু তিন দিন পূর্বে নীরেন্দ্রনাথের বাড়িতে হাবুল সান্যাল এবং আরও দু একজন বসে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মার্ক্‌সিস্ট ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। 'সোনার তরী' নাকি দলিত প্রপীড়িত চাষিদের কাহিনী। 'রাশি রাশি ভারা ভারা' ধান মহাজনরা নিয়ে যাচ্ছে আর চাষিরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে। ওদের মধ্যে দু একজন নৌকোয় উঠতে চাইছিল, তাদের 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী' বলে ভাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, একে প্রলিটারিয়েটের এক্‌সপ্লয়েটেশন ছাড়া কী বলা যেতে পারে? বিষ্ণুবাবু বোধ হয় একবারই জীবনে হিজি বিজ্‌ বিজের মত হেসেছিলেন সেদিন। তাঁর উক্তি

যা হাবুল সান্যালের উত্তেজনার কারণ তা হল 'এতদিন ট্রায়াম্‌ফ অফ মাইণ্ড ওভার ম্যাটার শুনেছিলাম, এখন দেখছি ট্রায়াম্‌ফ অফ ম্যাটার ওভার মাইণ্ড।'*

১৯৪৬ সালে এম. এ পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যাওয়া আমার হল না। তখন সবে যুদ্ধ শেষ হয়েছে, বয়েস আমার উনিশ, আমাকে গ্রাস করে নিল বার্ড কোম্পানি নামে এক ইংরেজ সওদাগরি আস্তাবল। সেখানে মাইনে ধার্য হল প্রথম ছ মাস—একশ টাকা, দ্বিতীয়—ছ মাস দুশো, আর বছরের শেষে পাকা হলে চারশ, যা আজকের দিনে হেসে খেলে হাজার পনেরোর সমান। তার ওপর আবার ছিল সাহেবসুবোদের সঙ্গে ফ্রি লাঞ্চ। বালিগঞ্জের পৈতৃক বাড়িতে কাকার সঙ্গে মুফতে থাকা খাওয়া আর হাতে কাঁচা টাকা পড়ে ছেলেবয়সের দরাজ হাত আরও খুলে গেল। বছর তিনেকের মাথায় ডেবিট ক্রেডিটের ধাক্কা থেকে বেরিয়ে সরকারী চাকরিতে ঢুকে নিঃশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছিলাম। যদিও সে সময়কার কলকাতার সাহেবি দোকান, চৌরঙ্গীর ঝলমলে চেহারা আর ফার্পো, পেলিটি, গ্রেট ইস্টার্নে খাওয়ার স্মৃতি আমার প্রথম পোস্টিং কানপুরের মত শহরে মন ও রসনার পক্ষে বড়ই বেদনাদায়ক হয়ে উঠত। ফার্পোর অফিসপাড়ায় একটি শাখা ছিল। পেলিটি তার নাম। এখানে তিন কোর্সের লাঞ্চ আড়াই টাকায় পাওয়া যেত, আট আনা টিপ্‌স্‌। এখন ওল্‌ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে রাজভবনের সামনে যে বাড়ির দোতলায় 'দি হিন্দু' কাগজের অফিস হয়েছে, ওখানেই ছিল পেলিটি। দরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁ দিকের টেব্‌লটি সদাসর্বদা রিজার্ভ্‌ড থাকত মার্টিন বার্ন কোম্পানির স্যার লেসলি মার্টিন ও স্যার বীরেন মুখার্জির জন্য। বীরেন মুখার্জি, লেডি রানুর স্বামীর নাম মার্চেন্ট আপিসের চ্যাংড়া সাহেবরা নাম দিয়েছিল 'ব্ল্যাক নাইট'। ফার্পোর লাঞ্চের দাম ছিল সাড়ে তিন টাকা এবং এখানকার কন্টিনেন্টাল খাওয়া তখন ভারত বিখ্যাত। এর সামন স্টেক, প্রন ককটেল, স্মোকড্‌ হিলসা, বেকড্‌ ক্র্যাবের কথা মনে করে সুভাষ ঘোষাল বহু বছর পরে বলেছিল 'শুধু ফার্পোটা ফেরত দাও ভাই, আমি ডেরাডাণ্ডা শুদ্ধ বম্বে থেকে কলকাতায় ফিরে আসতে রাজি আছি।' ষাটের দশকেও এখানে দেড় টাকায় এক বোতল বিয়ারের সঙ্গে অগুণতি ফ্রি চিপ্‌স ও ককটেল সসেজ পাওয়া যেত

* এই নীরেন রায়ের ওপর হাবুলকাকার রচনা :
দুলকি চালে তালে বেতালে হাটেন নীরেন রায়;
বাংলাদেশের নোংরা মাটি ছোঁন কি না ছোঁন পায়।
বলেন মৃদু হেসে, নইতো আমি যে সে,
সাম্যবাদের পালিশ লাগাই রোমাঞ্চকতায়।

তার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। আরও মনে পড়ছে আমজাদিয়ার বিখ্যাত মুর্গ মুসল্লম, সাবিরের পরটা ও রিজালা আর আমিনিয়ার পসিন্দা কাবাব যা এখনও ঠিক দুপুর বারোটায় পাওয়া যায়। সাড়ে বারোটায় পৌঁছলে হতাশ হতে হয়। অফিস ফেরত দুজন নিউ ক্যাথে রেস্তরাঁয় ঢুকে চায়ের সঙ্গে আমার হাতের তেলোর মত মোটা তিনটে প্রন কাটলেট ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেয়ে নিউ এম্পায়ারে সিনেমা দেখে ট্যাকসিতে বালিগঞ্জে ফিরতে গেলে আস্ত একটি দশ টাকার নোট উড়ে যেত। এই রকম একটি রুটিন সন্ধ্যায় ফিরতিপথে এক বিরাট পাগড়িওয়ালা সর্দারজীর ট্যাকসিতে বসে কালীসাধন দাশগুপ্ত বলেছিলেন একেই বোধ হয় বলে '*Sic Transit Gloria Mundi*'। ওঁর অন্যান্য অবদানের মধ্যে ছিল, র‍্যাশন কার্ড (খাইবার পাস), আর্মি রাম (জোয়ানের আরক) ফিগ লীফ (ধনে পাতা), টয়লেট পেপার ('হাগজ')।

১৯৫০ সালে বছর দুয়েক কানপুরে সরকারি চাকরি করার পর কলকাতায় বদলি হয়ে পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় ফিরে এলাম। তখন অখণ্ড আড্ডার বয়স। শুধু চা-কফির জোরে টানা ঘণ্টা আষ্টেক ছুটির দিনে আড্ডা জলভাত ছিল। আপিসের দিনগুলোতে দুপুর বেলা আমাদের হেডকোয়ার্টার্স ছিল সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর কফি হাউসের হাউস অফ লর্ডসএ।* সদস্যরা পরবর্তীকালে সবাই নিজের নিজের জগতে অল্পবিস্তর নাম করেছেন। সুভাষ ঘোষাল তখন জে ওয়ালটার টম্সনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, পরবর্তীকালে হিন্দুস্থান টম্সন কোম্পানির চেয়ারম্যান, বিজ্ঞাপন জগতের বিধান রায়—দা লাস্ট অফ দা জিপিজ্। শাঁটুল (রাধাপ্রসাদ গুপ্ত) আড্ডাবাজদের চূড়ামণি পরবর্তী জীবনে কলকাতার বিদগ্ধ মহলে আর্ট-কালচার আর পুরোনো কলকাতা খোঁড়াখুঁড়ির ব্যাপারে পুরোধা বলে গণ্য হয়েছিলেন। ঠাট্টা করে ওঁকে এক-আধজন 'দা বিগেস্ট অথরিটি অন নর্থ ক্যালকাটা' বলে পরিচয় করিয়ে দিত। চিদানন্দ দাশগুপ্ত ফিল্ম দুনিয়ায় এখন সুপরিচিত ক্রিটিক এবং ফিলম হিস্টোরিয়ান। সে সময়কার ফ্রক পরা রীণা (অপর্ণা সেন) চিদানন্দর বড় মেয়ে এখন নাম করা অভিনেত্রী এবং অসাধারণ ফিল্ম ডিরেকটর। আরও পাঁচজনের মধ্যে কফি হাউসের নিয়মিত সদস্য বাপ্টি (জেড্ এইচ্) খাঁর কথা মনে পড়ে। মানুষটা লখনউয়ের নিকটবর্তী বারাবাঙ্কির কোনো রহিসের সন্তান। কলকাতায় এসে এক বর্ষীয়সি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান রমণীকে বিবাহ করেন। তাঁর সৎ ছেলের নাম ছিল, বাটফয় আর সে বড়মাঠে ঘোড়দৌড়ের জকি ছিল। বাপ্টির চেহারা ছিল ঈষৎ রঙ্ময়লা-চশমা পরা ফিল্মস্টার অবিকল ডেফিড নিভেনের মত আর প্রথম

* লেখকের 'মজলিস্' পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে এই কফি হাউসের আড্ডার কিছু খবর পাওয়া যাবে।

আলাপে শাঁটুলবাবু তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন ট্রট্স্কাইট স্প্রিন্টার বলে। যৌবনে বান্টি খাঁ নাকি অশ্বপৃষ্ঠে বাটফয়ের মতই প্রচণ্ড স্পীডে দৌড়তেন এবং যুক্তপ্রদেশ অলিম্পিকে মেডেল টেডেল [য]পেয়েছিলেন। ট্রট্স্কাইট কেন আখ্যা পেয়েছিলেন বান্টি খাঁ তা বলতে পারব না, কারণ সুদীর্ঘ দশ-বারো বছরের আলাপে কোনো রাজনীতির কথা তাঁর মুখে শোনা যায়নি। লিট্ল থিয়েটার গ্রুঁপের যে তিনজন আমাদের কফি হাউসের টেব্‌লে বসতেন তাঁরা রণেন রায়, প্রতাপ রায় ও বান্টি খাঁ। উৎপলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হত বটে, কিন্তু আমাদের টেব্‌লে বসার অধিকার তিনি অর্জন করেননি। তখন তিনি শৌখিন অভিনেতা মাত্র পরবর্তীকালের আইকন উৎপল দত্ত হতে বহুৎ দূর। বান্টি খাঁ ছিল হাজির জবাব অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে অ্যাড্ লিব্ কোয়ালিটি বলে তার রাজা। তবে তার প্রধান ব্যায়রাম ছিল পান্ করা। এ এমন একটি ইংরেজি শব্দ যার বাংলা পান্‌রাজ শিব্রাম চক্রবর্তীও করে যেতে পারেননি। উদাহরণ : একটি সমকামী দো আঁশলা সাংবাদিক কফিহাউসের নিয়মিত খদ্দের ছিল। সঙ্গে তারই বান্ধব একটি ছোকরাকে দেখে উৎপল প্রশ্ন করেছিল ছোঁড়াটা কে। বান্টি খাঁর উত্তর 'সাহেবের লেটেস্ট বয় ফ্রেন্ড।' উৎপল : 'কান্ট কম্প্লিমেন্ট হিম্ অন হিজ্ টেস্ট।' মৃদু হেসে বান্টি খাঁর জবাব 'ওয়েল ওয়েল, বাগার্স্ কান্ট বি চুজার্স, ইউ নো।'

বেশ কিছুকাল বান্টি খাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না। কিছুদিন ফার্নিচারের অর্ডার নিয়ে মিস্তিরি খাটাল। আমার একটি বইয়ের আলমারির ডেলিভরি দিল পাক্কা এক বছর পরে। মাঝখানে একটা সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক হল কিন্তু তার আয়ুও দেখা গেল বছর পার হল না। অবশেষে সুভাষ ঘোষাল জে ওয়ালটার টম্সনের ম্যানেজার আর্থার মূরহাউস সাহেবকে সুপারিশ করে একটা ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করল। ইন্টারভিউয়ের খবর পেলাম পরের দিন। খুবই সংক্ষিপ্ত ইন্টারভিউ। মূরহাউস সাহেবের প্রশ্ন 'ওয়েল, টেল মি মিস্টার খান হোয়াট হ্যাভ ইউ বিন ডুইং উইথ ইয়োরসেল্‌ফ।'

'নাথিং মাচ্। আই হ্যাভ বিন এডিটিং আ উইক্‌লি কল্‌ড ক্লোজ-আপ্।'

দশ সেকেন্ডের বিরতি। মূরহাউসের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তর এল 'ইট ক্লোজ্‌ড ডাউন।'

মূরহাউসের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সেক্রেটারি লাগোয়া ঘর থেকে সাহেবের উচ্চহাস্য শুনে উঁকি মেরেছিল। তার রিপোর্ট 'মিস্টার মূরহাউস স্নিগার্ড, হিমসেল্‌ফ সিক্ অ্যান্ড গেভ হিম দা জব অফ আ কপি রাইটার অন্ দা স্পট।'

মাসের গোড়ায় মাইনে পেয়ে আমাদের দু চারজনকে বান্টি খাঁ 'অলিম্পিয়া'য় নিয়ে গিয়েছিল। বেরিয়ে পার্ক স্ট্রিট দিয়ে হাঁটছি। ঝলমলে ভল্লার কার্পেটের দোকানের সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল বান্টি। তারপর ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল

বাইরে ডানদিকের শোকেস্-এ ঝোলানো কার্পেটটির দাম কত? সাড়ে সাত হাজার টাকা শুনে স্তম্ভিত হয়ে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থাকার পর বান্টি খাঁর মুখ থেকে বের হল। 'হৎ তেরি ভল্লা হো। চলতে হেঁ'। ওইটা বলবার জন্যই দোকানে ঢুকেছিল বান্টি।

সত্যজিৎ রায় কফি হাউসের আড্ডার রেগুলার সদস্য ছিলেন। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় আমার একটি কচি কলাপাতা রঙের দু-দরজার অ্যাংলিয়া ফোর্ড গাড়ি ছিল, নতুন দাম তার ৬৬০০ টাকা। পেট্রলের দাম পাঁচ সিকে (১.২৫) গ্যালন অর্থাৎ সাড়ে চার লিটার, যার দাম এখন ২০০ টাকার কাছাকাছি। মাইনে পেতাম সর্বসাকুল্যে স্যাতশ পঞ্চাশ। ইউ. পি. সরকারের লিয়েজঁ অফিসার হিসেবে আমার কাজ ছিল কয়লা, ইস্পাত এবং নুনের সরবরাহর কাজ পরিদর্শন করা। এর জন্য কোল কমিশনার ও আয়রন স্টীল কন্ট্রোলারের অফিসে মাঝে মাঝে ঢুঁ মারা ছাড়া আমাকে মাসে একবার জামশেদপুর ও কুলটি যেতে হত। কাজের চাপ এমনই ছিল যে আমার সিভিল সাপ্লাইজ কমিশনার আদিত্যনারায়ণ ঝা (আই. সি. এস্) লখনউ থেকে একবার আমায় ফোন করে প্রশ্ন করেছিলেন আমি লাঞ্চের পরে অফিসে যাই কিনা। তাঁর উপদেশ দ্বিপ্রহরের পর সরকারি কাজ বাহুল্য মাত্র, আমি না কি অযথা চিঠি ও নোট পাঠিয়ে তাঁদের কাজ বাড়াচ্ছি। কলকাতায় আমি রাইটার্স বিলডিং-এর ছুটির লিস্টি অনুসারে অফিস খোলা রাখতাম। তখন সম্ভবত ইতুপুজো মনসাপুজোতেও হাফ হলিডে হত, অতএব পাঠক আন্দাজ করতে পারবেন কী ভয়ংকর কাজের চাপের মধ্যে দিয়ে আমার ব্যাচিলর জীবনের কিয়দংশ অতিবাহিত হয়েছিল।

পৌনে একটা নাগাদ ক্লাইভ স্ট্রিটের অফিস থেকে বেরিয়ে আমার কাজ ছিল শাঁটুলবাবুকে (রাধাপ্রসাদ গুপ্ত) ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিটের জে. ডব্‌লিউ. টম্‌সন (পরবর্তীকালে হিন্দুস্থান টম্‌সন বা এইচ্ টি এ) থেকে তোলা। পরের স্টপ্ ডি. জে. কীমারের কাউন্‌সিল হাউস স্ট্রিটের অফিস থেকে মানিকবাবু (সত্যজিৎ রায়) ও চিদানন্দ দাশগুপ্তকে তুলে ওয়াটারলু স্ট্রিটের কফি হাউসে পৌঁছন। একটুআধটু দেরি হয়ে গেলে দূর থেকে দেখতাম মানিকবাবু হেঁটে বেরিয়ে পড়েছেন, পাশে চিদানন্দও দ্রুতগতিতে ওঁর সঙ্গে সমান তালে হন হন করে হাঁটছেন, তাঁর মাথা মানিকবাবুর বগল অবধি কষ্টে সৃষ্টে পৌঁছচ্ছে। মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে দুজনকে তুলতাম। যাঁরা আমার 'মজলিস্' পড়েছেন তাঁরা কফি হাউসের সে যুগের আড্ডার ছিটেফোঁটা আন্দাজ পাবেন, মানিকবাবু এ আড্ডায় বড় একটা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন না, তবে ম্যহ্‌ফিলে ঠিক জায়গায় দাদ দেওয়ার মত ওঁর উচ্চহাস্য সনৎ লাহিড়ী বা শাঁটুলবাবুর উৎসাহ বর্ধন করত। আর কমলকুমার মজুমদারের আবির্ভাব হলে আমার কথা ছেড়েই দিন, আর পাঁচজনেরও অফিসে ঠিক সময়ে প্রত্যাবর্তন করার প্রশ্নই উঠত না। তাঁর বেশির ভাগ গল্পই এমন ছাপলে আমায় পুলিশে ধরবে।

ওরই মধ্যে দু-একটা বর্ডার লাইনের গল্প মনে পড়ছে। কোন্ এক অফিসে চারছেলের মা পাঁচছেলের বাবার সঙ্গে ইলোপ করে। চিন্তান্বিত স্বামী আপিসের বড়বাবুর কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করায় গম্ভীর মুখে বড়বাবু প্রশ্ন করলেন 'কোলেরটার কত বয়স?' আট মাস শুনে উনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন 'ঘাবড়ো না, আজ কালের মধ্যেই দেখবে সন্ধের ঝোঁকে বৌমা মাই দিতে ফিরে এসেছেন।'

কমলকুমারের বিশেষ পরিচিত ক বাবুর টাকা ধার নিয়ে খ বাবু অসংখ্য তাগাদা সত্ত্বেও ফেরত দিচ্ছেন না। হঠাৎ উত্তমর্ণর সঙ্গে বাসে অধমর্ণর দেখা। ক বাবু বাসের পেছনের সীটে বসে, খ বাবু তাঁকে দেখেই এগিয়ে গেলেন। ক বাবু উচ্চৈঃস্বরে বাসশুদ্ধ লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে উঠলেন, 'এই যে, কত দিন পরে দেখা! কী ব্যাপার মশায়? ভেবে ভেবে মরছি আমরা, শুনলাম আপনার সিফিলিস হয়েছে, ভাল করে চিকিৎসা করাচ্ছেন তো?' খ বাবু এর পর টাকা ফেরত দিয়েছিলেন কিনা সেটা গল্পর আওতায় পড়ে না।

কফি হাউসের বাইরে ফিল্ম সোসাইটিতে মানিকবাবুর সঙ্গে দেখা হত। তখন আমার দিশির পাশাপাশি বিলিতি ক্ল্যাসিক্যাল শোনার যুগ চলছে। ওঁর সঙ্গে নিয়মিত আমার রেকর্ড এক্সচেঞ্জ হত। আর আমাদের দুজনেরই শখ ছিল উচ্চদরের ডিটেকটিভ নভেল সায়েন্স ফিক্শান ও যাকে ইংরেজিতে বলে macabre সেই প্রকারের অতিপ্রাকৃত গল্পের বই পড়ার।

তাঁর মৃত্যুর পর বহুমাত্রিক বড়সড় মাপের বাঙালি বড় একটা চোখে পড়ছে না। অমর্ত্য সেন আর সৌরভ গাঙ্গুলিকে নিয়ে বাঙালি পাব্লিক এখন উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করছে। 'দুটি বই ল্যাজ মোর নাই রে'।

যে সময়ের কথা বলছি তখনও মানিকবাবুর 'পথের পাঁচালি' জন্মায়নি। তবে ফিল্মের পোকা ছিলেন আমাদের মধ্যে উনি আর চিদানন্দ দাশগুপ্ত। ওঁরা দুজনে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি চালু করেন, সঙ্গে ছিল বংশী চন্দ্রগুপ্ত। আমার চেয়ে শাঁটুলবাবুর উৎসাহ ছিল বেশি। হলিউড ও বিলিতি ফিল্মের বাইরে যে বিখ্যাত ছবি হয়—তার প্রথম পরিচয় হয় আমার ব্যাটলশিপ পোটেমকিন ও আইভান দা টেরিব্ল দেখে। শাঁটুলবাবুর বগলে আইসেনস্টাইনের *film form and film Sense*, পুডোভকিনের *film Technique*, পল রোথার *The film till now* দেখতাম এবং মাঝে মাঝে ওঁদের নিছক ফিল্মি আড্ডায় অংশগ্রহণ করতাম। মুখরক্ষা করবার জন্য এক কপি রোজার ম্যানভেলের *film* বইটাও কিনে ফেলেছিলাম। কিন্তু ওঁদের মত শাঁটুলবাবুর ভাষায় ফিল্ম গেঁড়ে হয়ে উঠতে পারি নি। জঁ রেনোয়ার কলকাতায় আবির্ভাবে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের মধ্যে। *The River*-এর শুটিং দেখতে ওঁরা যেতেন। আমি কখনও যাইনি। তবে রেনোয়ার বক্তৃতা ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটিতে মনে আছে। আঁতেল অ্যাক্টর রাধামোহন

[ভট্টাচার্য] উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার শেষে রেনোয়ার বক্তব্যে এক-আধটি contradiction-এর উল্লেখ করেন কিঞ্চিৎ অভব্য ভাবে। রেনোয়া-র ফরাসি ঘেঁষা ইংরেজিতে জবাব 'মানুষ হয়ে জন্মেছি জানোয়ার তো নয়, আমাদের চিন্তাধারায় কিছু contradiction তো হবেই।' তাঁর বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসেছিলাম। জন হিউস্টনও এসেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা আমার শোনা হয়নি।

মানিকবাবু বিলেত থেকে ফিরলেন new cinema বা প্যারালাল সিনেমার দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে। ওঁর কাছে ডি'সিকার নাম প্রথম শুনলাম এবং কত কম খরচে 'বাইসিক্‌ল থীভ্‌স'-এর মত ছবি করা যায়, নাম-না-জানা অ্যাক্টর দিয়ে স্টুডিওর বাইরে বেরিয়ে এ ধরনের চিন্তা তখন থেকেই ওঁর মাথায় ঢুকেছিল। 'ঘরে বাইরে'র কপিরাইট ওঁর প্ররোচনায় হরিসাধন দাশগুপ্ত তখন কিনে ফেলেছেন বিশ্বভারতীর কাছ থেকে সেই বাজারে তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে। কারা তাতে অংশ গ্রহণ করবেন তাও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। রাধামোহন অভি ভট্টাচার্য ও বিমলার পার্টে একটি মেয়ে যাকে কেউই চিনত না কিন্তু পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে দেশে ও বিদেশে সে প্রচুর আলোড়নের সৃষ্টি করে। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন মানিকবাবুর ঘনিষ্ঠতা হয় এক জার্মান স্কলার ও ইংরেজির প্রোফেসর অ্যালেক্‌স অ্যারনসনের সঙ্গে। অ্যারনসনের সঙ্গে বন্ধুত্বর মূল ভিত্তি ছিল ওঁদের বিলিতি ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং পরে যখন অ্যারনসন ইজ্‌রায়েলে চলে যান তখনও বরাবর মানিকবাবুর সঙ্গে চিঠিপত্রর আদান প্রদান অক্ষুণ্ণ ছিল। অনেকেই পড়েছেন অ্যারনসনের কাছে, পারমিতা বিশ্বনাথন, চিত্রা পাল চৌধুরী, মায় মহাশ্বেতা দেবীও। মাঝে মাঝে একটি শ্যামবর্ণা চমৎকার দোহারা চেহারার মেয়ে আসত সাহেবের কাছে রেকর্ড শুনতে। নাম সোনালী সেন রায় যাকে ৪৮ সালে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে মাচার ওপর দাঁড়িয়ে ফ্রেস্কো পেন্টিং করতে দেখে life is greater than art বলে শাঁটুলবাবুকে ছুটোছুটি করতে দেখেছিলাম। পরে ইনি হরিসাধনকে বিবাহ করে সোনালী দাশগুপ্ত এবং তারও পরে রবার্তো রসোলিনির হাত ধরে ইতালি গিয়ে ইনগ্রিড বার্গম্যানের সতীনের পদে অধিষ্ঠিতা হন। সোনালীর ওরিএন্টাল চেহারা ও ক্রীম দেওয়া কফির গাত্রবর্ণ সাহেবদের চোখে irreristible। সোনালীর বড় বোন হাসি ফর্সা। আরও অনেক সুন্দর দেখতে এবং আমার বাল্যবন্ধু অক্‌সফোর্ডের প্রোফেসর তপন রায় চৌধুরীর স্ত্রী। আমার বাড়িতেই ওঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল ১৯৬০ সালে।

স্মৃতিচারণে কয়েক বছর টপ্‌কে যেতে হচ্ছে। সোনালীর জোড়ে ইতালি যাত্রা বিস্তর আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, এমনকি প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুও রসোলিনি ও সোনালীকে যাতে ভবিষ্যতে ভারতে আসার ভিসা না দেওয়া হয় সেই মর্মে হুকুমজারি করেছিলেন। ক্যাথলিক রসোলিনির প্রথমা স্ত্রী বর্তমান অতএব ইনগ্রিড

বার্গম্যান বা সোনালীর সঙ্গে তথাকথিত বিবাহ অসিদ্ধ এবং বেআইনি এই মর্মে আমেরিকার *Time* ম্যাগাজিন সোনালীর ছবি দিয়ে আধকলাম রসিয়ে রসিয়ে লেখে। প্রৌঢ় রসোলিনি সাহেব দেখতে শুনতেও অতি সাধারণ, তাঁর মধ্যে মেয়েরা কী খুঁজে পায় এ রহস্য ফিল্ম দুনিয়ার হার্টথ্রব ইনগ্রিড বার্গম্যানের শ্বশুরবাড়ি থেকে কলকাতার কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের চ্যাংড়ামহল পর্যন্ত প্রচুর আলোচনার খোরাক যুগিয়ে ছিল। এরই মধ্যে সনৎ লাহিড়ীর মামা (আমরা সুমামা বলতাম) ছুটতে ছুটতে একদিন কফি হাউসে হাজির হলেন। ঢুকেই আমাদের টেবিলে সটান এসে চেয়ার টেনে প্রশ্ন, 'হ্যাঁগা, শুনলাম হরিসাধনের বউ পালিয়েছে, এ খবর কি সত্যি?' আমরা কোরাসে ঘাড় নাড়লাম। সু মামা চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলতেন, পরম আক্ষেপের সঙ্গে তাঁর বক্তব্য 'লোকটা কপাল করে জন্মেছিল ভাই। দেখনা এত লোকের বউ পালায় আমার কপালে এমন সতীলক্ষ্মী মামী তোমাদের, গেল তো গেল ওই মলঙ্গা লেনে বাপের বাড়ি, সন্ধে হলেই ফিরে এসে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। হরির মত কপাল কি করেছি যে বউ পালাবে?'

যাই হোক 'ঘরে বাইরে' বের হল না। ডিরেকটর হরিসাধন দাশগুপ্ত চিত্রনাট্যকার সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তারপর পাঁচবছর কথা বলেননি। মানিকবাবুর আপত্তির কারণ সঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। শোনা যায় প্রোডিউসাররা বাগড়া দিয়েছিল। এটা ঢোকাতে হবে, ওটা চলবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। কমলকুমার মজুমদারও তারও আগের থেকে 'ঘরে বাইরে'র একটা চিত্রনাট্য লিখছিলেন। তাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ সাধারণের পর্যায়ে পড়ে না এমন কিছু ডিটেলও দেওয়া ছিল, যথা নিখিলেশের মৃতদেহ নিয়ে যখন ঘোড়াটা ফিরে আসছে তখন ক্যামেরা প্যান করে পুকুরে কালো মেঘের ছায়ার প্রতিবিম্ব ধরবে এই জাতীয় আর কি। ওই চিত্রনাট্য নিয়ে মানিকবাবুর সঙ্গে কমলকুমার আলোচনা করতেন, স্কেচবুক থেকে দুচারটে ছবিও দেখাতেন কিন্তু আসল চিত্রনাট্যটির খসড়া কখনও দেখান নি।

অনেকদিন ধরেই তখন শুনে আসছিলাম মানিকবাবু 'পথের পাঁচালি'র স্ক্রিপ্ট তৈরি করছেন, সঙ্গে ছোট ছোট স্কেচ। ছবি আঁকার প্রতিভা ওঁর বিধিদত্ত এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। তার ওপর পেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসু ও রামকিঙ্কর বেজের কাছে তালিম। ডি জে কীমার ভারতবর্ষের নামকরা বিজ্ঞাপন কোম্পানি, উনি তখন তার আর্ট ডিরেকটর। অন্যদিকে সেই কোম্পানিরই বড় সাহেব ডি. কে. গুপ্ত মহাশয়ের সিগনেট প্রেসের বইয়ের সত্যজিৎ রায়ের আঁকা প্রচ্ছদ দেশে ও বিদেশের গ্রাফিক আর্টিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল সংগীতের গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা ওঁর অসাধারণ। হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রতিও ওঁর যথেষ্ট অনুরাগ। এ ছাড়া উনি তখন সিনেমার চোখ দিয়েই সব কিছু দেখতেন তার পরিচয় দৈনন্দিন আড্ডায় প্রায়ই আমরা পেতাম। অল্পবিস্তর

ঠাট্টা ইয়ার্কিও করতাম এ নিয়ে তার প্রধান টার্গেট অবশ্য ছিলেন আর্ট ফিলম গেঁড়ে চিদানন্দ দাশগুপ্ত। অতএব মানিকবাবু ছবি করবেন এটা কিছু আশ্চর্য বলে মনে করিনি। তবে কবে সাতমণ তেল পুড়বে এবং রাধা নাচবে এ নিয়ে আমাদের সংশয় ছিল।

'পথের পাঁচালি'র জন্মের ইতিহাস অনেকেই অবগত আছেন। তবুও যতটা জানি লিখছি একজন বন্ধুর দৃষ্টিকোণ থেকে। এ তথ্য কিছু ওঁর মুখ থেকে শোনা। কিছু আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ ওঁর মামাতো ভাইবোনদের মারফতে পাওয়া। কিছু ঝালিয়ে নিয়েছি সম্প্রতি সত্যজিৎবাবুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ পার্থ বসুর সঙ্গে কথাবার্তায়।

একদিন খবর পেলাম 'পথের পাঁচালি'র শুটিং শুরু হয়ে গেছে। শাঁটুলবাবু এসে বললেন 'মানিকবাবু ক্যামেরা ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়েছেন মশায়, গ্রামেগঞ্জে ছবি তোলা হবে। ফাঁকা মাঠে গোল দেবেন।'

'ফাঁকা মাঠে মানে?'

'আরে বুঝলেন না, বাংলা ছবি তো সব টালিগঞ্জের স্টুডিওতে তোলা হয় সেট সাজিয়ে। এ হল নিউ সিনেমা, নতুন ফীলড, নিও রিয়ালিজম-এর ছড়াছড়ি কোনো প্রকার কৃত্রিমতার গন্ধ থাকবে না। একটা নতুন দিক খুলে যাচ্ছে বাংলা সিনেমায় মশায়। গড়িয়া পার হয়ে বোড়াল বলে এক গ্রামে ভাঙা বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেট হয়েছে হরিহরের বাড়ি। সুব্রত বাঁড়ুজ্জের বউ করুণা সর্বজয়া সাজছে। ক্যামেরাম্যান সুব্রত মিত্র, আর্ট ডিরেক্টর বংশী চন্দ্রগুপ্ত, অপু দুগ্‌গা যোগাড় হয়ে গেছে, মায় ইন্দির ঠাকুরুণের খোঁজে মানিকবাবু বে-পাড়ায় গিয়েছিলেন নিভাননীর বাড়ি। তার এক পাতানো মা আছে আশির কাছাকাছি বয়স নাম চুনীবালা দাসী, আপনার জন্মের আগে কলকাতা স্টেজে নাকি অ্যাক্টিং করতেন। আছেন কোথায় মশায়?'

কমল মজুমদার উপস্থিত ছিলেন, বললেন 'বেম্মবাড়ির ছেলে, জীবনে শহর ছেড়ে বের হয়নি, গ্রাম দেখেনি। সঙ্গে একটা কাশ্মীরি না পাঞ্জাবীকে নিয়েছে আর্ট ডিরেক্টর করে, ক্যামেরাম্যান শুনছি জীবনে মুভি ক্যামেরা ধরেনি। 'নারায়ণ নারায়ণ'!'

খোঁজ করে জানলাম প্রোডাকশন ম্যানেজার অনিল চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে মানিকবাবু নিভাননীর বাড়ি গিয়েছিলেন। যাওয়া মাত্র খাতির করে ওঁদের বসানো হল চেয়ার পেতে। চুনীবালার বয়সকালের ফটো দেখানো হল, বিভিন্ন পোশাক পরে ছবি, মায় যুদ্ধের পোশাকে বন্দুক হাতে। চুনীবালা বললেন 'দাঁড়ান, আমার কাছে যে মেয়েরা আছে সোন্দর দেখতে তাদের ডেকে পাঠাচ্ছি, ওদের মধ্যে বেছে পছন্দ করে নিন। মানিকবাবু বললেন 'না, আমরা আপনাকেই চাই।'

'ওমা, আমি কি করব এ বয়সে? চামড়া কুঁচকে গেছে। রংটং মাখালেও

ক্যামেরায় ধরা পড়ে যাবে।'

মানিকবাবু আশ্বস্ত করলেন ওসব কিছু করতে হবে না। বৃদ্ধার পার্ট, মেক আপের প্রয়োজন নেই। গান টান জানেন কিনা জিজ্ঞেস করায় উনি সেই গানটি গাইলেন 'হরি দিন তো গেল সন্ধে হল পার কর আমারে,' যেটি ছবিতে মানিকবাবু পরে লাগিয়েছেন। ছড়াও বললেন 'আঁটুল বাঁটুল শামলা শাঁটুল,' বিরাট ছড়া প্রায় ষাট লাইনের। মানিকবাবু ভীষণ ইম্‌প্রেস্‌ড। চলে আসার সময় নিভাননী বললেন 'আপনারা যে মাকে নেবেন দশ টাকা রোজ দিতে পারবেন তো?' অনিলবাবু জবাবে বললেন 'কোন চিন্তা নেই আমরা কুড়ি টাকা করে দেব। তা বেচারি চুনীবালাদাসীর কোনো চাহিদা ছিল না শুধু সন্ধের ঝোঁকে একটু আফিং। একদিন নাকি আফিং পেটে না পড়ায় চোখটোখ উলটে অজ্ঞান হবার যোগাড়। সেদিন শুটিং বন্ধ করতে হয়েছিল।

হরিহর সর্বজয়া অপু দুর্গা ইন্দির ঠাকরুণ প্রায় নিখরচার আর্টিস্ট সবই যোগাড় হল কিন্তু টাকা কোথায়। হেন প্রোডিউসার নেই যার দ্বারস্থ হননি মানিকবাবু। কেউ শুনে প্রশ্ন করে দুগগার বয়স কত? অত কচি মেয়ে দিয়ে চলবে না। কেউ বলে নাচ নেই গান নেই এর আগে মানিকবাবু কোনো ছবি করেননি সিনেমা জগতের লোকেরা ওঁর নামও শোনেনি। বাপ-পিতামহর নাম হয়তো এক-আধজন শুনে থাকবে তাঁরা বেলাইনের লোক তার ওপর ভর করে তো টাকা ঢালা যায় না। কল্পনা মুভিজ শুনেছিলাম কিছু টাকা দিয়েছিল কিন্তু মাঝপথে বন্ধ করে দেয়। তখন শুটিং চলছে টিফিনের পয়সার যোগাড় পর্যন্ত নেই। এমত অবস্থায় অনিলবাবুর অনুরোধে মানিকবাবুর স্ত্রী মঙ্কুদি গয়না তুলে দেন তাঁর হাতে। বন্ধক দিয়ে বারশো টাকা পাওয়া গিয়েছিল। তাতে দিন তিনেকের শুটিং হয়েছিল। মানিকবাবু অর্থের সন্ধানে পাগলের মত দৌড়াদৌড়ি করছেন, সে খবর পেয়ে ইতিমধ্যে দু একজন প্রোডিউসার 'পথের পাঁচালি'র প্রয়াত লেখক বিভূতিভূষণের স্ত্রী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধরেছিলেন এই বলে যে আমাদের অনুমতি দিন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে স্ক্রিপ্‌ট করাব, ওঁর জীবনের শখ। প্রেমেন্দ্র মিত্ররও ইচ্ছে ছিল ছবিটা করার। আর একদল গিয়ে বলল 'দেবকী বোস আমাদের ডিরেক্টর তিনি রাজি আছেন। আমরা স্ক্রিপ্‌টও তৈরি করেছি।' রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শোনালেন ওঁরা সে স্ক্রিপ্‌ট। তাতে অপুর বয়স হু হু করে বেড়ে গেছে। দুগ্‌গা আছে সামান্যই তার রোল, মৃত্যু টিত্যু কিছু নেই। 'অপরাজিত' থেকে লীলা ঢুকে পড়েছে অতএব পাঁচজনের পছন্দ মত প্রেম কাহিনীও আছে। শুধু এঁরা নয় রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তখন একের পর এক লোক আসছে, মোটা টাকার অফার দিচ্ছে, বলছে 'আপনার ছেলে বাবলু তো ছোট, একে মানুষ করতে হবে, আপনার বাড়ির দোতলাটাও হয়ে যাবে, আমরা এখনই দশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে

যাচ্ছি।' রমা দেবীর এক জবাব 'না আমি কথা দিয়েছি সত্যজিৎ রায়কে। আমার বাবলুর মত ওঁরও ছোটো বয়সে বাবা চলে গেছেন। ওঁকে যে কথা দিয়েছি তা রাখব।' এ ঘটনা হয়তো বেশি লোক জানে না, জানলে শুধু ফিল্মের দুনিয়া বা আর্ট-কালচারের জগৎ নয় আমাদের মত বহু সাধারণ মানুষেরও কৃতজ্ঞতা উনি অর্জন করতেন। প্রথম সন্ধ্যার প্রথম শোর শেষে উনি অশ্রুসজল চোখে সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে বলেছিলেন 'আপনিই পারলেন ওঁর পথের পাঁচালির মান রাখতে, আর কেউ এরকম ছবি করতে পারত না।'

যখন 'পথের পাঁচালি'র ক্যাশ ফ্লো তলানিতে ঠেকেছে আর কেউ নেই মানিকবাবুর পাশে দাঁড়াবার, তখন হঠাৎ অনিল চৌধুরীকে তাঁর এক বন্ধু, রাইটার্স বিল্‌ডিং-এ পোস্টেড ছিলেন, তিনি বললেন 'সত্যজিৎবাবু তো ব্রাহ্ম সমাজের লোক ওঁকে বল না বিধানবাবুকে ধরতে, সম্ভব হলে বেলা সেনের সুপারিশ নিয়ে। এই তো কিছুদিন আগেই উদয়শঙ্করকে তাঁর কল্পনা ফিল্‌মের জন্য হাজার দশ পনেরো টাকা দিয়েছেন।' অনিলবাবু এসে মানিকবাবুকে বললেন ওঁর মা সুপ্রভা দেবীর সামনেই। সুপ্রভা রায়ের খুব আপত্তি, দুটো জিনিস ছেলের ওঁর ঘোরতর অপছন্দ, ধূমপান আর ফিল্‌ম করা। 'এ বংশে কেউ ফিলম দেখেনই নাই, তোমার বাবাও করেন নাই, ঠাকুরদাও করেন নাই কোনো দিন থিয়েটার ফিল্‌মের জগতের সংস্পর্শেই আসেন নাই।' সুকুমার রায়ের বাড়িতে সবাই আধুনিক ভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু থিয়েটার-সিনেমা থেকে শতহস্ত দূরে থাকতেন সবাই। হেরম্ব মৈত্রর মত কট্টর না হলেও সব সেকালের ব্রাহ্মদের মধ্যে পৌত্তলিকতার পাশাপাশি সিনেমা থিয়েটার ও বাইজীদের গান সমান বিভীষিকাময় অপবিত্র আমোদ প্রমোদ বলে গণ্য হত। পার্থ বসুর কাছে শুনেছি পান্তির মাঠের স্বদেশী মেলায় গেছেন ব্রাহ্মিকারা। শোনা গেল গহরজান এসেছেন। শোনামাত্র কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ির মেয়েরা উলটো দিকে দৌড় লাগাল, পেছু পেছু সীতাদেবী, শান্তা দেবী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়েরাও, এই ভয়ে যদি গহরজানের দৃষ্টি পড়ে কোনো পাপ হয়ে যায়। যে যাক্, শেষমেষ সুপ্রভা দেবী রাজি হলেন, 'আমি বেলারানীকে খুব চিনি, আমি গিয়া কইব।' বেলারানী কর্নেল জে. এল. সেনের স্ত্রী, ওঁদের মেয়ে অর্চনার সঙ্গে বিধান রায়ের ভাইপো ব্যারিস্টার সুবিমল রায়ের বিয়ে হয়েছিল। ডাঃ রায় ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু, সারাদিন খাটাখাটনির পর সন্ধ্যাবেলাটা ওঁদের রোলান্ড রোডের বাড়িতে প্রায়ই কাটান। বেলা সেন সব শুনে বললেন 'ঠিক আছে বিধানবাবু এর পর যেদিন আসবেন বলব। স্ক্রিপ্‌টটা ওঁকে শোনাতে হবে।'

তারপর একদিন শুভ মুহূর্তে অর্চনা রায়ের সঙ্গে মানিকবাবু রাইটার্স বিলডিং-এ দোর্দণ্ড প্রতাপ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ঘরে দুরু দুরু বক্ষে হাজির

হলেন। দু তিনজন আমলা বসে আছেন। তাঁদের কাজ বিধানবাবুর 'হাঁ'র সঙ্গে 'হাঁ' মেলানো এবং 'না' বললে সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ নজির খাড়া করে প্রস্তাবকে খণ্ডন করা। মোটামুটি সংক্ষেপ করে স্ক্রিপ্ট শোনানো হল। শেষটায় পৌঁছে বিধানবাবু বললেন 'সে কি! হরিহর গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে কি! গ্রামে এখন এত কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট চলছে। ও হবে না শেষটা বদলে দাও। গ্রামের লোকের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সরকার থেকে লোন নিয়ে ট্র্যাকটর চালাক হরিহর। ওসব কাশী-টাশি যাওয়া চলবে না।' মানিকবাবুর মুখ থেকে কথা সরছে না হতভম্ব হয়ে গেছেন, আমলারা ঘাড় নেড়ে বিধানবাবুর বক্তব্যকে একবাক্যে সমর্থন করছেন। তথ্য বিভাগের ডিরেকটর মাথুর সাহেব গোড়া থেকেই সিনেমার ওপর সরকারি টাকাকড়ি খরচা করার বিরুদ্ধে ছিলেন তিনিও কিছু বলার চেষ্টায় ছিলেন কিন্তু অর্চনা রায় মুখ খোলায় চুপ করে গেলেন। পরেও খুব বাজে নোট দিয়েছিলেন সেটার কপি মানিকবাবু কাছে ছিল শুনেছিলাম।

'এ বইটা যাঁর সে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, বাধা দিয়ে ডঃ রায় বললেন 'বিভূতিকে বলে দাও আমার নাম করে শেষটা বদলে দিক তা না হলে কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের ফান্ড থেকে টাকা দেওয়া যাবে না।'

ভাগ্যিস অর্চনা দেবী ছিলেন, উনিই একমাত্র শ্বশুরমশাইয়ের কথার ওপর কথা বলার সাহস রাখতেন। উনি বোঝালেন বিভূতিবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করার একটু অসুবিধে আছে কারণ তিনি এখন আর ইহজগতে নেই। আর তা ছাড়া 'পথের পাঁচালি' বইটা বাংলা সাহিত্যের ক্ল্যাসিক্সের পর্যায়ে পড়ে, ঐ প্রকার আমূল পরিবর্তন করলে লোকেরা হৈ হৈ করবে, কাজটা ঠিক হবে না, খারাপ দেখাবে।

'তা হলে কী করা যায়, কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের ফান্ড থেকে না হলে কোথা থেকে টাকা বার করব?'

একজন আমলা বললেন 'বইটার নাম যখন 'পথের পাঁচালি' তখন পি. ডবলিউ. ডির খাতে খরচটা দেখানো যায় না? ওরাই তো পথঘাটের চার্জে।'

বিধানবাবু সে কথায় কান না দিয়ে সত্যজিৎ রায়ের দিকে ফিরে বললেন 'দেখা যাক্ কী করতে পারি, তুমি ছবি তোলো তো মাথুর কিছু কিছু টাকা তোমায় দেবে তাইতে কাজ চালাও।'

সরকারি কারবার। কিভাবে টাকা আসত পাঠক খানিকটা আন্দাজ করতে পারবেন। কয়েকশো টাকা নিয়ে শুটিং হত, তারপর সেই হিসেবের ফাইল তথ্য বিভাগ ও ফিনান্‌স-এর মধ্যে কিয়ৎকাল মাকু বুনত, তারপর পরের কিস্তি এসে পৌঁছত। ইতিমধ্যে দয়াময় ঈশ্বরের অশেষ কৃপা, দুর্গা লম্বা হয়ে যায়নি, অপুর বয়সোচিত কারণে গলা ভাঙেনি, সবচেয়ে বড় কথা ইন্দির ঠাকরুন পটল তোলেননি এমন কি তাঁর কি একটা অপারেশন হবার কথা সেও উনি কাটিয়ে উঠেছেন।

একদিন মানিকবাবুর মামার বাড়ি ১৭২/২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এ কিছু 'রাশেজ্' দেখান হল স্ক্রীন খাটিয়ে। কিছু গ্রামের সীন, হরিহরের বাড়ি, মরা ব্যাঙ, জলের ওপর ফড়িং-এর নৃত্য ইত্যাদি। সত্য কথা বলতে কি আমরা বিশেষ ইম্‌প্রেস্‌ড্ হইনি। তারপর যখন 'পথের পাঁচালি' দেখলাম, এবং একবার নয় পর পর পর তিনবার, তখন হতবাক্ হয়ে গেলাম। বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করিনি বলেই এমন স্বচ্ছ সরল অসাধারণ সুন্দর মর্মস্পর্শী ছবি আমায় বিস্মিত করেছিল, সেই সঙ্গে পণ্ডিত রবিশংকরের সাথ সঙ্গত। ধূর্জটিপ্রসাদেরও খুবই ভাল লেগেছিল বিশেষ করে চুনীবালার অভিনয়। পরে ওঁর জার্নাল 'মনে এলো'তে লিখেছিলেন:

> এই যে পথের পাঁচালীতে আশি বছরের বৃদ্ধা চুণিবালা অভিনয় করলেন তার জন্য তাঁকে কী সম্মান দেওয়া হলো? 'আকাদেমি' খাড়া করলেই হয় না। চুণিবালা তখন নগণ্যা ছিলেন। কিন্তু পথের পাঁচালীর সার্থকতার জন্য কী তিনি দায়ী নন। বিদেশে ক'জন মহিলা এই ধরনের অভিনয় করতে পারেন? For whom the bell Tolls-এ ক্যাটারিনা যখন মেরিয়া অভিনয় করলেন তখন ধন্য ধন্য পড়ে গেল। চুণিবালার কিইবা খাতির হয়েছে? বেসুরোয় 'দিন যে গেল সন্ধে হল পার কর আমারে' কেউ গাইতে পারেন রাক্ষস খোক্কসের গল্প কেউ করতে পারে ঐভাবে? 'ও বৌ হল কি—হলো কি—হলো' তিনবার তিন পর্দায়?[১]

সমালোচনা যে হয়নি মানিকবাবুর পরিচালনার তা' বললে ভুল হবে। শাঁটুলবাবুর জ্যাঠতুতো ভাই কমলাদা একদিন কফি হাউসে এসেছিলেন। ইনি রেলে চাকরি করতেন, সম্ভবত টিকিট চেকারের। যুদ্ধের সময় আসামের কোনো অখ্যাত রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুমে ঘুমোচ্ছিলেন। মার্কিন সৈন্যরা তখন ওই অঞ্চলে কিলবিল করছে। ওদের মধ্যে একজন ঘুমন্ত কমলাদার পশ্চাতে বিরাশি সিক্কার একটি পদাঘাত করে প্রশ্ন করেছিল 'হোয়ট্‌স দিস বাস্টার্ড ডুইং হিয়ার স্লিপিং উইদাউট আ উওমান?' এর কিছুকাল পরেই শাঁটুলবাবুর জ্যাঠামশায় পুত্রের কাছ থেকে একটি পোস্টকার্ড পান। তাতে লেখা ছিল 'পূজনীয়েষু, বুদ্ধদেব বোসের ভাষায় আমারও জীবনে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়াছে, পত্রপাঠ আশীর্বাদ পাইলেই পিঁড়িতে বসিবার ব্যবস্থা করিব।' চিঠি পেয়ে নাকি জ্যাঠামশায়ের ফিট হয়েছিল। এইসব টুকরো-টুকরো শাঁটুলবাবুরর দেওয়া খবরের মারফত যে কমলাদাকে কল্পনা করেছিলাম প্রথম আলাপে দেখলাম উনি কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের মানুষ। প্রথমবার সত্যজিৎ রায়ের সম্মুখীন হয়ে উনি নেহাতই বিনম্রভাবে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন।

১. ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, ২য় সম্ভার, পৃ. ৯৮, দে'জ পাবলিশিং।

(১) গ্রামে শুধু কি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আর কচি বাচ্চাদের এবং মধ্যবয়সী-স্ত্রীলোকদের বাস? দেশে কি যুদ্ধ লেগেছে এবং জোয়ানরা সবাই যুদ্ধে চলে গেছে?

(২) একটাও পাখির ডাক শোনা গেল না গ্রামে দেড় ঘণ্টায়, কি আশ্চর্য।

(৩) রেলগাড়ি সিকোয়েন্সে অপু খাচ্ছিল শ্যামসায়রী আখ, দুগ্গার হাতে ছিল দিশি আখ, লক্ষ্য করেছিলেন কি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনে যাই থাকুক আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মানিকবাবু হেসেছিলেন। কমলকুমার মজুমদারের এই জাতীয় উক্তি 'পাড়াগাঁয়ে হিন্দু পরিবারে হেঁসেলের আঁশের কাপড়ে কেউ লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে হাত দেয়, না বিছানায় এসে বসে?' মানিকবাবুর ভাল লাগেনি। উনি বলেছিলেন কমলবাবুকে পল্লীগ্রামের ওপর ছবি করে আপনাকে খুশি করতে পারব না। আর একবার মানিকবাবু ওঁকে বাড়িতে আসতে অনুরোধ করায় কমলকুমার বলেছিলেন 'আপনার বাড়ি যেতে বড় অস্বস্তি হয়, সব বড় বড় লোকরা আসেন আপনার ওখানে।' মানিকবাবু বললেন 'তা বেশ তো, কবে আসবেন আপনি জানাবেন, চাট্টি ছোটলোকের ব্যবস্থা করে রাখব।'

আমি বলেছিলাম 'মানিকবাবু, আপনার পথের পাঁচালিতে সবই সুন্দর, দারিদ্র্যও সুন্দর, শীতে গরম জামা নেই, বর্ষায় ভাঙা বাড়িতে থেকেও সবাই মনে হয় আনন্দে আছে, প্রথম বর্ষায় ভিজে দুগ্গার সান্নিপাতিক বিকার ও মৃত্যুর দৃশ্য এতই সংযত যে দারিদ্র্যজনিত দুঃখ স্পর্শ করবে না।' উনি শুনে গম্ভীরভাবে আমায় বলেছিলেন 'বিভূতিবাবুর বইটা পড়ে দেখবেন, ওই একই কথা মনে হবে।' বহু বছর পরে পার্থ বোসও আলোচনার মধ্যে এই কথাই বলেছিলেন, বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালির দারিদ্র্য, 'অপরাজিত'য় অপুর কলেজ জীবনে স্ট্রাগ্ল, বিয়ের পর জমিদারের মেয়ে অপর্ণাকে মনসাপোতায় খড়ের চালের ঘরে তোলা সব কিছুর মধ্যেই অসম্ভব রোম্যান্টিকতা আছে যা দুঃখকষ্ট ছাপিয়ে যায় পাঠকের মনে।

'পথের পাঁচালি'র দেশে ও বিদেশে অভাবনীয় সাফল্য মানিকবাবুর মাকে বলাবাহুল্য খুবই আনন্দ দিয়েছিল, নানা রিভিউয়ের কাটিং রাখতেন এবং খুঁটিয়ে পড়তেন। কিন্তু আবার ছবি করবেন মানিকবাবু শুনে উনি প্রচণ্ড আপত্তি করেছিলেন। মানিকবাবু নাকি মাকে বলেছিলেন একটা ছবি করেই ছেড়ে দেবেন। আবার নতুন ছবি করবেন সে বাজারে আঠারশ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে এ মাকে রাজি করাতে ওঁর অসম্ভব বেগ পেতে হয়েছিল। শেষে একদিন বুলা মহলানবিশ এসে সুপ্রভা দেবীকে বোঝালেন 'শোনো বৌঠান, ও যে বাড়ির ছেলে সে বাড়িটাকে বিশ্বাস করো তো? মানিক যে ফস্ করে করে কোনো বেহিসেবী খারাপ একটা কাজ করে বসবে এ হতে পারে না। আর চাকরি তো এখন ছাড়ছে না, চাকরিও করছে ছবিও তুলছে। তুমি আপত্তি কোরো না ওকে মনের মতো ছবি করতে দাও, কোনো সমস্যা যদি হয় আমরা তো আছি, আমাদের ওপর

তো তোমার বিশ্বাস কিছুটা আছে।' বুলা মহলানবিশের ওকালতিতে কাজ হয়েছিল। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি', 'অপরাজিত' ও 'অপুর সংসার' মহম্মদ আজহারুদ্দিনের দেবু টেস্ট সিরিজে পর পর তিনটি সেঞ্চুরির মত ইতিহাস হয়ে রয়েছে।

'অপরাজিত' যখন তোলা হচ্ছে তখন আমি বিদেশে। শাঁটুলবাবুর চিঠিতে জানলাম 'লীলার চরিত্রে আমাদের বন্ধু ছক্কু চক্রবর্তীর (যুধাজিৎ) কন্যা অলকাকে সত্যজিৎবাবু পছন্দ করিয়াছেন। মেয়েটি শুধু দেখিতে সুন্দরী নয় অভিনয়েও বিশেষ পারদর্শিতার প্রদর্শন করে। শুটিং চলিতেছিল, সহসা বাংলা ফিল্ম জগতের বিশিষ্ট অভিনেতা বসন্ত চৌধুরীর আবির্ভাব, তিনি তাঁর ভাবী স্ত্রীকে সিনেমার জগতে প্রবেশ করিতে কদাচ দিবেন না, সত্যজিৎ বাবুর ছবিতেও নয়। এই কথা বলিয়া অলকাকে সর্বসমক্ষে অর্জুনের সুভদ্রাহরণের ন্যায় জোর করিয়া গাড়িতে তুলিয়া বসন্ত চৌধুরী অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এখন লীলাহীন 'অপরাজিত'র শুটিং আরম্ভ হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহাতে সত্যজিৎবাবুর বড়ই লোকসান হইল।'

বন্ধুবর সনৎ লাহিড়ীর ভাগ্নী অলকা তার কুমারকাকার বড়ই ন্যাওটো ছিল। খবরটা পেয়ে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম। ওদের বিবাহের পর বহুদিন যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখন তারা দুজনেই পরলোকে!

বড় আফশোস হয় কমলকুমার মজুমদারকে সৈয়দ মুজতবা আলির সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে পারিনি, পারলে শ'তিনেক পাতা ভরিয়ে ফেলতে পারতাম। যদিও কোনো প্রকাশক সাহস করে ছাপত না। মুজতবা আলির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ কফি হাউসে প্রাক্‌-পথের পাঁচালির যুগে। সম্ভবত শাঁটুলবাবুই ওঁকে পেড়েছিলেন। এসেই উনি আমাদের হৃদয় জয় করবার উদ্দেশ্যে একটি নোংরা গল্প ফেঁদে বসলেন। আর পাঁচটা কথাবার্তার মধ্যে আমি গুষ্টিসুখ কথাটা ব্যবহার করায় উনি প্রশ্ন করলেন 'এ কথাটা কোথায় পেলি? (ততক্ষণে আমি আপনি থেকে তুইয়েতে নেমে গেছি) মনে হচ্ছে মুজতবা আলির বই পড়েছিস।' আমি ঘাড় নাড়তে উনি বাকি সবাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন 'তোমরাও পড়েছ দেশে বিদেশে'? তাই পাবলিশার আমায় বলছিল আমার বই ছ কপি বিক্রি হয়েছে।' আঙুল দিয়ে আমাদের গুণলেন এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়। সত্যজিৎ রায়ের পিতৃপুরুষের পরিচয় শাঁটুলবাবু দিতে আলিসাহেব বললেন 'তুমি তো মস্ত বড় বাপের ছেলে। ওই শতরঞ্চি মলাটের হযবরল আর তোমার বাপের ছবি আঁকা 'আবোল তাবোলে'র প্রচ্ছদ বদলালে কেন ভাই? শুনেছি সিগনেট প্রেসের সব বইয়ের মলাটের ছবি টবি তুমিই আঁকো।' আমাকে বললেন 'তোর বাবা তো ভরত মুনি শার্ঙ্গদেবের পরই সংগীতজগতের বিখ্যাত অথরিটি গুরুদেব পর্যন্ত মানতেন, তা ওই নভেল তিনটে লিখতে গেল কেন? বাপ্‌রে! ঘেমে নেয়ে বিষম খেয়ে ঘটি ঘটি জলটল খেয়ে শেষ করেছিলাম

কোনোক্রমে। তুই লিখিস?'

বললাম 'না'।

'তবু ভাল। যদি লিখিস তো আনাতোল ফ্রাঁসের কথা মনে রাখবি "ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিচ পস্টারিটি, ট্র্যাভেল লাইট"। তোর ইনটেলেকচুয়াল বাপের মত অত মাথা খাটাস্‌নি।'

আলি সাহেবের আদেশ শিরোধার্য করে পঁয়ষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত বই-টই না লিখেই কাটিয়েছিলাম। তার পর কি যে মতিচ্ছন্ন হল। তবে ধূর্জটিপ্রসাদের কড়ে আঙুলে যা বিদ্যে ছিল তাও আমার নেই, অতএব মাথা টাথা খাটাবার প্রশ্নই ওঠে না। আমার পুঁজিতে যা আছে তার চেয়ে কম মাল নিয়ে ট্র্যাভেল করা যায় না।

পার্ক সার্কাসে ওঁর বাড়ি মাঝে মাঝে যেতাম জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করতে। শক্ত শক্ত বিষয় এত সহজ আর মনোগ্রাহী করতে আর বড় একটা কাউকে দেখিনি। কখনও শোনাচ্ছেন বিভিন্ন ধর্মের মূলতত্ত্ব, কখনও বা হুমায়ুনের কবরের মকবরা কীভাবে শাহ্‌জাহানের তাজমহলের আর্কিটেক্‌টকে প্রেরণা দিয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। Raconteur ও বৈঠকবাজ হিসেবে সৈয়দ মুজতবা আলিকে আমি ধূর্জটিপ্রসাদের কিঞ্চিৎ ওপরে রাখব, চিন্তাধারার গভীরতার বা নতুন নতুন আইডিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পেশ করার ব্যাপারে ধূর্জটিপ্রসাদকে ও সত্যেন বোস মশায়কে মুজতবা আলির ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। তবে স্মরণশক্তি আলি সাহেবের সাংঘাতিক ছিল, বাবার মুখেই শুনেছি বোম্বাইয়ে চার্চিল চেম্বার্‌সে শচীন চৌধুরীর আড্ডায় উনি পরশুরামের 'ভূশণ্ডির মাঠে' গল্পটি পুরো মুখস্থ শুনিয়েছিলেন। অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী অবশ্য ঘোড়দৌড়ের ভাষায় আলি সাহেবকে হ্যাকে মারতেন। কেউ কেউ বলে মহাভারতের নিরানব্বুই হাজার শ্লোক ওঁর মুখস্থ ছিল। সত্যি মিথ্যে বলতে পারব না তবে একবার বক্তৃতা করতে করতে বার্ট্রান্ড রাসেলের *Power* থেকে একটি প্যারাগ্রাফ কোট করতে চেয়েছিলেন, সেটি উদ্ধৃত করার পর থামতে পারলেন না, স্মরণশক্তির এমনই প্রেসার যে পরের গোটা চারেক পাতাও গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেলেন। থামলেন যখন হঠাৎ খেয়াল হল যে ওগুলি relevant নয়, অপ্রয়োজনীয়।

ফর্সা ছিমছাম মানুষটি, গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি কোঁচানো ধুতি ও হাতে ছড়ি নিয়ে আলি সাহেব আড্ডা দিতে বসতেন। বাড়ির মধ্যে ছড়ির কী প্রয়োজন জিজ্ঞেস করায় বলতেন 'তোদের মত অর্বাচীন অপোগণ্ডদের ঠ্যাঙানোর জন্য ওটা হাতের কাছে রাখি।' একদিন সত্যি সত্যিই মার খেতে খেতে বেঁচেছিলাম। সেদিন উনি খুব একটা মৌজে ছিলেন না। কী একটা ব্যাপারে আমি তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ায় উনি বললেন 'দ্যাখ্‌ তুই নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবিস, না? ওই তো তোর আসল গণ্ডগোল। আমায় দ্যাখ দিকিনি, বোকা সেজে থাকি, কত অ্যাডভান্টেজ।' জবাবে আমি বলেছিলাম 'কি

জানেন, চেহারাটাও এসব ব্যাপারে একটু সাহায্য করে।' 'হারামজাদা বিটলে বামুনের বাচ্চা,' বলে ছড়ি দিয়ে আমাকে পেটাতে বাকি রেখেছিলেন। গালাগাল যা দিয়েছিলেন তা ছাপার অযোগ্য। দিন তিনেক পরে একটা জনি ওয়াকার নিয়ে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেদিন প্রাণখুলে আশীর্বাদ করতে করতে বলেছিলেন 'শোন্ এই ব্যবস্থাই ভাল, আমি সাতটা ভাষায় খিস্তি করতে পারি। তোকে মাঝে মধ্যে গালাগাল করব আর তুই স্কচ্ খাওয়াবি। কি বলিস?'

এমনিতেই মুখ আলগা, পেটে কিছু পড়লে আরও লাগাম ঢিলে হয়ে যেত আলি সাহেবের। আর বয়স টয়েসের তোয়াক্কা বড় একটা উনি করতেন না। এই সূত্রে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। তখন উনি শান্তিনিকেতনে কিছুকাল অধ্যাপনা করছেন। অন্নদাশঙ্কর রায় আই. সি. এস থেকে প্রিমেচিউওর রিটায়ারমেন্ট নিয়ে শান্তিনিকেতনে বাড়ি করে লেখাপড়া আর বাগানের তদারক করে দিন কাটাচ্ছেন। বয়স এবং খ্যাতনামা সিনিয়র সাহিত্যিক হিসেবে সকলেরই সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অন্নদাশঙ্করের আমেরিকান স্ত্রী লীলা রায় আক্ষরিক অর্থে যথার্থ সহধর্মিণী ছিলেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন বাঙালি হবার। একটি ইংরেজি শব্দও ব্যবহার করতেন না। একদিন সাইকেল চড়ে মুজতবা আলি অন্নদাশঙ্কর রায়ের বাড়িতে উপস্থিত, বাগানে লীলা রায় নিড়েন নিয়ে ফুলগাছের তলাগুলো খোঁচাতে ব্যস্ত। আলি সাহেবের মিস্টার রায় বাড়ি আছেন কিনা এ প্রশ্নের জবাবে উনি বললেন 'উনি এখন সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃটো আছেন।'

পালটা প্রশ্ন আলি সাহেবের 'তা হলে আ-আপনি এখানে বাইরে কী করছেন মিসেস রায়?'

সংগীতজগতে যে দিকপালদের সান্নিধ্যে আসি তাঁদের সম্পর্কে 'কুদ্‌রত্ রঙ্গিবিরিঙ্গী' ও 'মজলিস'-এ অনেক কিছু লিখেছি। তাঁরা সবাই বিরাট উস্তাদ। আমার সংগীত জীবনের অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ শিখরে স্থান পাবে আবদুল করিম খাঁ ও ফৈয়াজ খাঁর গান। আবদুল করিমের গান শৈশবে কিছুই বুঝিনি। শুধু মনে আছে উস্তাদ হাঁ করে আছেন। কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। আর আশেপাশের লোকজন হায় হায় করছেন। পরে শুনেছিলাম উনি 'পরজ বসন্ত' ধরেছিলেন আর ওঁর তারার সা যোড়া মিরজের তানপুরো ও শ্রুতি হারমোনিয়ামের ষড়জের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ফৈয়াজ খাঁকে আট বছর বয়সে প্রথম শুনি। প্রথমে হাফিজ আলি খাঁ সরোদে তোড়ি বাজালেন, পরে গাইলেন ফৈয়াজ খাঁ জৌনপুরি। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তবলায়। কিছুই বুঝিনি তখন, কিন্তু তার সপ্তকের রেখাব গান্ধারের পুকার আর বুলন্দ আওয়াজে সুরের প্রভাব আমার শিশুমনকে আনচান করে দিয়েছিল। বড় হয়ে ষোলো-সতেরো বছর বয়সে

লখনউ-এ ওঁর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য হয়। খাঁ সাহেবের এক শিষ্য এস্. কে. চৌবে যিনি ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের প্রচণ্ড নকল করার ব্যর্থ চেষ্টায় সারাটা জীবন কাটিয়েছিলেন, আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন লখনউ-এর কেসরবাগে এম্পায়ার হোটেলে। বললেন 'খাঁ সাহাব, ইয়ে পোরফেসর মুকর্জী সাহাবকা লড়কা হ্যায়, ইয়ে আপকা খুব নকল করতা হ্যায়।' সে বয়সে ভয় ডর বড় একটা ছিল না। ভাবতেও লজ্জা হয়, আমি তৎক্ষণাৎ হারমোনিয়ামের সুর পঞ্চম টিপে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের জয়জয়ন্তীর 'মোরে মন্দর' রেকর্ড মুখস্থ গেয়ে দিলাম, মায় ওঁর হুঙ্কার দেওয়া তান টান শুদ্ধ, অবশ্য বিনা তবলায়। সবাই হেসে কুটোপাটি। খাঁ সাহেব কিন্তু হাসলেন না। ওই সুরেই উনি জয়জয়ন্তী শুরু করলেন। আমার গর্বের সীমা থাকে না যখন মনে করি দেড়ঘণ্টা উনি গেয়েছিলেন এবং আমাকেও সঙ্গে গাইয়েছিলেন। এমনই সে জয়জয়ন্তীর প্রভাব পড়েছিল আমার মনের ওপর যে তার বহু বছর পরে আমার রেডিওয় প্রথম ন্যাশনাল প্রোগ্রাম করার সময় খাঁ সাহেবের প্রতিটি 'হরকৎ' প্রতিটি নুয়ানস্ আমার মনের মধ্যে তরতাজা অবস্থায় ছিল। এই ন্যাশনাল প্রোগ্রামই আমার জীবনের প্রথম রেডিও প্রোগ্রাম এবং আমাকে যে তার জন্য অডিশন দিতে হয়নি এ নিয়ে গাইয়ে-বাজিয়ে মহলে অনেক ঘোঁট মঙ্গল হয়েছিল। এ সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী তৎকালীন অল ইন্ডিয়া রেডিওর ডিরেক্টর জেনারল পি. সি. চ্যাটার্জি, যাঁকে কোনোমতেই আর পাঁচটা কূপমণ্ডুক সরকারি আমলাদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন তখন আমার ও দিনকর কাইকিনীর যুগলবন্দি জনপ্রিয় হয়েছিল কলকাতা বোম্বাই ও দিল্লিতে এবং দিনকর সে সময়ে রেডিওর সর্বোচ্চ গ্রেডের আর্টিস্ট। অতএব আমিও বিনা অডিশনে রেডিওয় গান করতে পারি, এমনকি ন্যাশনাল প্রোগ্রামও, এই প্রকার ধারণা চ্যাটার্জি সাহেবের হয়েছিল।

পরে খাঁ সাহেবের সিনিয়রমোস্ট শাগীর্দ, এবং শ্যালক আতা হুসেন খাঁ ও দূর সম্পর্কের ভাগ্নে লতাফৎ খাঁ সাহেবের কাছে কুল্লে বছর চোদ্দ তালিম পাই। তার অনেক আগে সহসওয়ান ঘরানার রামপুরের 'দরবারি' গায়ক উস্তাদ মুশ্‌তাক হুসেন খাঁর কাছে আমার গাণ্ডা বাঁধা হয়। উনি গোয়ালিয়র গাইতেন এবং অসাধারণ গুণী লোক ছিলেন। তবে ওঁর গান ছিল কড়াগান, ম্যহ্‌ফিলবাজ ছিলেন না।

ভারতবর্ষের বহু জায়গায় এবং কন্‌ফারেন্‌সে গেয়েছি কিন্তু আমার গায়ক জীবনের শীর্ষে স্থান পায় বরোদার রাজপ্রাসাদে ফৈয়াজ খাঁর স্মৃতিতে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী জলসায় গান, কারণ দরবার হলে যেখানে আমার উস্তাদদের উস্তাদ 'আফতাব এ মৌসিকী' স্বয়ং ফৈয়াজ খাঁ বসে গান করতেন, সেইখানে গান করতে পাওয়ার আনুভূতিক মূল্য আমার কাছে অপরিসীম। ওইখানেই লতাফৎ হুসেন, শরাফৎ হুসেন এবং আমার জন্য ডায়াস তৈরি করা হয়েছিল। ওই তিন দিন আর

কেউ নয়, যন্ত্রে ছিলেন হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া, শিবকুমার শর্মা ও বৃজভূষণ কাবরা। লতাফৎ খাঁর সঙ্গে সহায়তা করেছিলেন বিজয়কুমার কিচ্‌লু। এঁর সঙ্গে আমার সাতচল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব এবং এককালে আমরা একত্র অনেক গানবাজনা করেছি। এঁর ভাই রবি কিচ্‌লুর প্রতিভা ছিল, খেয়ালের তালিম তার প্রধানত বিজয়ের কাছেই এবং বাকিটা আমার হাতে। গাইতও আমার সঙ্গে, এককালে কলকাতার কন্‌ফারেন্‌সে তার বহু সাক্ষী-সাবুদ এখনও বর্তমান। পরে শুনলাম প্রচার মাধ্যমের মারফত সে নাকি ডাগর ব্রাদার্স ও লতাফৎ খাঁর শাগীর্দ।

সেকালের লখনউ নিয়ে লেখবার বাসনা হয়। স্মৃতিতে বড় বেশি ভিড় করে আসে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্তু যার জোড়া আর কোথাও পাইনি। বিরিয়ানির চেয়ে লখনউ-এ বিভিন্ন কেতার পুলাওই বিখ্যাত ছিল। বিরিয়ানিতে মশলা বেশি পড়ে, পুলাও সে তুলনায় অনেক সাদাসিধে কিন্তু তার স্বাদ অপূর্ব। ভোজনরসিকরা বলতেন বিরিয়ানি বারোয়ারি খানার জন্য, পুলাও স্থান পায় অভিজাত পরিবারের দস্তরখানে। বিরিয়ানি খায় দিল্লির লোকে, লখনউ-এর পুলাও খায় অওধের খাদ্যরসিকে। পুলাওর সঙ্গে খাওয়া হত কোরমা। শুনেছি সেকালে অর্থাৎ পুরাতন লখনউ-এর নবাব তালুকদাররা যে মুর্গির কোরমা খেতেন তাকে কেসরের গুলি খাওয়ানো হত। গোমাংস আমার জানাশোনা ভদ্র মুসলমানদের খেতে দেখিনি, তবে শীরমালের অর্থাৎ দুধে ময়দায় তৈরি রোগনি রুটির জন্য নবাব রামপুরের বাবুর্চিখানায় যে গরুর দুধ আসত তাকে শুনেছি নিয়মিত গোলাপের পাপড়ি খাওয়ানো হত। নবাব রেজা আলি খাঁর দুই জামাই আমার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন, ছোট সুদর্শন মেহ্‌তা কলকাতায় শ' ওয়ালেস কোম্পানিতে বড় কাজ করতেন, বড় জামাই আমাদের প্রাক্তন রাজ্যপাল প্রোফেসর নুরুল হাসান ধূর্জটিপ্রসাদের শাকরেদ স্থানীয় ছিলেন। এঁদের কৃপায় রামপুরের বাবুর্চিদের হাতে প্রস্তুত পাঁচ রকম কাবাব খেয়েছি। এদের মধ্যে সব চেয়ে মন কেড়েছিল কাকোরি কাবাব। যা পালোয়ানরা পর পর তিনটি শিলে বাটত এবং শল্যপক্ক অবস্থায় তা মুখে দিলে মাখনের মত গলে যেত। কিঞ্চিৎ নিকৃষ্টরূপে এর আবির্ভাব হয়েছে আজকাল দিল্লিতে সর্দার প্যাটেল রোডের রাস্তার ওপর 'অল কাসাল' নামক ইউনুস দেহেলভির পরিচালিত ধাবায় ও হায়াৎ রিজেন্সির 'দমপোখ্‌ত' নামক রেস্তরাঁতে। ইয়খ্‌নি দিয়ে বাকরখানি রুটি, শামী (এই নামে যে বস্তু আজকাল অভিহিত তা স্নেহাতই চানা মিশ্রিত মাংসের বড়া), রুমালি রুটি ও কাকোরি কাবাব এবং চিকেন হান্ডি (এটি কিছুকাল আগেও, ৭৮ সালে আমার সদ্যপ্রয়াত বন্ধু ভোজনরসিক রাধাপ্রসাদ গুপ্ত লখনউ-এ খেয়ে 'কী খেলাম, কী খেলাম' বলতে বলতে অর্ধেক রাত পায়চারি করেছিলেন), মলিহাবাদে আম ও মালাই খাওয়ার নেমন্তন্ন, সেই সঙ্গে 'চৈতি' ও 'কাজরি', গায়িকারা সিদ্ধেশ্বরী ও রসুলনবাই, সে সব কথা ভাবতে ভাবতে এই

দু-দুবার বাইপাস করা বৃদ্ধের রোজকার পথ্য দেখে চোখে জল আসে। আরও নিদারুণ কষ্ট হয় সেই বিখ্যাত নগরীর কুৎসিত চেহারা ও ফাস্ট ফুডের সমারোহ দেখে। তবে আশা করি বি জে পির রাজ্যে হয়ত আমিনাবাদের শ্রীরাম রোডের বিখ্যাত বড় বড় হিং-এর কচুরি এখনও টিকে আছে।

কলকাতার গান বাজনার কথা মনে করলে সবচেয়ে বেশি যাঁর গান শুনেছি ও বাল্যকালে প্রভাবিত হয়েছি তিনি হলেন তারাপদ চক্রবর্তী। অন্যত্র রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র প্রদ্যুম্নকুমুদ বা আমার পুতুদার কথা লিখেছি, এঁকে শেখাতে আসতেন তারাপদবাবু। আমি বসে শুনতাম। শেখানো মানে ছিল গান গাওয়া। যেমন সুর, গলায় লোচ, তেমন মেজাজ আর তেমনই উস্তাদদের নকল করার ক্ষমতা। সে নকল কিন্তু সুপারফিশিয়াল অর্থাৎ ম্যানারিজম্-এর নকল নয়। উনি ভাল ভাল অঙ্গগুলি নিজের মত করে তুলেছিলেন এবং ওঁর হিরোরা তখন ছিলেন আবদুল করিম ও ফৈয়াজ খাঁ। একদিন আমার গুরু মুশ্তাক হুসেন খাঁর গোয়ালিয়র গায়কি নকল করে উনি শুদ্ধ সারং গেয়েছিলেন। বলতে বাধা নেই ওরকম্ গান মুশ্তাক হুসেন খাঁ কোনোদিন গাইতে পারতেন না। আর একবার লখনউ ইউনিভার্সিটিতে আমার সহপাঠিনী কৃষ্ণা উদিয়াভরকর খাদিম হুসেন খাঁর শিষ্যা কলকাতায় এসেছিল। আগ্রা ঘরে আমার দেখ-দেখতায় মেয়েদের মধ্যে অত ভাল গায়িকা হয়নি। যৌবনে যোগিনী না হয়ে গেলে তার দেশ জোড়া নাম হত। তারাপদবাবুর বাড়িতে কৃষ্ণাবাইয়ের পর তারাপদবাবুর গান হলো। সনটা মনে নেই, চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ হবে, পণ্ডিত মানস চক্রবর্তী তখন বছর দু-আড়াইয়ের বেশি নয়। অন্তত কোলে নিয়ে সেই রকমই মনে হয়েছিল। সে সন্ধ্যার শুদ্ধ কল্যাণ শুনে কৃষ্ণার বাবা বললেন আবদুল করিমের পর এত ভাল গান শুনিনি। আচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর গুরু দিল্লির মুজফ্ফর খাঁ তারাপদ বাবুর গান শুনে কেঁদে ফেলেছিলেন। এ হেন অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি যাঁকে আমি প্রথম বাঙালি খেয়ালিয়া বলব, যিনি 'রীত কা গানা' গেয়ে কন্ফারেন্সে বড় বড় মুসলমান উস্তাদদের সঙ্গে কলকাতায় টক্কর দিয়েছেন তিনি শুধু সুযোগের অভাবে সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করতে পারেননি। দিলীপকুমার রায় এবং ধূর্জটিপ্রসাদ ঝুলোঝুলি করেছিলেন ওঁকে আবদুল করিমের প্রধান শিষ্য সওয়াই গন্ধর্বের কাছে ওঁদের খরচায় পাঠানোর জন্য, উনি কিছুতেই রাজি হননি। এতে আমি মনে করি সংগীত জগতের ক্ষতি হয়েছে।

মহিষাদলের কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ অত্যন্ত গুণী মানুষ ছিলেন, অনেকের কাছে গান শিখেছিলেন, অজস্র ধ্রুপদ ধামার ও খেয়াল। তবে প্রধানত দিল্লির মুজফ্ফর খাঁ ও আগ্রা ঘরানার উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাছে। আমাকে নিজগুণে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও প্রতি বছর ওঁর জন্মদিনে নেমন্তন্ন পেতাম মহিষাদলে গান করার।

ওঁরই বয়ানে শোনাচ্ছি তারাপদবাবুর সে কর্মকাণ্ড। কলকাতার অল বেঙ্গল মিউজিক কন্‌ফারেন্‌সে সেবার তারাপদ চক্রবর্তী আসর মাত করে দেন এবং সে আসরে মুজফ্‌ফর খাঁ ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন দেবপ্রসাদ। গান শুরু হবার পাঁচ সাত মিনিট পরে খাঁ সাহেব বলে উঠলেন যে, 'এতো দেখছি ছেলেটি আবদুল করিম খাঁর নকশা নিচ্ছে।' তারপর কিছুক্ষণ শোনার পর দেখা গেল ওঁর চোখে জল। উনি গর্গ সাহেবকে হাত ধরে বললেন এর পর আর উনি গাইবেন না কারণ 'অ্যাসা গানা হমনে সুনা ভি নহী, সীখা ভি নহী।' কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গুনছেন, ওদিকে খাঁ সাহেব গর্গ সাহেবকে বলছেন ওঁর বায়নার টাকা ফেরত দিয়ে দিতে, উনি এর পর কিছুতেই গাইবেন না। শেষে দেবপ্রসাদের কথায় তারাপদবাবুই গ্রিনরুমে খাঁ সাহেবের হাঁটু ছুঁয়ে বললেন উনি তাঁরই প্রিয় শিষ্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর ছাত্র এবং খাঁ সাহেব যদি না গান করেন তো তারাপদবাবু লজ্জায় আত্মহত্যা করবেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর খাঁ সাহেব রাজি হলেন গান করতে। রাত দুটোর সময়ে গাওয়া অসাধারণ সে আড়ানা দেবপ্রসাদ গর্গ বলেছিলেন এখনও কানে লেগে আছে।

গিরিজাবাবু বাঙালি নাম করা গায়কদের মধ্যে শেষ মুসলমানদের পর্যাপ্ত তালিমপ্রাপ্ত গায়ক। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কথা মনে রেখেই বলছি, কারণ ভীষ্মবাবুর তালিম হয় বদল খাঁর মত প্রসিদ্ধ সারেঙ্গি বাদকের কাছে। কিন্তু সারেঙ্গি বাজিয়ে গায়কির তালিম দিতে পারে না। ভীষ্মদেব নিজের প্রতিভা বলে নিজের মনোমত যে গায়কি তৈরি করে নিয়েছিলেন তা পূর্বে বা পরে কারও সঙ্গে মেলে না। গিরিজাবাবু রাধিকা গোস্বামীর কাছে ধ্রুপদ শেখেন। বদল খাঁ ছাড়া মুজফ্‌ফর খাঁ ও রামপুরের এনায়েৎ হুসেন খাঁর কাছে খেয়াল এবং ভইয়া সাহেব গণপৎ রাও ও প্রবাদ পুরুষ মৌজুদ্দিন খাঁর কাছে ঠুংরি। দুর্ভাগ্যবশত ওঁর শিষ্যদের মত উনিও সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করতে পারেননি। আচার্য গিরিজাশঙ্করকে লোকে মনে রাখবে বাঙালি ভদ্রসমাজে, বিশেষত ভদ্রকন্যাদের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রসারের জন্য। তারাপদবাবু যখন ওঁর কাছে নাড়া বাঁধেন তখন আর গিরিজাবাবুর শিক্ষা দেবার মত ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। এ. কানন তারও পরে ওঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।*

উপরোক্ত ঘটনার পর দেবপ্রসাদের রফি আহমদ কিদোয়াই রোডের বাড়িতে একটি করুণ মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হয়। প্রচণ্ড রক্তচাপ ও ডায়াবিটিসের প্রকোপে গিরিজাবাবুর শরীর তখন এত ভেঙে পড়েছিল যে তাঁকে চেনাই যেত

* পরিশিষ্টতে পাওয়া যাবে ধূর্জটিপ্রসাদের অগ্রন্থিত রচনা গিরিজাশঙ্করের মৃত্যুর পর 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত অসামান্য 'অবিচুয়ারি'।

না। দেবপ্রসাদের নিজের বিবৃতিতেই বলি। 'উনি ওঁর ছাত্র শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আগের রাতের ঘটনা সবই শুনেছিলেন। শৈলেনবাবু ওঁকে নিয়ে এসে আমায় খবর দিলেন গিরিজাবাবু এসেছেন ওঁর উস্তাদকে প্রণাম করতে। এই বলে উনি বেরিয়ে গিরিজাবাবুকে ধরে ধরে নিয়ে এলেন। গিরিজাবাবুর চেহারা দেখে আমারও চোখে জল এল, সেই কোঁকড়া কোঁকড়া চুল পাতলা হয়ে গেছে, কানের পাশের চুল সাদা, গোঁফ কামানো, গলার স্বর কাঁপছে। ঘরে ঢুকতেই খাঁ সাহেব বলে উঠলেন, 'ইয়ে কিয়া বেটা গির্জা তু ক্যায়সে মুঝসে ভি বুঢ়া হো গয়া?' খাঁ সাহেবের পায়ের ওপর পড়ে গিরিজাবাবুর সে কি কান্না! তারপর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তারাপদবাবুর মাথায় হাত দিয়ে বললেন 'আমার গুরুর কাছ থেকে আমি যে তারিফ পাই নি, তুমি তাই পেয়েছ। তোমার কপাল আর ঈশ্বরের কৃপা।' গিরিজাবাবুর কান্না শুনে পাশের ঘর থেকে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব বেরিয়ে এসেছিলেন। গিরিজাবাবুকে উনি চিনতেই পারেননি। যখন আমি ওঁকে বললুম সব ঘটনা, তখন ফৈয়াজ খাঁ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন 'উনি আমায় কি অভদ্র মনে করলেন। আমি ওঁকে আদাব পর্যন্ত করলাম না।' তারপর উদাস দৃষ্টিতে উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হায় আল্লা, এই অবস্থা হবার আগেই যেন আমার মৌত হয়।'

কত বড় বড় উস্তাদদের গান শুনেছি এবং ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছি, তার হিসেব কষতে বসলে নিজেকে অসাধারণ সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়। মুনব্বর আলির সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার পর অনবরতই বড়ে গুলাম আলি খাঁর কাছে যেতাম এবং আমার বিশেষ অনুরোধে আমার মত শ্রোতাকে একা উনি পঁয়ত্রিশ মিনিট তোড়ির নোম্ তোম্ আলাপ শুনিয়েছিলেন, জোড়ের অংশটা করতে করতে শেষটায় উনি তানে চলে গিয়েছিলেন। সাহস করে বলেই ফেলেছিলাম, 'খাঁ সাহেব, এই তো আপনি ইচ্ছে করলে ঠাহ্‌রানের সঙ্গে অসাধারণ রাগালাপ করতে পারেন, আসরে করেন না কেন?' হেসে উনি পালটা প্রশ্ন করেন, 'ক্যা শিক্‌রে বাজকো আপ কবুতর বানানা চাহ্‌তে হ্যাঁয়?'

একবার মহাজাতি সদনে গাইছি, তার পরেই কার মনে পড়ছে না যন্ত্রসংগীত, এবং শেষে বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেবের গান।-গান শেষ করে আমি ও রবি কিচ্‌লু উঠে পেছন ফিরে দেখি উইংসে খাঁ সাহেব চেয়ারে বসে। উনি একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়েছিলেন। আমি গাইছি শুনে উনি বললেন, 'আমায় ধরাধরি করে স্টেজের কোণে বসিয়ে দাও, আমি শুনব।' আমি তাড়াতাড়ি ওঁর হাঁটু ছুঁয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে উনি বললেন, 'কেঁও, আগ্রা ঘরানাকে হোতে হুয়ে ভি ইত্‌না আচ্ছা গানা গাতে হো?' এটা নিছক রসিকতা নয়, উনি নিজের ঘরানার বাইরে কোনো উস্তাদের গায়কিই পছন্দ করেননি। পরের দিন মুনব্বর আমায় বাড়িতে

এসে বলে 'আমাদের ইচ্ছে তুমি খাঁ সাহেবের কাছে গাণ্ডা বাঁধাও।' উত্তরে বলেছিলাম সে ক্ষেত্রে 'কৌয়া চলে হন্‌সে কে চাল' হবে। আমায় দাঁড়কাকই থাকতে দাও, আমার রাজহংস হবার মত ক্ষমতা নেই। পাঞ্জাবীদের গলা স্বভাবতঃই ঘোরে, যে সব বাঙালির এ প্রবণতা বা এলেম নেই তাদের ঐ গায়কি অনুসরণ করা আমার মতে উচিত নয়। গায়কি নাগরা জুতোর মত, যদি পায়ে বসে যায় তো তার মত আরামদায়ক পাদুকা ভূভারতে নেই, যদি না ফিট্ করে তো সারা জীবন কষ্ট দেবে। তফাত এইটুকু, গায়কি যদি ঠিকমত না বসে তো যত না গায়কের তার চেয়ে শ্রোতাদের পক্ষে তা গভীরতর পীড়াদায়ক।

বড়ে গুলাম আলি খাঁর বাড়ির রান্না, বিশেষ করে ওঁর নিজের হাতের রান্না রামপুরের নবাবের বাবুর্চিখানার পরেই আমার অভিজ্ঞতায় পড়ে। ওঁর বাড়ির মেনুতে খাস আইটেম থাকত ওঁর বিরিয়ানি। তাতে কত বাদাম আখরোট জায়ফল পড়ত জানি না তবে ঘি আসত লুধিয়ানা থেকে। কেরামৎ খাঁর বাড়িতে প্রতি ঈদে নেমন্তন্ন হত কিন্তু গুলাম আলি খাঁ সাহেবের বিরিয়ানির জবাব নেই। এঁরা বহুদিন গত হয়েছেন আর আজকালকার কদরদানরা তো রহমানিয়া, সিরাজি, রয়্যাল ও পড়ে যাওয়া সাবিরের খদ্দের। অতএব সওয়ালই নেই তো জবাবের কথা ওঠে কি করে? মুনব্বরের ছেলে রেজা আলি বৃদ্ধ আঙ্কলকে ভুলে যায়নি, মাঝে মাঝে বাড়ি বয়ে এসে খাইয়ে গেছে—এ জন্য আমি কৃতজ্ঞ বোধ করি। বড়ে গুলাম আলি খাঁ দুটি জিনিসই জীবনে জানতেন এবং তাকে অত্যুৎকৃষ্ট স্তরে উন্নীত করেছিলেন। এক, দিনভর রিয়াজ ও দুই, দমভোর খাওয়া। পক্ষাঘাত হওয়ার পর খাওয়া দাওয়া আগের মত ছিল না। কিন্তু মশলাবিহীন ঘি তেল বর্জিত রান্না খাওয়ার পরিবর্তে মৃত্যুই শ্রেয় এই প্রকার বিবেচনা করতেন। গান ওঁর জীবন ছিল। খাওয়া আর ঘুমোনো বাদে বাকি সময় হাতে ওঁর স্বরমণ্ডল থাকত। যা কিছু দেখতেন সবই গানের উপমা দিয়ে পেশ করতেন। অ্যাকোরিয়ামে ছোট ছোট লাল মাছ লেজ নেড়ে ঘুরছে। বলে উঠলেন 'দেখো দেখো, বিলকুল দেশি তোড়ি, মপ-রেগ-সারে-নিসা।' মৃত্যুর রাত্রে মুনব্বর ওঁর শয্যার পাশে বসে, হায়দ্রাবাদে। গভীর স্তব্ধ রাতে দূরে একটি নেড়ি কুত্তা ডেকে উঠল। উনি স্তিমিত চক্ষে মুনব্বরকে বললেন 'শোনো শোনো, এই টেব্‌লফ্যানের আওয়াজকে ষড়জ ধরলে কুকুরের ডাকে তোড়ির রেখাব গান্ধার পাওয়া যাচ্ছে।' চোখের জল ফেলতে ফেলতে মুনব্বর আমায় বলেছিল, আল্লার নাম নিয়ে চক্ষুবোজার আগে এই নাকি ওঁর শেষ কথা।

কুমার গন্ধর্বের গুরু প্রোফেসর বি. আর দেওধর তাঁর 'সংগীত কলা বিহার' নামক মারাঠি পত্রিকায় লিখেছিলেন একদিন উনি এবং বড়ে গুলাম আলি খাঁ বোম্বাইয়ের চৌপাটিতে বসে আছেন, সামনে ধূসর আরব সাগরকে রাঙিয়ে সূর্য

অস্ত যায় যায়। হঠাৎ খাঁ সাহেব বলে উঠলেন 'দেওধর সাহেব, আমাদের পূর্বপুরুষদের সৃজনীশক্তি ও কল্পনা আমাকে অবাক করে দেয়। আমি মনে করি মারবা রাগটির সৃষ্টি হয়েছিল ঠিক এই মুহূর্তটির জন্য, রেখাব ও ধৈবতের অপূর্ব সম্বাদ দিনান্তের শেষে এই বৈরাগ্যময় বেদনাবিহুল সন্ধ্যার মুডটিকে ধরেছে এমনভাবে যে তার তুলনা নেই। সূর্যাস্ত ভাবিয়ে তুলেছে বিছড়ে হুয়ে আশিক মাশুক্‌কে আরও একটি যন্ত্রণাময় বিরহের রাত তারা কী করে কাটাবে। এই প্রাণহীন শহরে লাখো ভিখারি, তাদের ঘর নেই, বাড়ি নেই, মাথার ওপর ছাতটুকুও নেই, তারা ভাবছে আজকের রাতটা কোথায় কাটবে। আমাদের হিন্দুস্থানি সংগীতের সাতটি পর্দার মধ্যে ষড়জই আমাদের আশ্রয়ের স্থান, ঘুরে ফিরে সেই 'সা'তেই ফিরে আমাদের বিশ্রাম নিতে হয়। আর মারবা রাগের বিস্তারে সেই আশ্রয়স্থান ষড়জকেই খুঁজে বেড়াতে হয়। ঐ উদ্বেগ অনিশ্চয়তা বেবসি এবং হতাশাই কি মারবা রাগের মেজাজের মধ্যে ফুটে ওঠে না? আপনার কী মনে হয়?' এই বলে উনি চৌপাটির বেঞ্চে বসে খালি গলায়ই এমন মারবা শোনালেন সেদিন, যার চেয়ে ভাল মারবা রাগ দেওধর সাহেব বলেন উনি কখনও শোনেননি। মুসলমান উস্তাদদের সম্পর্কে ওঁর ধারণা ছিল তাঁরা অশিক্ষিত, মদ মাংস খায়, তবায়েফ সংসর্গ করে। তাদের মধ্যে যে এমন একজন সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন কবি মানুষ কসাইয়ের মতন চেহারার মধ্যে লুকিয়ে আছে যার উপলব্ধি করার ক্ষমতা দেওধর সাহেবের নিজের চিন্তাধারারও বাইরে, তা উনি স্বপ্নেও ভাবেননি।

আর একদিনের কথা। খাঁ সাহেবের রেডিওয় প্রোগ্রাম শেষ হয়েছে বেলা ১টা নাগাদ। দেওধর সাহেব তখন অল ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রোডিউসার খাঁ সাহেবের গানের সময় স্টুডিওয় ছিলেন সমানে। স্টুডিও থেকে বেরিয়ে বড়ে গুলাম আলি খাঁ বললেন 'দেওধর সাহেব একটু অপেক্ষা করুন, আমি ট্যাকসি ডাকতে পাঠিয়েছি, একসঙ্গেই সমুদ্রের ধারে যাব। বাইরে ঘনঘোর বর্ষা, জুলাই মাসের মুষলধারে বৃষ্টি বোম্বাই শহরকে ভাসাচ্ছে, দেওধর সাহেবের খিদে পেয়েছে, কিন্তু খাঁ সাহেবকে না বলা যায় না। গুলাম আলি খাঁ এমনিতেই হাসি খুশি মানুষ কিন্তু জল দেখলে ওঁর মনের আনন্দ ডবল হয়ে যেত। ট্যাকসিতে চড়ে খাঁ সাহেব মিঞা মলহার গাইছেন, ওদিকে দেওধর সাহেবের পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে, কাপড় চোপড় ভিজে একশা, খাঁ সাহেব বদ্ধ পরিকর এমনদিনে সমুদ্রের দৃশ্য দেখতেই হবে। দেওধর কথা আর না বাড়িয়ে ট্যাকসি ড্রাইভারকে বললেন মেরিন ড্রাইভ হয়ে যেতে। মেরিন ড্রাইভে একটি সিমেন্ট কংক্রিটের তৈরি ব্লক আছে যার কিয়দংশ সমুদ্রের ভেতরে ঢোকা, ঠিক সেইখানেই ট্যাকসিকে থামতে বলে খাঁ সাহেব দেওধর সাহেবের হাত ধরে টানাটানি শুরু করলেন, 'আসুন দেওধর সাহেব, এমন দিনেই তো সমুদ্রের ধারে বসে মলহারের রেয়াজ করতে হয়।' মাথার ওপর অঝোরে

বৃষ্টি, সমুদ্রের ঢেউ কংক্রিটে ধাক্কা খেয়ে বিরাট ফোয়ারার মত তিরিশ চল্লিশ ফুট উর্ধ্বে উঠছে আর চতুর্দিক ফেনায় ভাসিয়ে দিচ্ছে, সেইখানে চ্যাপটালি খেয়ে বসে খাঁ সাহেবের শখ হলো তান মারবার। এক একটা বিরাট ঢেউ লাফিয়ে উঠছে, আর খাঁ সাহেবের মিঞা মলহারের তানও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কখনও তার সপ্তকে উঠছে, কখনও মন্দ্র সপ্তকে নেমে যাচ্ছে। প্রকৃতির এই লীলার সঙ্গে খাঁ সাহেবের আবহ সংগীত চলল আধ ঘণ্টার ওপর, দেওধর সাহেব লিখছেন তখন উনি এতই মজে গেছেন যে ক্ষুধাতৃষ্ণা সব ভুলে গিয়ে খালি তারিফ করছেন। শেষে মুনব্বর আলি খাঁ বলল 'আব্বা, আড়াইটে বেজে গেছে, এবার বাড়ি চলুন, আমাদের সকলেরই খিদে পেয়েছে।' অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে খাঁ সাহেব ট্যাকসিতে উঠলেন, বললেন, 'আল্লার সৃষ্ট এই দুনিয়ায় সর্বত্রই সংগীত ছড়িয়ে আছে, খুশ্‌নসিব তারাই যারা সেই আনন্দ উপভোগ করতে পারে।'

দেওধর সাহেব খাঁ সাহেবকে প্রথম শোনেন ১৯৪৪ সালে বোম্বাইয়ের বিক্রম কন্‌ফারেন্‌সে। উনি ঐ মারবা দিয়েই শুরু করেন। গলা লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে তারিফ শোনা গেল যে তারিফের সমাপ্তি হল মারবার শেষে তুমুল হাততালিতে। সবাই ভাবছে এর পর উনি কোন রাগ ধরবেন, কোনো শুদ্ধ স্বরের রাগ নিশ্চয়ই। সবাইকে অবাক করে উনি ধরলেন একেবারে পাশাপাশি রাগ পুরিয়া। দেওধর সাহেব মনে মনে ভাবলেন সর্বনাশ করেছে, এর গান শুনে তো এতক্ষণ মনে হয়নি এ এই প্রকার মাথামোটা উস্তাদ। কিন্তু আশ্চর্য। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মারবা মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়ে তার জায়গা নিল পুরিয়া রাগ। দেওধর সাহেবও ওঁর অত্যাশ্চর্য রাগভাব প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা দেখে অবাক, যদিও উনি লিখে গেছেন খাঁ সাহেব রাগের আলাপ বা বড়হৎ সাধারণত করতেন না। এ অনুযোগ উনি একাধিক বার পরে বড়ে গুলাম আলি খাঁর কাছে করেছিলেন। উনি আপশোস করে বলেছিলেন 'উস্তাদ, আপনার গান শুনে আমাদের পেট ভরে না। আপনি আর একটু পুরোনো আইন কানুন মেনে চললে আমাদের আরও ভাল লাগত। আপনি কিছুটা বহ্‌লাওয়া ও সুরের কাজ করে সার্গম করেন, আবার বহ্‌লাওয়ায় ফিরে আসেন, আবার তানে চলে যান, ভারী রাগে মুড়কি পাঞ্জাবী হরকৎ ব্যবহার করেন। এতে সাধারণ শ্রোতারা যাই বলুক, এই বোম্বাই শহরের সমঝদাররা আপনার নিন্দে করে, বলে আপনি পুরোনো সিলসিলাকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। এ আমাদের শুনতে ভাল লাগে না।' খাঁ সাহেব চুপ করে শুনলেন, একটুও রাগ করলেন না, বললেন 'ঠিক আছে ওদের শিকায়েতের জবাব দেব আমি আসরে, কথায় নয়।' এর পরের বৈঠকেই উনি দরবারি কানাড়া নিয়ে বসলেন, এবং প্রথামত কুড়ি মিনিট অত্যন্ত ধৈর্য ও ঠাহ্‌রানের সঙ্গে বিস্তার করে বোল বাট পেরিয়ে ভারী ভারী তান দিয়ে আসর মাৎ করে

দিলেন। ওঁর বিস্তার ও বহ্‌লাওয়াতে সেদিন মিড় ছাড়া কিছুই ছিল না, মুড়কি খটকা কোনো প্রকারের হরকৎ নয়। সেদিনকার পঁয়তাল্লিশ মিনিটের দরবারি শুনে দেওধর সাহেব পরে প্রশ্ন করেছিলেন 'খাঁ সাহেব, আপনি এইভাবে রোজ কেন গান করেন না?' জবাবে গুলাম আলি খাঁ বললেন, 'আপনার মত শ্রোতা তো আমি আসরে পাই না। আমি যদি মালগাড়ির রফতারে চলি তো পাবলিক ভাবে গুলাম আলির কি হয়েছে, আজ তন্দুরস্তি কি ঠিক নেই, শরীর খারাপ নাকি? তারা আমার কাছে তান শুনতে চায়, সার্গম্ শুনতে চায়। পাঞ্জাবী হরকৎ প্রত্যাশা করে। তাদের তো আমি হতাশ করতে পারি না।' বড়ে গুলাম আলি খাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি ও গায়কি সম্পর্কে বামনরাও দেশপাণ্ডের ও আমার নিজের মতামত ও বিশদ আলোচনা 'কুদ্‌রত্ রঙ্গিবিরঙ্গী'তে পাওয়া যাবে।

বোম্বাইয়ে থাকাকালীন খাঁ সাহেব নিয়মিত চৌপাটিতে গিয়ে বেঞ্চে বসে সূর্যাস্ত দেখতেন। যখনই দেওধর সাহেবের সঙ্গে ওঁর দেখা হত বলা বাহুল্য ওঁদের আলোচনা গান বাজনার বাইরে বড় একটা হত না। প্রায়ই কথা বলতে বলতে কিছু একটা বোঝাবার উদ্দেশ্যে উনি গান ধরতেন। ঐ অপূর্ব কণ্ঠস্বর শুনে ধীরে ধীরে লোক জড় হয়ে যেত, কখনও কখনও তিরিশ চল্লিশ জন লোক ওঁদের ঘিরে বালির ওপর বসে পড়ত। পাশেই একটা পানওয়ালার দোকান। সেও একদিন পানের সরঞ্জাম সরিয়ে মুগ্ধ হয়ে গান শুনছে। হঠাৎ গুলাম আলি খাঁ সাহেবের খেয়াল হল। উনি দেওধর সাহেবকে বললেন, 'যারা আমাদের ঘিরে গান ও কথাবার্তা শুনছে এরা আমাদেরই মত চৌপাটিতে বেড়াতে এসেছে, এদের কিছু করবার নেই, কিন্তু এই বেচারি পানওয়ালার গত আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে কত লোকসান হল ভাবুন।' এই বলে গাঁটের পয়সায় উপস্থিত ত্রিশ চল্লিশজনের জন্য পানের অর্ডার দিয়ে খাওয়ালেন। চৌপাটিতে কোনো ভিখিরি খাঁ সাহেবের কাছ থেকে শুধু হাতে ফিরে যেত না।

গান্ধীজীর ধর্মসংগীতের বাইরে কোনো গানবাজনায় রুচি ছিল না। তাঁরই শাকরেদ মোরারজী দেশাইয়ের বাড়িতে যে কালোয়াতি গানের আসর বসবে তা কেউ ভাবেনি। আসরের শেষে মোরারজী কী 'পানাহারের' ব্যবস্থা করেছিলেন জানি না, তবে ওঁরই সুপারিশে কেন্দ্র থেকে খাঁ সাহেবকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। ততদিন পর্যন্ত উনি পাকিস্তানের নাগরিক ছিলেন এবং প্রত্যেক বার দিল্লি কলকাতা বোম্বাইয়ে কন্‌ফারেন্‌সে গাইবার আমন্ত্রণ পেলে ওঁকে ভিসা নিতে হত।

বড়ে গুলাম আলি খাঁর পরেই আমীর খাঁর কথা ওঠে। খাঁ সাহেবের ওপর একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ পাওয়া যাবে আমার 'কুদ্‌রত্ রঙ্গিবিরঙ্গী'তে। ওঁর সঙ্গে বয়সের প্রচুর পার্থক্য সত্ত্বেও আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল এবং সান্ধ্য পানাহারের ব্যবস্থা অনেক সময়ে রাত দুটো অবধি গড়িয়ে যেত। ইনি এতটাই

স্নেহ করতেন যে আমার গান নিয়মিত আসরে এবং কন্‌ফারেন্‌সে শুনতে আসতেন এবং ওঁর নিজের আসরে আমার ফরমাস মত রাগ গেয়ে শোনাতেন। একবার মহাজাতি সদনে গাইছি দরবারি। সারেঙ্গিতে বসেছেন গোপাল মিশ্র, তিনি সেদিন কী খেয়ে এসেছিলেন জানি না, প্রথম মিনিট পনেরো তিনি আশাবরি বাজালেন। আমাদের ঘরের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বোল বাট ও বোলতানের দ্বারা তবলার সঙ্গে লড়ন্ত। পরিমিতভাবে অবশ্য এই কার্য করা উচিত, নয়ত হুক্কা হুয়ার পর্যায়ে পড়ে যায়। সামনের সারিতে আমীর খাঁ সাহেব সঙ্গে বিবি রইসা বেগম এবং শিশুপুত্র। ঠিক এই সময়টিতে শাহাবাজ খাঁ উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলেন। ফলে আমীর খাঁ সাহেবকে পাততাড়ি গুটিয়ে উঠে পড়তে হল। পরের দিন আমীর খাঁ বললেন, 'দেখ তোমরা লড়ন্তের সময় দ্রুত তিনতালে তিন আবর্তনের পর শমের দুই মাত্রা পরে শম দিয়েছ। পি. পি. সিং নামক আগ্রা গায়কির এক ভক্ত টেপ করেছিল, শুনে দেখি ঠিক তাই। শঙ্কর ঘোষ ছিল সেদিন তবলায়, রগুড়ে মানুষ। আমীর খাঁ সাহেবের কথাটা জানালাম ওকে টেলিফোনে। শঙ্কর বলল, 'আমরা দুজনেই এসে পড়েছি তো লড়ন্তের মুখে একই জায়গায়। অতএব খাঁ সাহেবকে বলবেন গিনতিতে যাই বলুক ঐটাই শম্।'

সান্ধ্য পানাহারের উল্লেখ যখন হলো তখন ভীমসেন যোশীই বা বাদ যান কেন? আমার এসপ্ল্যানেড ম্যানসন্‌সের ফ্ল্যাটে পুরো এক বোতল কনিয়াক খেতে খেতে ভীমসেনকে দু ঘণ্টা গান গাইতে শুনেছি। একটুও বেসামাল নয়। তানপুরোয় আমি ও রবি কিচ্‌লু, তবলায় খোদ টি শার্ট পরিহিত কিশোর আমজাদ আলি খাঁ, একমাত্র শ্রোতা আমার স্ত্রী এবং 'বুঢ্‌টি' নামে আমাদের ককার স্প্যানিয়েল। তারপর স্টেশনে ফোন করাতে জ্ঞানবাবু ও ভি. জি. যোগ এসে পড়লেন। পরবর্তীকালে আর সবাই ড্রিংক করছে, উনি অম্লানবদনে বসে চা খাচ্ছেন এ দৃশ্য দেখে চমৎকৃত হয়েছি।

বহুদিন পেছনে সে সব সন্ধ্যার ইমপ্রমপটু আসরগুলো পড়ে রয়েছে। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে বিলায়েৎ খাঁর গান। সেতার নয়, গান। বিলায়েৎ এলেই তানপুরো বেঁধে আমি বসে যেতাম। তৈরির অংশ বাদ দিলে এ রকম গান আমি খুব কমই শুনেছি। একবার ক্যালকাটা মিউজিক সার্কলের মাসিক অধিবেশনে বিলায়েৎকে গাওয়ানো হয়েছিল। আমি উদীয়মান তরুণ শিল্পী বলে বিলায়েৎ-এর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। হাসির রোল উঠল যখন তখন আমি বললাম আমার চেয়ে বয়সে যখন ছ'মাসের ছোট তখন তরুণ তো বটেই। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ যিনি প্রায়ই এই প্রকার সাংগীতিক আড্ডায় সামিল হতেন এবং বয়সে বিরাট পার্থক্য সত্ত্বেও আমাকে উনি কনিষ্ঠতম বন্ধুর স্থান দিতেন। একবার বিলায়েতের গান শুনে অবাক হয়ে বলেছিলেন 'এ গান কি জানেন? ভারতবর্ষের যত ভাল খেয়াল শুনেছি

এ তার নির্যাস।' আমাদের অন্য এক বন্ধু, ফরহৎ সয়ীদ খাঁ ছিলেন সেই আড্ডায়, তিনি বললেন, 'কেঁও নহী, দিল ঔর দিমাক তো বহী হ্যায় জিস্‌সে উনকা সিতার বজতা।'

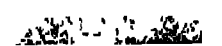
পঞ্চাশের দশকে আলি আকবর ও রবিশঙ্করের যুগলবন্দি প্রচুর বিস্ময় ও আনন্দ দিয়েছে। আমাদের কাছে যুগলবন্দি ব্যাপারটা তখন নতুন। পরবর্তীকালে নানা প্রকার যুগলবন্দি শুনেছি, কিছু তার মধ্যে দস্তুরমত বিদঘুটে যথা হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়ার বাঁশির সঙ্গে যশরাজের গান, বিসমিল্লার সানাইয়ের সঙ্গে নয়না দেবীর ঠুংরি। এই যুগলবন্দির আসর করার রাজা ছিলেন বোম্বাইয়ের বৃজনারায়ণ। উনি একবার আমীর খাঁ সাহেবকে অনুরোধ করেছিলেন যশরাজের সঙ্গে গাইতে। আমীর খাঁ বলেছিলেন 'গাইব, কিন্তু তার আগে আমিনুদ্দিন খাঁ ডাগরের সঙ্গে বেগম আখতারের ডুয়েটের ব্যবস্থা করতে হবে।' সে কথা যাক্, আলি আকবর ও রবিশঙ্করের সে সময়কার বাজনায় যেমন দুজনের হার্দিক মিলন, অচ্যুচ্চ দরের সাংগীতিক বুদ্ধি এবং সৃজনীশক্তির পরিচয় পেয়েছি সে রকমটি আর কোনো বাজনায় পাইনি। বেশ কিছুকাল পরে বিলায়েৎ খাঁ বিসমিল্লার সেতার সানাইয়ের অসাধারণ যুগলবন্দি শুনেছিলাম মহাজাতি সদনে। সাংগীতিক স্তরের দিক দিয়ে আলি আকবর ও রবিশঙ্করের বাজনার সঙ্গে তুলনা করছি না কিন্তু বিলায়েৎ খাঁর যন্ত্রের ওপর অসামান্য দখল যাকে টেকনিক্যাল ভার্চুয়োসিটি বলে তার এ প্রকার প্রমাণ পরে বা আগেও পাইনি। স্থানে স্থানে সেতার মনে হচ্ছে কখনও গান করছে, কখনও হুবহু সানাই বাজাচ্ছে। আর তানের তো জবাব নেই। সব তানের মধ্যে মিড় ও গমক আছে। সেকালের বীণকার ও ধ্রুপদিরা খেয়ালকে বেসুরো বলতেন বিশেষ করে তানের জন্য, কারণ অন্যান্য দেশের সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় মার্গ সংগীতের প্রধান পার্থক্য আমাদের মিড় ও শ্রুতির প্রয়োগ। খেয়ালের তান কাটাকাটা, এক স্বর থেকে অন্য স্বরে লাফিয়ে লাফিয়ে যায়। ভেসে যায় না। এইজন্য পুরাতনীপন্থী গোয়ালিয়র আগ্রার উস্তাদরা তান হলক ও গমকের সঙ্গে করতেন যাতে স্পর্শস্বরের ব্যবহার করা হয়। বিলায়েৎ খাঁর মিড়বহুল তান শুনলে সে যুগের ধ্রুপদি ও বীণকাররা অখুশি হতেন না।

সম্ভবত ১৯৫৫ সালের শীতকালে প্রথম আলি আকবর ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগলবন্দি শুনি। যুগলবন্দি হিসেবে উপরিউক্ত বাজনার সঙ্গে তুলনায় না হলেও খুবই ভাল লেগেছিল নিখিলের মত এক নতুন প্রতিভার সন্ধান পেয়ে। পরবর্তীকালে নিখিলকে অনেক শুনেছি। তার দেশের ও বিদেশের বাজনার একাধিক টেপও আছে আমার কাছে। এঁর বাজনা শুনে আমার ডন ব্র্যাডম্যানের সম্পর্কে নেভিল কার্ডাসের একটি উক্তি মনে পড়ত। ঐ জগৎবিখ্যাত ক্রিকেটারের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি ছিল অসাধারণ কন্‌সিসস্টেন্সি।

কার্ডাসের বক্তব্য 'ইফ আই হ্যাভ টু চুজ্ সামওয়ান টু ব্যাট ফর মাই লাইফ, আই উড চুজ্ ডন ব্র্যাডম্যান। হ্যাভিং ডান দ্যাট আই উড টেক আউট অ্যান অ্যানুইটি।' এর চেয়ে দামি ও সুচিন্তিত মন্তব্য যে নিজের অসাধারণ প্রতিভা ছাড়াও ব্র্যাডম্যানের 'ব্যাটিং ইজ আ কম্পেন্ডিয়াম অফ অল দ্যাট হ্যাজ প্রিসিডেড হিম্।' এই দুটি বক্তব্যের সঙ্গে নিখিলের সম্পর্কে আমার ধারণার আশ্চর্য মিল পাই। পণ্ডিত রবিশঙ্কর, আলি আকবর খাঁ এবং বিলায়েৎ খাঁরা শুধু উস্তাদই নন, তাঁরা পথপ্রদর্শক এবং নতুন নতুন বাজের সৃষ্টিকর্তা। নিখিলকে আমি সে পর্যায়ে না ফেললেও মনে করি নিখিলের পূর্বসূরীদের ভাল ভাল অঙ্গ তো সে হজম করেই ছিল, তাকে এক অভাবনীয় উৎকর্ষের পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে গিয়ে সেতার বাজের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছে। আমার মতে হি ট্রুলি ওয়াজ আ কম্পেন্ডিয়াম অফ অল দ্যাট হ্যাড প্রিসিডেড হিম। আর কন্‌সিসস্টেন্সি? নিখিলের বাজনা শুনে কাউকে হতাশ হতে দেখিনি।

আমজাদ আলি খাঁকে অনেক কাল থেকে জানি। প্রথম যখন তাকে দেখি, তখন তার সতেরো আঠারো বছর বয়স। ফুটফুটে চেহারা ও অসাধারণ হাত। আমজাদও তার বাপের বাজ বাজায় না, উস্তাদ হাফিজ আলি খাঁর হাতও পায়নি, কিন্তু সেও এক দিক দিয়ে বহু জিনিস শুনে হজম করে নিজস্ব একটা বাজ তৈরি করেছে, আর তার টেকনিকাল ভার্চুয়োসিটি সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর, উস্তাদ আলি আকবর এবং বিলায়েৎ খাঁর মত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন কোনো বাজের উদ্ভাবনীর জন্য দাবিদার বা পথপ্রদর্শক নন। এ উক্তিতে যদি নিখিল ভক্তদের মুখভার হয় সে জন্য আর একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সবচেয়ে বড় দান সরোদে রাগালাপ। তাঁর আর এক গুরুভাই সেনী ঘরানার প্রসিদ্ধ উস্তাদ বজীর খাঁর শিষ্য আমদাজ আলির পিতা উস্তাদ হাফিজ আলি খাঁও আলাপ করতেন, কিন্তু সে আলাপ রাগের ইমপ্রেশনিস্টিক অওছার পর্যায়ে পড়ত এবং সর্বসাকুল্যে কোনো রাগ মিনিট কুড়ির বেশি হত না। এমন কি দরবারি কানাড়ার মত রাগেরও নয়। শ্রুতির ব্যাপারে উনি ভয়ানক কট্টর ছিলেন। একবার স্বাধীনতার পর ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে দেশের সব বড় গায়ক বাদক রাষ্ট্রপতি ভবনে একত্রিত হয়েছিলেন। হলের এক কোণে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বসে। হাফিজ আলি খাঁকে সাদরে সোফায় পাশে বসিয়ে রাষ্ট্রপতি শিষ্টাচারসুলভ প্রশ্ন করলেন তাঁর কোনো বিশেষ সমস্যা আছে কি'না যা সরকার সমাধান করতে পারে। হাফিজ আলি খাঁ কিঞ্চিৎ উত্তেজিত ভাবেই উত্তর দিলেন সরকার হিন্দুস্থানের মালিক শাহেনশাহ্, আজ তাঁর নজরে এই গভীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবিলম্বে আনা উচিত বলেই তাঁর গুজারিশ্, তাঁর বিশেষ অনুরোধ, এই দরবারি কানাড়া রাগে নানা লোকে যথেচ্ছ গান্ধার



লাগাচ্ছে, হুজুর দয়া করে একটা ফরমান জারি করে বন্ধ করে দিন। ফৈয়াজ খাঁ, এনায়েৎ খাঁ-রা তো গত হয়েছেন হাফিজ আলি খাঁ-ই দেখিয়ে দেবেন দরবারির কোমল গান্ধারের শ্রুতি। খাঁ সাহেবের এবম্বিধ শিশুসুলভ উক্তি পাঠকের হাসির খোরাক যোগালেও মনে রাখতে হবে তৎকালীন গানবাজনার জগতের প্রবীণ দিকপালদের মূল্যবোধের তালিকায় স্বার্থের চেয়ে সংগীতজগতের উপকার অনেক উর্ধ্বে স্থান পেত।

যে কথা বলছিলাম। আলাউদ্দিন খাঁ ও হাফিজ আলি খাঁ এই দুই সেনী ঘরানার বীণকারের প্রসিদ্ধ শিষ্যের আগমনের পূর্বে কেরামতুল্লা ও কওকব্ খাঁর ঘরে আলাপ বলতে আমরা যা আজ বুঝি তার কোনো নিদর্শন সে কালে পাওয়া যেত না। সরোদ ও সেতার ছিল গৎ তোড়া তান ও ঝালার জন্য বিখ্যাত, যেরকম ছিল গানে গোয়ালিয়র নামক সবচেয়ে প্রাচীন খেয়ালের ঘরানার গান যাতে রাগ বিস্তার ছিল না, অওছার এবং বহ্‌লাওয়া ছিল। এই অভাব বোধে উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ ধ্রুপদের নোম্ তোম্ আলাপ খেয়ালে জুড়ে দিয়েছিলেন। আবদুল করিম খাঁ যখন রাগ বিস্তার খেয়ালের কাঠামোর একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করলেন তখন ফৈয়াজ খাঁ এবং রজব আলি খাঁ আমার প্রথম গুরু মালবিকা কাননের বাবা রবীন্দ্রলাল রায়কে বলেছিলেন, 'ইয়ে আবদুল করিম কিয়া কর রহা হৈ, রাগ বিস্তার করনা হৈ তো ধ্রুপদকা আলাপ করকে ফির খেয়াল গায়েঁ।' আবদুল করিমের জিনিয়াসের দান আজ সারা উত্তর ও পশ্চিম ভারত মেনে নিয়েছে।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও আলি আকবর খাঁ তাঁদের গুরুর তুলনায় আরও বেশি পরীক্ষণশীল। রবিশঙ্করের আলাপ বিশ্বস্তভাবে সিলসিলা মেনে চলে। আর সেতারে মন্দ্র ও অতি মন্দ্র সপ্তকে বিস্তারের নতুনত্ব সুরবাহার বা বীণের অভাব পূর্ণ করেছে। বিলম্বিত ও মধ্যলয়ের গৎকারিতে কর্ণাটক বাদ্যসংগীত থেকে অনেক ভাল ভাল জিনিস উনি নিজের মত করে নিয়েছেন, বিশেষত ছন্দের বৈচিত্র্য এবং তালের কূট ভগ্নাংশের অসাধারণ সমন্বয় যা ওঁর এবং আলি আকবরের বাইরে উত্তর ভারতের যন্ত্রসংগীতে ইতঃপূর্বে কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর 'মনে এলো' নামক জার্নালে সমাজতত্ত্ব আর্ট ও সাহিত্যের আলোচনার মাঝে রবিশঙ্কর ও আলি আকবর সম্পর্কে কিছু ধূর্জটিসুলভ মন্তব্য করেছেন যা গতানুগতিক সমালোচনার মধ্যে পড়ে না। আমার 'কুদ্‌রত্ রঙ্গিবিরঙ্গী' নামক পুস্তকে এর উদ্ধৃতি আছে।

> আলি আকবরের বাজনার প্রধান কথা ছন্দ, লয়। তার রাগিণী লয়-ময় (যেমন সৃষ্টি ব্রহ্মময়, আনন্দময়)। রাগিণী ফুটছে ছন্দিত হয়ে। তার প্রতি অংশ ছন্দে বাঁধা। তাই তার জীবন, শ্বাস প্রশ্বাস। নক্‌সাগুলো নেচে সামনে আসে, নেচে

চলে যায়। এই ছন্দের মধ্যেই তার ভাব, এক্সপ্রেশন ছন্দই ভাব। ব্যাকানালিয়ান নৃত্য নয়, ডায়োনিসিয়ানের জাতি, আরও সুচারু। আলি আকবর, নাটকত্ব ফোটায় এই শব্দপ্রাণ বাদনের সাহায্যে। সরোদের প্রথামত ড্রামাটিক টেকনিকে সে সন্তুষ্ট নয়, সে তারও অধিক বাজায়। আমার কাছে তার বাজনার প্রতিটি অংশ মূর্ত হয়ে ওঠে। তার ডিজাইনটা এত সুন্দর যে, নিজের ছন্দের তাগিদেই সেটি রূপ পায়। ছন্দ এখানে স্রষ্টা...রবিশঙ্কর 'হরফ', 'ফ্রেজ', 'ইডিয়ম', 'বাক্য', 'বোল'-এর রাজা। এমন স্পষ্ট হরফ, ফ্রেজ, বাক্য (সেন্টেন্স) আমি জীবনে শুনিনি। এত স্পষ্ট, যেন মনে হয় রাগিণীর পটভূমি থেকে বেরিয়ে এসে, চোখের সামনে দাঁড়ালো। এই বেরিয়ে এসে দাঁড়ানো আধুনিক আর্টের একটি প্রধান লক্ষণ। এতে একটু পশ্চিমী আমেজ থাকে নিশ্চয়ই—রবিশঙ্কর পশ্চিমের অনেক ভালো জিনিস হজম করেছেন। তাঁর বাজনা শুনলে আমার পূর্ব বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে সঙ্গীত মনের অন্য স্তরের ভাষা। সাহিত্য ছাড়া অন্য, তবু ভাষা। তার হরফ, ফ্রেজ, ইডিয়ম বাক্য থাকবেই। এই নক্সা ততটা ছন্দপ্রাণ নয় যতটা ভাষাপ্রাণ। অবশ্য দুজনের সব গুণই আছে, আমি কেবল আমার কাছে যতটুকু বিশেষত্ব মনে হয়, তাই ভাবছি।[১]

আমিও মনে করি উপরোক্ত নিরীক্ষণ এঁদের দুজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং এঁরা দুজনের কেউই তাঁদের গুরুর কপি নন। অন্নপূর্ণার বাজের সঙ্গেও এঁদের প্রভেদ বিস্তর যার জন্য এঁদের সৃজনশীলতা ও পরীক্ষণশীলতা মূলত দায়ী। বাক্য বোল এবং ইডিয়ম ছাড়া যেমন ভাষা তৈরি হয় না, সংগীতের ভাষাও তেমনই সিন্‌ট্যাক্‌সের ওপর একান্তই নির্ভরশীল। গানে বাক্য তৈরি করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ তা সাহিত্যের ভাষার অর্থাৎ কথার বা বোলের সাহায্য নিতে পারে। ধ্রুপদের নোম্‌ তোম্‌ আলাপে সাহায্য নিতে হয় ভাওয়েল এবং কনসোনেন্টের, যার নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। আজকালকার গানে, বিশেষত পূর্বাঞ্চলে এই বাক্য তৈরি করার বড় অভাব বোধ করি। কারণ এ সহজ কর্ম নয় এবং এর জন্য সাংগীতিক ভাষার ওপর দখলের প্রয়োজন। সংগীত নাট্যশাস্ত্রের অঙ্গ বলেই এর প্রয়োজন আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং সাংগীতিক এক্‌সপ্রেশন ঐ প্রকার ফ্রেজ বা বাক্য রচনার ওজন জ্ঞান বা পরিমিতিবোধের ওপর বড় বেশি নির্ভর করে। পরশুরামের লেখার মত, ফৈয়াজ খাঁর স্বর সমূহের গঠনসৌষ্ঠব এবং তার ডেলিভারি বোল বানানোর ব্যাপারে পরিমিতির জ্ঞান লক্ষণীয়। পরমান্ন রন্ধনের মত চিনির ভাগ কম হলে চলবে না। বেশি হলে সাংগীতিক প্রগল্‌ভতার পর্যায়ে পড়বে।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও আলি আকবর খাঁর মত বিলায়েৎ খাঁকেও পথপ্রদর্শকের

১ দ্র. ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, দ্বিতীয় সম্ভার, পৃ. ১২৪-২৫।

মধ্যে ফেলতে আমরা বাধ্য। ইনি ইচ্ছে করলে বাপ ঠাকুরদার বাজ বাজাতে পারেন, কিন্তু যে বাজের স্রষ্টা বিলায়েৎ তাকে কণ্ঠসংগীতের এত কাছাকাছি এঁর পূর্বে কেউ নিয়ে গেছেন বলে জানি না। এঁর আলাপ কিরানা ঘরানার বিস্তারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে, গৎকারিতে এঁর পাঁচমাত্রার মুখড়া, খেয়ালের বন্দিশ ভিত্তিক বাজ, মিড়বহুল দ্রুততান আগ্রা গায়কির কথা পদে পদে মনে করিয়ে দেয়, বিশেষত, উস্তাদ ফৈয়াজ় খাঁকে। উনি যে বাজের সৃষ্টি করেছেন তার পেছনে যে প্রকারের টেকনিক্যাল ভার্চুয়োসিটি আছে তা অনন্য এবং শুধু অসাধারণত হাত থাকলেই যে এ বাজের মর্যাদা পুরোপুরি রক্ষা করা যায় না তা এঁর ভাগ্নে রইস খাঁ এবং এঁদের ঘরানার অনুসরণকারী ঘরের ও বাইরের একাধিক উস্তাদ এবং সুন্নী শাগীর্দদের শুনলেই বোঝা যায়। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে রবিশঙ্কর বিলায়েতের নিছক অনুসরণকারীদের দলে না ফেললেও ওঁকে পথপ্রদর্শক বা নতুন বাজের সৃষ্টিকর্তাদের সঙ্গে একাসনে বসাতে পারছি না। এই বক্তব্যের সঙ্গে নিখিলের সন্দেহাতীত অত্যুচ্চ মানের বাজনার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

সৃজনশীলতার আর একটি নিদর্শন নতুন নতুন রাগ গৎ ও বন্দিশ তৈরি করার অভ্যাস। আলাউদ্দিন খাঁ করেছেন 'হেমন্ত', 'হেম বেহাগ', 'মদনমঞ্জরি', 'মাঝখাম্বাজ', 'মাঝকেদার', 'হেমন্তভৈরব', 'হৈমন্তী', 'শুভাবতী', 'দুর্গেশ্বরী' ইত্যাদি ইত্যাদি। আলি আকবরের সৃষ্টির মধ্যে পড়ে 'গৌরীমঞ্জরি', 'চন্দ্রনন্দন', 'মেধাবী', 'মধুমালতী' প্রভৃতি। রবিশঙ্কর মাদ্রাজী রাগ ছাড়াও বাজিয়েছেন তাঁর তৈরি 'নট ভৈরব', 'বৈরাগী', 'পূরবী কল্যাণ', 'পরমেশ্বরী', 'কামেশ্বরী', এবং একাধিক 'ঈশ্বরী'। পরীক্ষণশীলতার ফলে কিছু রাগ দাঁড়ায়, কিছু সে পর্যায়ে ওঠে না। রাগ জনপ্রিয় হয় যখন কালের বিচারে অন্ততপক্ষে শ'খানেক বছর ধরে তার স্থান পাকা হয় ম্যহ্ফিলে। বিলায়েৎ খাঁও তৈরি করেছেন দরবারিতে শুদ্ধ নিখাদ দিয়ে বিলায়েতি কানাড়া, শুদ্ধ মালু, সাঁঝসরাবলি ইত্যাদি। শেষেরটি উনি বলেন নাকি আমীর খুসরুরই রাগ। জানি না, তবে আমীর খুসরু খেয়াল তবলা এবং সেতারের জন্মদাতা এই কিংবদন্তির পেছনে ঐতিহাসিক প্রমাণ কি আছে তা বড় একটা কেউই জানে না। এ বিষয়ে আমি আমার 'খেয়াল ও হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের অবক্ষয়' নামক পুস্তকে বিশদ আলোচনা করেছি। পণ্ডিতদের মতে দেশজ সংগীত বা সাধারণী গীত যা খেয়ালের জনক তা আরও প্রাচীন। আর সুফিরা তো কব্বালি বা কাওয়ালি গাইতেন তাকে খেয়ালের পূর্বসূরী স্বচ্ছন্দে বলা যায়।

আলি আকবর ও রবিশঙ্কর সওয়ারির সাহায্যে একাধিক তালেরও সৃষ্টি করেছেন। সাড়ে আট, এগারো, সাড়ে তেরো এই জাতীয় তালে বাজিয়ে ওঁরা প্রচুর আনন্দ পান। বহুকাল পূর্বে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ মহাশয়কে প্রশ্ন করেছিলাম এই সাড়ে বস্তুটা কী? উনি একটু মুচকে হেসে বললেন 'ব্যাপারটা কী জানেন?

পুরো স্টেজ জুড়ে নৃত্য করা যায়, থালার ওপরও নাচ দেখেছি, আবার পাঁচিলের ওপর চড়েও নেচে কেউ কেউ আনন্দ পান। সেই রকমটা আর কী।' উত্তরকালে অমিয় সান্যালের 'প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত' ও আটশ বছর আগের শার্ঙ্গদেবের কল্যাণে ১০৮ রকম তালের বর্ণনা পেয়েছি তাতে সাড়ে এবং পৌনের ছড়াছড়ি।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও আলি আকবর খাঁর নিজেদের সৃষ্ট রাগ বাজানোর সূত্রে একটা ছোট গল্প মনে পড়ছে। পঞ্চাশের দশকের কথা বলছি যখন ডোভার লেন কন্‌ফারেন্‌স ডোভার লেনেই শামিয়ানা খাটিয়ে হত। রবিশঙ্কর ও আলি আকবর যুগলবন্দি বাজাচ্ছেন। একটা রাগ বাজানো শেষ হয়েছে, ধূমপানের উদ্দেশ্যে বাইরে যাচ্ছি, ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা। প্রশ্ন করলেন 'এঁরা কী বাজালেন?' আমি একটু অবাক হয়ে বললাম 'কেন বেহাগ বাজালেন, কিছু খটমট রাগ তো নয়।' অবাক হওয়ার কারণ লখনউ-এ গভর্নমেন্ট আর্টস্ স্কুলে অধ্যয়ন করার সময় প্রদোষবাবু বছর তিনেক ম্যারিস কলেজ অফ মিউজিক যা এখন ভাতখণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে সেখানেও মাথা মুড়িয়েছিলেন। উত্তরে উনি চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলেন কি শুধুমাত্র বেহাগ, উলঙ্গ বেহাগ? আগে পরে কিছু নেই?'

বাজনার দ্বিতীয় ভাগে ওঁরা আবার বাজালেন চন্দ্রনন্দন। আবার প্রদোষ দাশগুপ্তর সঙ্গে দেখা। এবার উনি মাতৃভাষায় প্রশ্ন করলেন 'কি নাম দিসে এডার?' আমি বললাম 'চন্দ্রনন্দন, যতদূর জানি আলি আকবরের তৈরি রাগ।' মৃদু হেসে প্রদোষবাবু বললেন 'স্যান্দরের পোলা, তাই কও, চিনতে পারি নাই।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমার গানের হাতেখড়ি হয় আট বছর বয়সে রবীন্দ্রলাল রায়ের কাছে। ইনি পণ্ডিচেরির দিলীপকুমার রায়ের জ্যাঠতুতো ভাই। দিলীপকুমার আমার পিতা স্বর্গত ধূর্জটিপ্রসাদের বাল্যবন্ধু, সেই সুবাদে রবিকাকা এবং তাঁর দাদা হেমেন্দ্রলাল রায় দুজনই ম্যারিস কলেজে (অধুনা যার নামকরণ হয়েছে ভাতখণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হলেন। ১৯২৭-এ যখন এই কলেজের গোড়াপত্তন হয় তখন ভাতখণ্ডেজীর ক্লাসে মাত্র তিনটি ছাত্র—রোল নং এক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দুই শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর এবং তিন এইচ. এন. হুক্কু। এর পরের বছর যাঁরা এসে জুটলেন তাঁরা সবাই বঙ্গসন্তান, তাঁদের মধ্যে হেমেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রলাল ছাড়া অম্বিকা মজুমদার, স্মরজিৎ কাঞ্জিলাল, প্রশান্ত দাশগুপ্ত ইত্যাদিরা ছিলেন। পুরোভাগে ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল যাঁর মতো আসর জমানো আড্ডাবাজ সংগীতজগতে আর দ্বিতীয়টি দেখিনি। ইনি সংগীতবিশারদ পাশ করে বছর খানেক ভর্তিখণ্ডেজির কাছে সংগীতনিপুণের ক্লাস করেছিলেন। মইনুদ্দিন ও আমিনুদ্দিন ডাগরের পিতা নাসিরুদ্দিন খাঁ যাঁর মিড়সুতের বর্ণনা দিতে গিয়ে কর্তারা বিহ্বল হয়ে পড়তেন, তাঁর কাছে উনি ধ্রুপদের তালিম নিয়েছিলেন।

বাবা নাসির খাঁ নামক প্রসিদ্ধ খেয়ালিয়ার শাকরেদি করার পর বেনজিরবাইয়ের কাছে ঠুংরি এবং বিরজু মহারাজের বাবা অচ্ছন ও কাকা শম্ভু মহারাজের কাছে স্বল্পকাল তবলা ও কথ্থকেরও তালিম নেন। এতসব কাণ্ডকারখানার পর উনি কলকাতায় এসে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ইত্যাদিতে হিরো সেজে ও গান গেয়ে নিউ থিয়েটার্সের মুখোজ্জ্বল করেন। পরবর্তীকালে গান আর গাইতেন না। কিন্তু গানের বৈঠকে পাহাড়ীকাকা এলে যাকে বলে চার চাঁদ লগ্ যাতা থা। বাঙালি শ্রোতা তারিফ করতে জানে না। আধনিবস্ত হলে বিলিতি কনসার্টে গম্ভীরানন সাহেবসুবোর মতো নিঃশব্দে গানবাজনা শুনে কিছু রুটিন হাততালি দেয় মাত্র। শান্তিনিকেতনে আবার হাততালির পরিবর্তে 'সাধু সাধু' রব তোলে। ঠিক জায়গায় দাদ বা তারিফ পড়লে গায়কের যে বুক দশ হাত হয়ে যায় এ কায়দা পাহাড়ী কাকার মতো কেউ রপ্ত করেনি।

রবিকাকা লখনউ থেকে পাশটাশ করে কলকাতায় আমাদের বালিগঞ্জ পৈতৃক

বাড়ির খুবই কাছে এসে যখন উঠলেন তখন আমার বয়স আট, আর তাঁর কন্যা মালবিকা নেড়িমুণ্ডি শিশু মাত্র। ওঁর কাছে খান দুই ধামার, গোটা তিনেক লক্ষণগীত শিখলাম। মন আমার তখন সারেগামায় নেই, চতুর্দিকে পঙ্কজ মল্লিক, সায়গল, কাননবালার ফিল্মের গান ভিড় করে কানের মধ্যে সেঁধুচ্ছে। তার পাশে এই শুকনো কেঠো ধামার আর ইমনের 'মা নি বরজে গায়ে' কিভাবে জায়গা করে নিতে পারে? অতএব বছর খানেকের মাথায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে আমার টেম্পোরারি ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। এখানে বলা আবশ্যক আমার বাবা আমাকে ও আমার মাকে লখনউ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতায় যাতে কাকাদের হেফাজতে থেকে আমার স্কুলে বাংলা সংস্কৃতর সঙ্গে কিছুটা পরিচয় হয়। সে যুগে কর্তারা এক সেন্ট জেভিয়ারস্ বাদে সব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে ঘেন্না করতেন। ট্যাশ ফিরিঙ্গির সন্তানদের সঙ্গে জুটে chi chi ইংলিশ শিখবে এই ভয়ে আমাকে তাঁরা ভাল দিশি স্কুলে পাঠান সাব্যস্ত করলেন। এ ভয় যে নিতান্ত অমূলক নয় তার নজির হিসেবে বলতে পারি, আমাদের যুগে যাঁদেরই উত্তরজীবনে ভাল ইংরেজি বলতে বা লিখতে দেখেছি তাঁরা সবাই দিশি স্কুলে পড়া, যথা সত্যজিৎ রায়, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, অসিত গুপ্ত, অনিল গুপ্ত, সুভাষ ঘোষাল আরও অনেকে। আমার বাবা বারাসত গভর্নমেন্ট স্কুল ও হেয়ারস্কুলে পড়ে সায়েন্স নিয়ে সেন্ট জেভিয়ারস্-এ যান, কিন্তু কাকারা ডাঃ দেবীপ্রসাদ ও অধ্যাপক সুসাহিত্যিক বিমলাপ্রসাদ মিত্র ইনস্টিট্যুশন মেন্-এর ছাত্র এবং আমার ঠাকুরমার ভাষায় জলপানি অর্থাৎ স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তাঁদের সময় থেকে কলেজ স্ট্রিটের কাছে বেনেটোলার মোড়ে এই প্রতিষ্ঠানটির বড়ই সুনাম ছিল। আমার সময় হেডমাস্টার এবং স্কুলের মালিক নির্মল মিত্তির মশায় গর্ব করে বলতেন 'আরে বাবা! আমার স্কুলে বেশ কয়েকজন ছেলে রয়েছে যারা বাঁ হাতে লিখলেও খান তিনেক লেটার পাবে।' বলা বাহুল্য আমি তাঁর এ লিস্টিতে পড়তাম না, তার কারণ একটিই, অঙ্ক ছিল আমার কাছে বাঘ। ক্লাস টেনের প্রথম টার্মিনাল পরীক্ষায় আমি পাই একশর মধ্যে তিরিশ, দ্বিতীয় টার্মিনালে উনত্রিশ এবং তৃতীয় বা টেস্ট পরীক্ষায় আটাশ। নির্মল মিত্তির মশায় এবং আমার কাকারা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কারণ টেস্ট ফেল করলে ম্যাট্রিক দেওয়ার অনুমতি স্কুল কর্তৃপক্ষ দিতেন না সেকালে, যদিও শুনেছি অন্যান্য বিষয়ে আমার আশি নব্বুই নম্বর ছিল। ফল: আলাদা করে একটি পরীক্ষা নেওয়া হল অঙ্কর, তাতে আমি ৩৯ পেয়ে টায়টোয় পাশ করলাম। খবর পেয়ে বাবা লখনউ থেকে এলেন এবং কর্তারা চাঁদা করে ঠ্যাঙালেন এবং তারপর সুশীলবাবু নামক অঙ্ক শাস্ত্রে ভাল মাথাওয়ালা একটি যুবককে মোতায়েন করলেন আমাকে বিভিন্ন স্কুলের টেস্ট পেপার থেকে অঙ্ক কষিয়ে ভয় ডর দূর করাতে। অতএব তেরো বছর বয়সে সেনেট হলে, (যে সুদৃশ্য গ্রীক স্থাপত্যের

অনুকরণে তৈরি বিরাট বাড়িটি ভেঙে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা বিলডিং-এর [যে] কুৎসিত সংযোজন করা হয়েছে) সেখানে দুরু দুরু বক্ষে পরীক্ষা দিতে গেলাম। কিন্তু অহো! 'স্পেয়ার দা রড অ্যাণ্ড স্পয়েল দা চাইল্ড' এই বিখ্যাত ইংরাজি নীতিবাক্যটির কী মহিমা! বসেই জিওমেট্রি এবং অ্যালজেব্রার সব অঙ্ক জলের মত সমাধান করে একটি সিঁড়িভাঙা অঙ্ক অল্প আয়াসে কাৎ করে ফেললাম। তার পরে দেখি বালকদের জীবন অতিষ্ঠ করার জন্য যাদব চক্রবর্তী মহাশয়ের বাছা বাছা বুদ্ধির অঙ্ক, তাতে বিপরীত দিকে ধেয়ে যাওয়া দুই রেলগাড়ি, চৌবাচ্চায় জল ভরার এবং একটি তৈলাক্ত বাঁশের খুঁটিতে বানর সন্তানের ক্রমাগত চড়ার এবং পিছলে পড়ার অঙ্ক প্রশ্নপত্রে রয়েছে। সেই সঙ্গে দেখি রয়েছে একটি পিতা পুত্রের বয়স নিয়ে অন্বেষণ করার রহস্যময় অঙ্ক, যেটিকে আমার ওরই মধ্যে পছন্দসই মনে হল। ততক্ষণে সাতাত্তর নম্বর আমার পকেটে, এই অঙ্কটির সমাধান করলে আরও ছটি নম্বর আমায় লেটার পাইয়ে দেয়। তা সে অঙ্ক কষে আমি উত্তর পেলাম বাপের বয়স তিরানব্বুই এবং পুত্রের বয়স তিন পূর্ণ তিনের চার। সে কাঁচা বয়সেও বুঝতে অসুবিধে হল না যে এ অঙ্কের ফল বাস্তব জীবনে অসম্ভব। ঢঙ করে ঘণ্টা বেজে গেল এবং ইনভিজিলেটর পরীক্ষার খাতা কেড়ে নেওয়ার আগে লিখে দিলাম, 'বায়োলজিকালি ইম্‌পসিব্‌ল, নো টাইম লেফ্‌ট টু অ্যাটেম্‌প্‌ট আ সেকেন্ড টাইম।' মনে ক্ষীণ আশা ছিল পরীক্ষক দয়াপরবশ হয়ে যদি তিনটে নম্বর গ্রেস দিয়ে দেন। যখন পরীক্ষার ফলাফল বের হল তখন সারা মুখুজ্যে পরিবার, তাঁদের হিতৈষীবৃন্দ এবং হেডমাস্টার মশায়কে স্তম্ভিত করে দিয়ে আমার মার্ক শীটে অঙ্কয় সাতাত্তর নম্বর জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, ইংরেজি—কোনোটাতেই লেটার নেই। আছে ভূগোল এবং হাইজিন-এ। এ রহস্যের সমাধান হলো যখন আমার বাবার বড় জ্যাঠতুতো ভাই নরনাথ মুখোপাধ্যায় আমায় জানালেন যে ধূর্জটিপ্রসাদের পিতামহ অর্থাৎ আমার প্রপিতামহ Colly Doss Mukherjea (১৮৩৫-৮৮) হুগলি কালেজের ইংরেজি ও ইতিহাসের অধ্যাপক থাকাকালীন 'অভিমন্যুবধ' নামক একটি কাব্যগ্রন্থ এবং ইংরেজি ভাষায় ভূগোল বৃত্তান্ত রচনা করেন। বলা বাহুল্য এই ভূগোল-প্রীতি দুই পিড়ি টপ্‌কে আমার মধ্যে প্রবেশ করেছিল, যে কারণে পরবর্তীকালে আমার দু-একটি এন-আর-আই বন্ধু আমাকে ভ্রমণানন্দ স্বামী আখ্যা দেন। কলি ডস্‌ মুখার্জির কৃতী ছাত্রদের মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট নাম—জাস্টিস শহীদ সুরাবর্দি, জাস্টিস সামশুল হুদা, স্যার সৈয়দ আমীর আলি, অধ্যক্ষ বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবং অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র। শেষোক্ত ব্যক্তির সম্পর্কে বিখ্যাত গল্প পথ চলতে চলতে কেউ ওঁকে জিজ্ঞেস করেন স্টার থিয়েটারের রাস্তা। কট্টর ব্রাহ্ম হেরম্ব মৈত্র যাত্রা থিয়েটারের ঘোরতর বিপক্ষে অন্যদিকে অসত্য ভাষণকে পাপ বিবেচনা করেন। বললেন—'জানি, কিন্তু বলব

না।' আর একবার বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন, পৌত্তলিক দেবদেবীর নাম গায়ে লেখা বাস একটির পর একটি ছেড়ে দিচ্ছেন। দেরি হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে একটি বাস এল গায়ে লেখা 'সত্যনারায়ণ'। উনি উঠে সন্তর্পণে নারায়ণকে এড়িয়ে সামনে গিয়ে বসলেন অর্থাৎ সত্যর ওপর। এঁরই পুত্র অশোক আবার কাননবালাকে বিবাহ করে ব্রাহ্ম সমাজে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করেন।

মিত্র স্কুলে যখন ভর্তি হই তখনও ১১ বছর পুরতে মাস তিনেক বাকি। নীরেন চক্কোত্তি কোথায় যেন লিখেছে আমি নাকি খুব ডাকাবুকো ছেলে ছিলাম। কী করে সে বয়সে ডাকাবুকো নাম কিনতে পারি ভাবতে কৌতূহল হয়। তবে কী করে ধীরে ধীরে ধীরে অল্প বিস্তর কাপ্তেনি করতে শিখলাম, তার পেছনে একটি সঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। আমি আসতাম বালিগঞ্জ থেকে দশ নম্বর বাসে, ভাড়া কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত নগদ দু আনা। যাতায়াতের ভাড়া ছাড়া মা আরও চার আনা পয়সা দিতেন ওপর পকেটে রাখতে, যাতে পয়সা কখনও কম না পড়ে। সঙ্গে থাকত চ্যাপটা টিনের কৌটোয় কখনও স্যাণ্ডুইচ, কখনও পরোটা বা লুচি তরকারি। অল্পদিনের মধ্যেই আমি আবিষ্কার করলাম, বালিগঞ্জ থেকে শিয়ালদা ট্রেনের হাফটিকিট রিটার্ন চার পয়সা মাত্র, বাকিটা হেঁটে মেরে দিতাম এক পয়সার কাবলি মটর ভাজা কিনে চিবুতে চিবুতে। এর ফলে হাতে নগদ সাত আনা বাঁচত। অর্থাৎ এখনকার ৪৩ পয়সা। প্যারাগনে তখন বড় গেলাস ঘোলের শরবৎ দু আনা, দিলখুশ কেবিনের চপ কাটলেট এক আনা করে, ফাউল কাটলেট দশ পয়সা। অতএব বন্ধুবান্ধব জুটতে দেরি লাগল না, আর সেই যে সারাজীবন খর্চার হাত দরাজ হয়ে গেল, এই মনমোহন-যশবন্তর-চিদম্বরম-এর যুগেও তাকে সামলানো যাচ্ছে না। এতৎসত্ত্বেও মাঝে মাঝে ধার হয়ে যেত, একবার মনে আছে ঋণের বোঝার ভারে পর্যুদস্ত হয়ে আমায় নেসফিল্ডের গ্রামার বেচতে হয়েছিল, পেয়েছিলাম পাঁচ টাকা। মিত্র স্কুলের মাস্টারমশায়দের কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব, এঁদের পড়ানোর কায়দা, কল্পনাশক্তি উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা এবং ক্বচিৎ কদাচিৎ বেত্রাঘাতের দ্বারা আমাদের স্বভাবগত আলস্য দূর করে জ্ঞানপিপাসা বাড়ানোর প্রচেষ্টার জন্য। দারুবাবু ছিলেন সেকেন্ড পণ্ডিত, কিন্তু তাঁর চেহারা একেবারেই পণ্ডিত মার্কা ছিল না। রঙ ফর্সা, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া কাঁচা পাকা বাবরি চুল, পরনে ভাল কাপড়ের পাঞ্জাবি ধুতি, বুকে কালো কারের ফিতে দিয়ে বাঁধা পকেট ঘড়ি, শীতকালে গায়ে কাশ্মীরি শাল। বিকেলে কোচিং ক্লাসে পড়াতেন বাংলা ব্যাকরণ ও সংস্কৃত। পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগরের সংস্কৃত ব্যাকরণকে হৃদয়গ্রাহী করার পন্থা তৎপূর্বে আবিষ্কৃত হয়নি। দারুবাবু কিছুটা সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর স্বরচিত শ্লোকের দ্বারা। বেশিরভাগই ভুলে গেছি, এক আধটা মনে আছে। কিছু শব্দ আছে, আকারান্ত দিয়ে শেষ হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী লিঙ্গ নয়। যথা দারা

সবিতা ইত্যাদি। দারুবাবু শিখিয়েছিলেন :

আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গা, বর্জয়িত্বা বাবা খুড়া,
ক্বচিৎ ক্বচিৎ ব্যভিচারী, ছাগলীর মুখে যথা দাড়ি।

এ প্রকার আরও গোটা দশ বারো এক কালে মনে ছিল। আজ তিন কুড়ি বছর পরে তা স্মৃতি পথে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে। দারুবাবুর সন্ধ্যার কোচিং ক্লাসে আমার সঙ্গে পড়ত হাফিজুর রহমান মালিক নামে একটি বিরাট মোটা ছেলে। ডাঃ অমিয় বোসের ভাই নীলাদ্রি পরে কস্ট অ্যাকাউন্টস্ ইনস্টিট্যুটের চেয়ারম্যান ও ম্যাকনিল কোম্পানির ফিনান্স ডিরেকটর হয়। শঙ্করাচার্য দত্ত যুদ্ধে যোগ দেয় সাধারণ জওয়ান হিসেবে এবং যুদ্ধের শেষে হাবিলদার হয়ে সেই জমানো টাকায় বিলেতে গিয়ে ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে। কালে যখন আহমদাবাদ ইলেকট্রিসিটির চীফ এক্সিকিউটিভ হয় তখন কার্যোপদেশে আমার সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বর্তমানে সাদার্ন অ্যাভিনিউর প্রশস্ত ফ্ল্যাটে থাকে, গল্প লেখে এবং দুবেলা আর পাঁচজন বৃদ্ধের মত লেকে পদচারণা করে। এদের সংস্কৃতর সঙ্গে পরবর্তী জীবনে কতটা যোগাযোগ ছিল জানি না, কিন্তু দারুবাবুর কৃপায় আমি বি.এ অবধি সংস্কৃত টেনেছিলাম, লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বাংলার মাস্টার ছিলেন কৃষ্ণদয়াল বসু। পাতলা চেহারা, চোখে সোনার চশমা, পরনের ধুতি পাঞ্জাবি এবং উত্তরীয়। সব সময়ে মনে হত এই ধোপার বাড়ি থেকে কেচে এসেছে। নবনীতার বাবা-মা নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী দেবীর তিনি বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁদের সম্পাদিত ছেলেদের 'পাঠশালা' নামে একটি মাসিক পত্রিকায় বাংলায় শব্দসন্ধান বা ক্রসওয়ার্ড রচনা করতেন। প্রথম পুরস্কার ছিল পনেরো টাকা এবং আমাদেরই সহপাঠী কুমার বোস নামক একটি ছেলে একবার এই পুরস্কার পেয়ে ক্লাসে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি করে। 'প্রতিভার বিশেষণ' নয় অক্ষরে 'নবনবোন্মেষশালিনী' লিখে নীরেন কৃষ্ণদয়ালবাবুর কাছে বাহবা পেয়েছিল। কৃষ্ণদয়ালবাবু আমাদের নিয়মিত সপ্তাহান্তে 'এসে' লিখে আনতে বলতেন। পড়াতেন দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা' এবং ভরত ও লক্ষ্মণ যে রামের চেয়ে অনেক বড় মাপের মানুষ—এই প্রতিপাদ্য বিষয় নানান ভঙ্গিতে সুচারুরূপে পেশ করতেন। ওঁর ছন্দর ওপর ক্লাস সবচেয়ে ভাল লাগত এবং ওঁর একাধিক ছড়া সুনির্মল বসুর মতই ছন্দ এবং মিলের জন্য অসাধারণ বলে মনে হয়েছিল। একটি ছড়ার আধখানা নমুনা দিলাম।

'এক পিঁপড়ে অনেক চেষ্টাতে
হায় শেষটাতে
যখন একটি ফোঁটা জল পেলে না তেষ্টাতে
অতি আকুল হয়ে নদীর ঘাটে যেই গেল

সে যে অমনি জলের ঢেউ লেগে ভেসেই গেল
সেই নদীর ধারে একটা বটের গাছ ছিল
এক ঘুঘুপাখী সেই গাছে গান গাচ্ছিল।' ইত্যাদি

নীরেন বহু কাল আনন্দবাজারের রবিবাসরীয় বিভাগটি দেখত এবং 'আনন্দমেলা'র সম্পাদক ছিল। তখন একবার কালিদাস রায় কবিশেখরের বাংলায় ভুল ধরে। মিত্র মেনের ছাত্র ছিল শুনে কালিদাসবাবু বলেন 'কেষ্টর যখন তুমি ছাত্র তখন ধরে নিতে হবে বাংলার জ্ঞান কিছুটা তোমার হয়েছে।'

অটলবাবু পড়াতেন সংস্কৃত, অঙ্ক এবং কখনও কখনও বাংলা। নীরেনকে দেখেই জিজ্ঞেস করেছিলেন 'কোন ইস্কুল আঁধার করে এসেছ বাবা?' বার দুয়েক প্রশ্ন করার পর নীরেন মৃদুস্বরে বলল 'বঙ্গবাসী।' 'তাই বল,' অটলবাবুর উক্তি, 'সেদিন স্কট লেন দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছি, দেখি চতুর্দিক অন্ধকার, শুধু রাস্তার গ্যাসের বাতিগুলো টিম্ টিম্ করে জ্বলছে। এখন বুঝছি কেন। তা বাপু, বাপের অন্ন ধ্বংস যখন করবেই স্থির করেছ তখন আর আমি তোমায় কী শেখাব?' ইত্যাদি। এ জাতীয় কথাবার্তা নাইন্থ টেন্থ ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে প্রচুর আমোদের খোরাক হত বলাই বাহুল্য। এর ওপর 'দাঁত ক্যালানে', 'যমের অরুচি' জাতীয় বাক্যবাণ প্রয়োগ যখন বেছে বেছে ধেড়ে ধেড়ে ছেলেদের ধরে ধরে করতেন তখন বাকি ছাত্রদের মধ্যে হাসির হর্‌রা পাশের ক্লাসের মাস্টারমশাইদের কান অবধি পৌঁছত। তাঁরা মুচকি হেসে আবার পড়ানো শুরু করতেন, কারণ তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই হয় এককালে অটলবাবুর ছাত্র ছিলেন অথবা স্টাফ কমনরুমে অটলবাবুর বাক্যবাণের সঙ্গে তাঁদের সম্যক পরিচিতি ছিল।

যাঁর কাছে আমি সবচেয়ে বেশি ঋণী, তাঁর নাম সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়। সন্তুদা আমার সেজ পিসিমার ছেলে। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সামনে ভুবন ধর লেনে এঁর দুখানি বাড়ি ছিল। আমি যখন খুব ছোটো তখন সন্তুদার ঠাকুর্দা গোপালবাবু মারা যান। বয়সের কারণে ওঁর ভীমরতি' হয়েছিল, শুনে সে বয়সে আমার প্রচুর কৌতূহল হত এই 'ভীমরতি' বস্তুটি কী জানবার জন্য। আরও মজা পেয়েছিলাম যখন আমার ডাক্তার সেজকাকার সঙ্গে সেজপিসিমাকে দেখতে গিয়ে মনের আনন্দে হান্টলি পামারের গোল্‌ডেন পাফ বিস্কুটের টিন প্রায় শেষ করে এনেছি তখন দেখি একটি প্রমাণ সাইজের গরুকে পাশে গোপালবাবুর বাড়িতে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চড়ানো হচ্ছে। অতঃপর মুমূর্ষু গোপালবাবুর হাতটি গরুর ল্যাজে ছোঁয়ানো হলো যাতে উনি ঐ ল্যাজ ধরে বৈতরণী পার হতে পারেন। গোপালবাবুর দক্ষিণ দিকে শেষযাত্রার পর সন্তুদার কপালে যৌথ পরিবারের সব সম্পত্তি অর্শায় কারণ ঐ পরিবারে উনিই একমাত্র পুরুষ সন্তান।

সন্তুদার মিত্র স্কুলে শখের মাস্টারি আর কারুর পক্ষে না হোক আমার অনেক

ব্যাপারে চোখ কান খুলে যায়। আমার ছোটকাকা বিমলাপ্রসাদ তখন রিপন কলেজে (এখনকার সুরেন্দ্রনাথ) পড়ান এবং ওঁদের গোষ্ঠীর অন্যান্য অধ্যাপকরা ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু, দে, প্রমথ বিশী এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সন্তুদা আমার কাকার আওতায় এসে সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি আসক্ত হন এবং বই কেনার অভ্যাস মামার বাড়ি থেকে পেয়ে ছোটখাটো একটি লাইব্রেরি বানিয়ে ফেলেন। উনি পড়াতেন অসম্ভব ভাল এবং সেই সঙ্গে ভাল ভাল বইয়ের সঙ্গে আমাদের কৈশোরেই পরিচয় করিয়ে দেন। সেটা, 'মৌচাক', 'শিশুসাথী' 'রংমশাল', 'পাঠশালা'-র যুগ, আড়ালে তখন আমরা শুধু বঙ্কিম শরৎচন্দ্র নয়, কল্লোল যুগের বেশির ভাগ নাটক নভেল পড়তে শুরু করেছি। সন্তুদার প্ররোচনায়ই আমি ইংরেজি বই পড়া শুরু করি এবং কন্যান ডয়েল, ব্যালান্টাইন, রাইডার হ্যাগার্ডের পাশাপাশি ক্ল্যাসিক্স। সন্তুদার ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস ও ইংরেজি পড়ানোর মধ্যে একটা রোম্যান্টিসিজ্ম ছিল যার ছোঁয়া আমার বারো-তেরো বছর বয়সে কল্পনাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করে। লেখাপড়া করার নেশাটা অনেকটা মদের নেশার মত, সারাজীবনের সাথী হয়ে থাকে। তবে কী খাওয়া হচ্ছে সে প্রশ্নটা ওঠে, কারণ এ লাইনে বাছবিছারের মূল্য অপরিসীম। কালীমার্কা দিশি, না, রাম, হুইস্কি না স্কচ ও ভিনটেজ ওয়াইন? বইয়ের নেশাও একই প্রকারের, সেই কারণে আমাদের বাড়িতে পথপ্রদর্শনের অভাব না থাকলেও কৈশোরে আমার রুচিকে পরিচালনা করার কৃতিত্ব অনেকখানি আমার এই পিস্তুতো দাদার।

সন্তুদা স্কুলে আসতেন বিলিতি ডবল কাফ্ শার্টের সঙ্গে ধপধপে তাঁতের ধুতি ও পায়ে অ্যালবার্ট জুতো পরে। শ্যামবর্ণ লম্বা চওড়া মানুষ, ভারী গড়ন, চোখে চশমা। বছর ছয়েক পরে কলকাতায় ফিরে দেখি মাঝে মাঝে সন্তুদাকে দেখা যায় চৌরঙ্গী অঞ্চলে পরনে গোলাম মহম্মদ র‍্যাংকেনের সুট, সঙ্গে একটি যুবতী। কানাঘুষো শুনলাম সেটি সন্তুদার একটি ছাত্রী, উত্তর কলকাতার বনেদি কায়স্থ বাড়ির মেয়ে, নাম আনা বসুমল্লিক। হঠাৎ একদিন শুনি পুত্র পরিবার কলকাতার সম্পত্তি ফেলে তাকে নিয়ে সন্তুদা হাওয়া হয়ে গেছে। কোনো খবর নেই, কেউ বলে তারা বিদেশে থাকে, কেউ বলে কুলু মানালিতে আপেলের বাগান করেছে। বছর দশেক পরে চিদানন্দ দাশগুপ্ত সন্তুদাদের খবর দিল, তারা থাকেন কোডাইক্যানালে, সন্তুদা নাকি অনর্গল তামিল বলে, ওঁর ফার্মের আলু—'চ্যাটার্জিজ পোট্যাটো', মাদুরার বাজারে পড়তে পায় না। চিদানন্দ আঁতেল মানুষ, তার সঙ্গে সন্তুদার নাকি কোডাইক্যানালে অসম্ভব জমেছিল। এর কিছুকাল পরে একদিন ছোটকাকা বিমলাপ্রসাদ আমার বাড়িতে এক ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন দীর্ঘকায় কালো চেহারা, রোগা গড়ন, মাথায় টাক। বললেন 'চিন্তে পারছিস?' আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে ভদ্রলোক বললেন 'আমি সন্তুদা।' উনি ফিরে এলেন

আনা বৌদিকে ভাসিয়ে আবার প্রথম স্ত্রীর কাছে। এর বেশ কিছুকাল পরে সস্ত্রীক কোডাইক্যানালে গিয়ে আনা বৌদিকে খুঁজে বার করি। তখন সন্তুদা আর ইহজগতে নেই। আনা বৌদি দুই ছেলেকে নিয়ে ফার্মের দেখাশুনো করেন। পাহাড়ের ওপর ছোটখাটো একটি বাড়িতে থাকেন, সেখানেও দেখি একটা ঘরে কয়েক আলমারি বই। পড়বার লোক নেই।

লখনউয়ে ফেরত গেলাম ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে। কিছুদিন, বলা বাহুল্য মচ্ছি ভাত খাওয়া বাঙালির পেছনে লাগল আমার দেড়া বয়সী ছোঁড়ারা। সে বেশিদিন নয়। আমার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল একাধিক ভাষায় মুখ খারাপ করার। উর্দুটা সেই সঙ্গে যোগ হতে সময় লাগল না। পরবর্তীকালে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্টে এটি কাজে লেগেছে।

গভর্নমেন্ট জুবিলি কলেজে গিয়ে দেখি, একই প্রকার গানবাজনার আবহাওয়া। সুরেশগোপাল মাথুর সেই জগতের একজন কেউকেটা। সে ছিল পঙ্কজ মল্লিকের অন্ধ ভক্ত এবং এক বর্ণ বাংলা না জানা সত্ত্বেও কলকাতা রেডিও স্টেশন ধরত প্রতি রবিবার সকালে পঙ্কজবাবুর রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার আসর শোনার তাগাদায়। এ ছাড়া সে হস্টেলের কামরায় একটি ছোট ভাত রাঁধবার মাটির হাঁড়ি কিনে রেখেছিল। এ কালের রেডিও টিভির অ্যানাউন্‌সারদের মতো দুপুরে ঘুমিয়ে গলা ভারী করে হাঁড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে পঙ্কজ মল্লিকের গলার গভীরতার আমেজ আনার চেষ্টায় লেগে থাকত। কলেজে হাঁড়ি নিয়ে ঘোরাটা বিসদৃশ্য হবে বলে সোলা হ্যাটে মুখ দিয়ে 'পিয়া মিলনকি জানা', 'মদভরী রুত জওয়ানী' ইত্যাদি বিখ্যাত ফিল্মের গান শুনিয়ে কলেজ জীবনে এই ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর বছর কুড়ি পরে দেরাদুনে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন সে আর গান গায় না। সুপুরুষ সুবেশ ব্রিফলেস উকিল এবং একটি সচ্ছল অবস্থাপন্না বৃদ্ধা বিধবা মেমের উপপতি হিসেবে দেরাদুন ক্লাবে মোটা খরচা করছে। এত সব কিছু জানতাম না, রাজপিপলা না ওইরকম নামের কোনও একটি ছোটোখাটো নেটিভ স্টেটের ষাট বৎসর বয়স্কা এক রাজকুমারীর বাড়িতে যাতায়াত করার জন্য উপরোক্ত বৃদ্ধা মেম 'গো টু ইয়োর প্রিন্সেস, গেট আউট অফ মাই ব্লাডি লাইফ' ইত্যাদি নানারকম শপথবাক্য সহকারে প্রচণ্ড সিন করায় ক্লাব থেকে দুজনকেই বহিষ্কৃত করার হুমকি দেওয়া হয় এই রকম শুনেছিলাম।

এর পর আমার বন্ধুত্ব হলো মণি, সুকু, গাবু নামক একাধিক গোমতীপারের কলেজের ছোকরাদের সঙ্গে। গাবু দিব্য শিস দিয়ে খেয়াল গাইত আর তার দাদা সরোদ শিখতেন। এদের কাছে শিখলাম কানাকেষ্টর 'ফিরে চল ফিরে চল আপন ঘরে' মালকোষ রাগ, শচীন দেববর্মনের 'আমি ছিনু একা' পিলুতে গাওয়া হয়েছে, 'আলো ছায়া দোলা' বাহার রাগে দাদরা ইত্যাদি। এদের সঙ্গ না পেলে আমার

মতিগতির মোড় উচ্চাঙ্গসংগীতের দিকে ফিরত না।

তখন আমার বছর পনেরো বয়স, ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল দিচ্ছি। আমার প্রথম গুরু রবীন্দ্রলাল রায়ের 'রাগ নির্ণয়' নামক পুস্তকটি আমার হাতে এসে পড়ল। এটি বস্তুত বাংলায় ভাতখণ্ডে মেড ইজি। আশ্চর্য বিষয় এক এক দিনে তিন-চারটি রাগের সঙ্গে আমার পরিচয় হতে লাগল এবং নানা ধরনের গান গলা দিয়ে বের হতে লাগল, তার বাণী বলাবাহুল্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থহীন অথবা হাস্যকর, কিন্তু সে সব ছেলেমানুষি কম্পোজিশনের মধ্যেও একপ্রকার বাঁধুনি ছিল। অনেকে বলবেন এ সব পূর্বজন্মের সংস্কার। মন্টেসরি মেথডে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা বলবেন শিশুবয়সে অবচেতন মনের মধ্যে সেগুলি বাসা বেঁধেছিল, এ তারই বহিঃপ্রকাশ।

আমার পিতা ধূর্জটিপ্রসাদ সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদ্ হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বাঙালিরা তাঁকে চেনে সাহিত্যিক এবং সংগীতবিদ্ হিসেবে। কিন্তু একটি ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য হন। সেটি তাঁর একমাত্র সন্তান মানুষ করার ক্ষেত্রে। উদাহরণ : যখন আমার বছর ছয়েক বয়স তখন আমি গ্রীষ্মের ছুটিতে বায়না ধরলাম কলকাতার চিড়িয়াখানা দেখব বলে। আমার পিতা শুনে চোখ কপালে তুলে বললেন 'তুই কি বাচ্চা ছেলে চিড়িয়াখানা দেখতে যাবি বলে বায়না ধরেছিস? চ তোকে মিউজিয়াম দেখিয়ে আনি।' এই বলে উৎকৃষ্ট গান্ধার ও ভারহুত ভাস্কর্য শিল্পের নমুনা দেখিয়ে আমার কলাশিল্পের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করার উদ্যোগে মেতে গেলেন। মার কাছে শুনেছি দেড়-দু বছর বয়স থেকে চতুর্দিকে বিখ্যাত রেনেসাঁস পেন্টিং-এর ছবির বই আমার চারপাশে ছড়ানো থাকত। অষ্টপ্রহর কানের কাছে জোহরাবাই, হীরাবাই, মৌজুদ্দিন, ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম এবং সেই সঙ্গে সাহানা দেবী, কনক দাস ইত্যাদি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড বাজানো হত। এগুলির ছিটেফোঁটা বোধ হয় সত্যি সত্যিই অবচেতন মনের মধ্যে সেঁধিয়ে এক যুগ ধরে হাইবারনেট করছিল। এখন দ্রুতগতিতে মাথাচাড়া দিয়ে বের হতে লাগল। সেই সঙ্গে শুরু হলো লখনউয়ের ওস্তাদ মহলে যাতায়াত ও তাঁদের পা টেপা ও হুঁকো ভরার মাঝে মাঝে জোড়হস্তে তাঁদের শুধু গান শোনা নয়, ঠারে ঠোরে কিছু তালিম হাসিল করা। একজন মৌলানা আবদুর রহমান আখতার কিছুদিন গান শেখাতে এসেছিলেন কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তাঁর তুলনায় আমি সে বয়সেও মন্দ গাইতাম না। এর কিছুকাল পরেই কলেজ পেরিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে মৌলানা মহম্মদ হুসেনের সঙ্গে ভাব হলো। তার পরিচয় আমি আমার 'কুদ্‌রত্ রঙ্গিবিরঙ্গী'তে দিয়েছি। পরনে আচকান ও আলিগড়ি পাজামা, মাথায় মখমলের টুপি, সর্বক্ষণ ফুকফুক করে সিগারেট খাচ্ছে এবং সুর ভাঁজছে। অসম্ভব রগুড়ে লোক এবং শুদ্ধভাষায় ওই প্রকার রকম বেরকমের মুখখারাপ সেকালের লখনউয়েও শুনিনি। ঘরে তার দুখানা নেয়ারের

খাট, একটি ধূলি ধূসরিত তানপুরা, হারমোনিয়াম ও বাঁয়া-তবলা এবং টেবিলের ওপর খানকয়েক পাঁচ পয়সার 'পাসিংশো' সিগারেটের প্যাকেট। বই-খাতা-কলমের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। অফ পিরিয়ডে বিরাট খেলার মাঠ পেরিয়ে তার ঘরে পৌঁছলে শোনা যেত ধপাধপ তবলা ও বেসুরো গানের রেওয়াজ। এক ধরনের লোক আছে ভোরে উঠে ছোলা আদা খেয়ে ব্যায়াম করে, রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর হরলিকস, কমপ্লান খেয়ে শুতে যায় বছরের পর বছর, কিন্তু গায়ে-গত্তি লাগে না। মহম্মদ হুসেনের গান সম্পর্কেও সে কথা বলা যেত। কিন্তু চার বছরের লখনউয়ের ছাত্রজীবনে তার উৎসাহে কোনও ভাঁটা পড়তে দেখিনি। দুপুরে ক্লাস পালিয়ে গানবাজনা করার ও ফোকটে চা-সিগারেট খাওয়ার এটি প্রশস্ত জায়গা ছিল। এ ছাড়া আমার সংগীতজীবনের নিত্যসঙ্গী ছিল পি. এল. চিঞ্চোরে। সে আমার এক ক্লাস ওপরে পড়ত এবং আমার সঙ্গে যখন তার প্রথম আলাপ তখন সে সংগীতবিশারদ পাশ করে রতনজনকরের কাছে সংগীতনিপুণের শিক্ষানবিশি করছে। কলেজের লনে বসে এর গান শুনতে শুনতে বহু 'বইয়ের গান' আমার শেখা হয়ে গিয়েছিল চিঞ্চোরের দৌলতে।

এই মৌলানা মহম্মদ হুসেনের হিউয়েট হস্টেলের একতলা অপ্রশস্ত ঘরে রামপুরের বিখ্যাত উস্তাদ মুশ্‌তাক হুসেন খাঁর পুত্র ইশ্‌তিয়াক হুসেন, হুঁকো গড়গড়া তানপুরা নিয়ে মাসে দু বার রেডিও প্রোগ্রাম করতে এসে দিন কয়েক কাটিয়ে যেতেন। এইখানে কৌতূহলবশত ওস্তাদ একদিন আমার গান শুনতে চান। মনে আছে আলাপ করে বেহাগ গেয়েছিলাম, ভাতখণ্ডের বইয়ের গান 'বালমরে মোরে মনকে'। এও মনে আছে ওস্তাদ কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি হননি যে আমি কারও কাছে এ রাগের বা গানের প্রথাগত শিক্ষা পাইনি। ওঁর বক্তব্য সুরে লয়ে এই ষোলো-সতেরো বছরের ছোক্‌রাটা গাইছে, তান বোলবাট করছে গানের আস্থায়ীতেও কোনও ভুল নেই, এ কারো কাছে শেখেনি এ কি বিশ্বাসযোগ্য? এর পর সামান্য দক্ষিণা ও একথালা বাংগালি মিঠাই নিয়ে উনি আমার গাণ্ডা বাঁধেন। এঁর কাছে আমি পাই সাড়ে তিনটি মাত্র আস্থায়ী কিন্তু কিছু তানের ও বহ্‌লাওয়ার ফান্দা আমার এই বৃদ্ধ বয়সের আসা গায়কিতেও বর্তমান, যা থেকে গুণীরা গোয়ালিয়রের তালিমের ছিটেফোঁটার আন্দাজ এখনও পেয়ে থাকেন।

এই সব কাণ্ডকারখানার আভাস পেয়ে আমার পিতার টনক নড়ল। একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার এই প্রকার : 'দেখো বাছা, গান এবং লেখাপড়া ভালভাবে দুটো এক জীবনে হয় না, আমার জীবনেও হয়নি। ভাল করে ভেবে দেখো কোনটা করবে। আমার মত, গান বাদ দাও। আর সেরকমই যদি তোমার জেদ ও প্রতিভা থাকে তো তুমি আমার কথা শুনবে না, লেখাপড়া বাদ দিয়ে গানই করবে, সে আমি থাকতে হবে না।' সত্যিই হয়নি। আমার সংগীত জীবনের

কীর্তিকলাপ তা সে যেমনই হোক উনি জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেননি। মাঝখান থেকে ধার করা তানপুরা নিয়ে আমার গান গেল বাড়িতে বন্ধ হয়ে। নিজের প্রথম তানপুরা যখন এল, তখন বয়স তিরিশ ছুঁই ছুঁই। সে বয়সের রেওয়াজের সময় আমার গৃহিণী বছরখানেক নিয়মিত বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতেন। ওঁর স্বল্পকাল কৈশোরে আচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে শিক্ষা হয় এবং প্রতিভা ছাড়া গলায় সহজাত সুর খেলত কিন্তু আমার মতো জিদ ছিল না বলে এই লাইনে পাকাপাকি আসার কথা মনে স্থান দেননি। এলে আমার ধারণা ফল অতি উত্তম হত। অন্যদিকে ওঁর বন্ধুবান্ধবদের হৃদয়বিজয়ী রন্ধনপটুত্ব খর্ব হওয়ার সম্ভাবনাকেও বাদ দেওয়া যেত না।

উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর গান দ্বিতীয়বার শুনি এই বয়সে। তাঁর মেঘমল্লার পৃথক সময়ে ও পৃথক পরিবেশে শোনার আমার ও সৈয়দ মুজতবা আলির অসাধারণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা আমার 'কুদ্‌রত্‌'-এ পাবেন। প্রথমবার গান শুনেছিলাম মাত্র আট বছর বয়সে। তার ছোপ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল স্মৃতিপটে। এবার শুনলাম ইমন। সে কী কণ্ঠ! তার ওজস্বিতা, পাল্লাদার আওয়াজ আর সুর শুনে আধপাগল হওয়ার জোগাড়। সে এমন একটা বয়স যখন গান আমাকে পেয়ে বসেছে। রাস্তায় যেতে যেতে কোনও এক দ্বিতীয় শ্রেণীর গায়ক রেডিওয় গাইছে, ফুটপাথে এক ঠ্যাং লাগিয়ে সাইকেলের সিটে বসে আধঘণ্টা কেটে গেল, ক্লাসে আর ঢুকলাম না। এতদিন রেকর্ডে ও রেডিওয় ওঁর গলা শুনেছিলাম, সামনে বসে শুনে দেখি এ আওয়াজের সঙ্গে কিছুই মেলে না। এ আওয়াজ যেমন গম্ভীর তেমনই সুরেলা গোল আওয়াজ আর জোয়ারিদার। মনে হত পেটের মধ্যে জোড়া তানপুরা বাজছে। এর অব্যবহিত পরেই রাত জেগে ভোরবেলা কন্‌ফারেন্‌স শুনলাম ওঁর ললিত ও ভৈরবী। ততদিনে আমি ডায়াসের কোণে আরও আট দশজনের সঙ্গে বসার অনুমতি পেয়ে গেছি। সুরের দরিয়ায় তুফান আমি দেখেছি একজনেরই গানে, যেমন বিরাট সরোবরের প্রশান্ত গভীরতা পেয়েছি আবদুল করিম ও আমীর খাঁর কাছে।

একদিনের ঘটনা। তিন বছরের বি এ অনার্স কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষা। পিতার আদেশে অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে ঢুকতে হয়েছে সাহিত্য, সংস্কৃত ও ইতিহাসকে বেশ কিছুকালের মতো জলাঞ্জলি দিয়ে। সমাজতত্ত্ব এখনও আমার প্রিয়, তবে অর্থনীতি ও মার্কসিজ্‌মকে সশ্রদ্ধ বিদায় জানিয়েছি বহুকাল পূর্বে, যবে থেকে প্রথম চাকরি নেওয়ার পর ছড়ি হাতে ভোরবেলা ২টার সঙ্গে অফিসে থ্রিপিস্‌ সুট আমার অঙ্গে উঠেছে। এ সব দেখে কর্তা হতাশ হলেও কিছু উচ্চবাচ্য করেননি। মাতাঠাকুরানির দুঃখ ছিল এমন বংশে জন্মগ্রহণ করে একখানা বইও আমার হাত দিয়ে গলল না। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে স্বভাবসুলভ আলস্য কাটিয়ে এ

দুঃখ কিঞ্চিদধিক লাঘব করতে পেরেছিলাম, এর জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। কর্তা দেহ রাখার পর থেকেই আমার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ মনস্তাত্ত্বিকদের মতে একটি টেক্সট বুক কেস।

যে কথা বলছিলাম। আসন্ন পরীক্ষার জন্য রাত জেগে পড়তে পড়তে মাথা গরম হয়ে গেলে বাইরে হাঁটতে বেরিয়ে যেতাম। সে রাতেও বারোটা নাগাদ এক সহপাঠীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছি। চাঁদনি রাত। হোলি হয়ে গেছে দু-একদিন হলো। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ তখনও কাটেনি। ইউনিভার্সিটির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে বাবুগঞ্জ' এলাকায় এক হাভেলির সামনে শুনলাম তেতলা থেকে মার্জিত পুরুষকণ্ঠের গান ভেসে আসছে। রাগ দরবারি। আধো অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে একটি ছোটখাটো হল ঘরে পৌঁছলাম। জনা কুড়ি-পঁচিশ শ্রোতা বসে। গায়কের অঙ্গে সাদা আঙরাখা, মাথায় দোপল্লি চিকনের কাজ করা টুপি, গাইছেন দরবারি কানাড়ায় মধ্যলয়ের গান। প্রথম লাইনটি এখনও মনে আছে, 'আবির গুলাল লাল লাল পড়ত রঙ্গকে ফুয়ার।' পরিবেশ আমাদের উচ্চাঙ্গ সংগীতের গায়কের ওপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে আমাদের আধুনিক শ্রোতারা আন্দাজ করতে পারবেন না। আসল ব্যাপার হলো আবহাওয়া ও মেজাজ যার সঙ্গে ভাল শ্রোতাদেরও মিশে যাওয়ার ক্ষমতা থাকে। দরবারি অনেকের কাছে শুনেছি— আমীর খাঁ, বড়ে গোলাম আলি ও স্বয়ং ফৈয়াজ খাঁর কাছে। কিন্তু একজন নামীদামি পাকা গাইয়ে নন, সেই রাত্রে তাঁর দরবারি মনে অসাধারণ রেখাপাত করেছিল। ইলেকট্রিক আলো থাকা সত্ত্বেও জ্বালা হয়নি। বড় বড় স্ট্যাণ্ডের ওপর ডোমের মধ্যে তেলের বাতি, দেয়ালে নড়ছে আমাদের ছায়া, মস্ত আয়নায় দেখতে পাচ্ছি জনা পঁচিশেক সমঝদার শ্রোতা, শুভ্র বস্ত্র পরিহিত মাথায় দোপল্লি টুপি এক আধাবৃদ্ধ গায়কের কণ্ঠে দরবারির গান্ধারের আকুতি, নেত্রকোণে আবিরের আভাস, এখনও চোখ বুজলে মুহূর্তের মধ্যে পুরো ছবিটা ভেসে ওঠে। সে আজ থেকে ছাপ্পান্ন বছর আগের এক রাত্রের আসর।

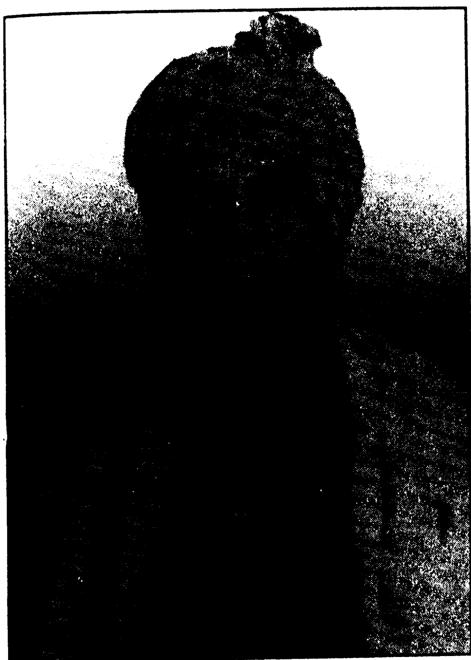
ভজন দিয়ে গান শেষ হলো। গৃহস্বামীর কাছে মাফ চাইলাম অনাহুত প্রবেশের জন্য। ভদ্রলোকের চেহারা পাকা আমটির মতো। পরনে ধপধপে গিলে করা পাঞ্জাবি ও মিলের ধুতি, ছোটখাটো মানুষ, টাকের সঙ্গে মানানসই হালকা সাদা গোঁফ। যথারীতি লখনউয়ের জবানে সৌজন্য প্রদর্শন করে বললেন, আমাদের মতো সমঝদারের আগমনে আসরে চার চাঁদের আবির্ভাব হলো। এ তো তাঁর বদকিসমৎ, আমাদের পায়ের ধুলো তাঁর গরিবখানায় ইতিপূর্বে পড়েনি ইত্যাদি।

উপস্থিত শ্রোতাদের রব উঠল বাঁকেবিহারীরবাবুর ভৈরবী ঠুংরি দিয়ে আসর শেষ হবে। কে এই বাঁকেবিহারী? দেখি স্বয়ং গৃহস্বামী সলজ্জবদনে আমাদের সকলের কাছে ইজাজৎ চাইছেন, সেই সঙ্গে মাফি, এই বৃদ্ধবয়সে টুটাফুটা গানা

শোনাবার জন্য।

গান শুরু হলো। তিন তাল বাজছে খুব দ্রুতগতিতে নয়। মধ্যলয় তাকে বলা যায়, যে লয়ে বিস্তারের শেষে গায়করা ছোট খেয়াল শুরু করেন। গাইছেন অবশ্য খেয়াল নয় ঠুংরি, লখনউয়ের বোলবাটের ঠুংরি যার আসল মজ্জা পাওয়া যেত বাইজিদের বোলবানানোর সঙ্গে সঙ্গে ভাও বাতলানোর মধ্যে। উনি গাইছেন একটি লাইন। 'সকল বৃজ ধূম' তারপর নানানভাবে পদটি পূরণ করছেন 'মচি হ্যায়' গেয়ে শুধু আটটি মাত্রার মধ্যে। কণ্ঠ কিছু অসাধারণ নয়, নরম গলা তার বৈশিষ্ট্য নমনীয়তা যা ঠুংরির পক্ষে উপযোগী। কতরকম ভাবে যে 'মচি হ্যায়' বলা যায়, কখনও ছোট ছোট মিড় দিয়ে, কখনও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র টপ্পার কাজ দিয়ে, কখনও বাট করে পদটিকে ভেঙে ভেঙে—এ সব তখন আমার কল্পনার বাইরে। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, বুঝতে পারছি রেয়াজ নেই, এক-আধ জায়গায় গলা সুর থেকে হঠেও যাচ্ছে কিন্তু সে গানে কী মজা! পরবর্তীকালে ফৈয়াজ খাঁর গানে বিশেষত ছোট খেয়ালে এই বোল বানানোর মজা পেয়েছি, কাওয়ালিতে পেয়েছি, গাইতেও শিখেছি। কিন্তু কালকাবিন্দার ঘরের লখনউ ঠুংরি যা কথ্থক নাচের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হলো সে রাত্রে।

বাঁকেবিহারীবাবুর বাড়ি আমি ঘন ঘন যেতে লাগলাম পরীক্ষার পরেই। বাপের বয়সী মানুষ এমন অনায়াসে সতেরো-আঠারো বছর বয়সের এঁচোড়ে পাকা ছেলেদের সঙ্গে সমানে সমানে বন্ধুত্ব করে আড্ডা দিতে পারার ক্ষমতা রাখতেন এ আর পূর্বে ও পরে দেখিনি। বড়লোকের ছেলে, খুব একটা লেখাপড়া শেখেননি, শের শায়রি গানবাজনা, ওস্তাদ বাইজিসঙ্গ করে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পৌঁছেছেন। এককালে খুবই অবস্থাপন্ন ছিলেন, এখন কলসির জল ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু দরাজ হাত খাটো হয়নি। এঁর কাছে বিদ্যাধরী, রাজেশ্বরী, হুসনাজান, অচ্ছনবাই, জদ্দনবাই, আখতারী ইত্যাদি অনেকের কথা শুনেছি। ওঁর বড় দুঃখ ছিল ওঁর বিয়েতে গওহরজান আসতে পারেননি, তবে ওঁর বড় মামাতো ভাইয়ের বিয়ের জমঘটে প্রধান আর্টিস্ট ছিলেন গওহর। আর তার রূপ ও ছলাকলার বর্ণনা দেবার সময় ওঁর লখনউয়ের কাব্যময় সলীস্ বিশুদ্ধ উর্দুও কুলিয়ে উঠতে পারত না। বেশ কিছু গল্প ছিল কাঁচাপাকা এবং সব সময়ে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হত না। কিন্তু বলার গুণে তা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পর্যায়ে উঠে যেত। পুরনো লখনউয়ের লোকেরা পূরব বলতে জৌনপুর, মির্জাপুর, কাশী বুঝত। কাশীর গঙ্গা পার হয়ে এক-আধজন অ্যাডভেঞ্চারাস সংগীতপ্রেমী গয়া পর্যন্ত হয়তো গেছেন কিন্তু কলকাতা তাঁদের কাছে সেকালে প্রায় লণ্ডন যাওয়ার শামিল ছিল। উনি নাকি যৌবনে একবার গিয়েছিলেন এবং গওহরজানের কলুটোলার বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। গওহর তখন কলকাতার বাইরে মুজরো করতে



উস্তাদ মুশতাক হুসেন খাঁ।



উস্তাদ বদল খাঁ।



সোয়াই গন্ধর্ব।



বিষ্ণু দিগম্বর পালুসকর।

গিয়েছিলেন। গওহরহীন কলকাতাকে শওহরহীন অর্থাৎ পতিহীনা রূপবতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনা করতে উনি দু ছত্র উর্দু 'শের' লিখে নাকি ওঁর বাড়িতে রেখে আসেন। তখনও ওঁদের অওধের বর্ধিষ্ণু তালুকদার হিসেবে নাম ছিল। উত্তরে গওহর প্রচুর আফশোস জানিয়ে চিঠি দেয় এবং শতকোটি প্রণাম (সেলাম নয়) জানিয়ে চিঠি লিখে, সই করেছিল বাঁদি গওহরজান বলে।

গওহরজানের ছেলেপুলে হয়নি। বড় সাধ একটি সন্তান হোক, যার জন্য গওহর মঞ্জিল, জেবরাত, গয়নাগাঁটি দু-দশখানা কোম্পানির কাগজ রেখে যাবেন। জ্যোতিষী হাত দেখে বলেছিল, কোনও মুসলমান ব্যায়ামবীরের সঙ্গে আশনাই হলে সন্তান সম্ভাবনা হতে পারে। সেকালের নামকরা গুলাম পহলওয়ান শোনা যায় সরোদ বাজিয়ে কওকব খাঁর (বাঙালিরা যাকে চিরকাল কুকুভ খাঁ বলে এসেছে) বড় ভাই প্রখ্যাত কেরামতুল্লা খাঁর সঙ্গে ইয়োরোপ গিয়েছিল। মোতিলাল নেহরু নাকি নিয়ে গিয়েছিলেন খরচাপাতি দিয়ে। এহেন গুলাম পালোয়ানের কাছে সেজেগুজে বাঁকেবিহারীবাবুর ভাষায় 'ষোলে সিঙ্গার' করে গিয়েছিলেন গওহরজান। যতই রূপ থাকুক গওহরের তখন যৌবন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, সম্ভবত সন্তানধারণের ক্ষমতাও নেই। ওঁর প্রস্তাব শুনে 'গুলাম পহলওয়ান বড়ে হঁসে, বোলে এক সিধাসা আসান তরিকা হ্যায়', অত কষ্ট করবেন কেন বিবিজান, ন মাস গর্ভধারণের। আপনার শারীরিক যন্ত্রণা আছে, মুজরারও ক্ষতি হবে, এত সুন্দর চেহারাও টসকে যাবে, তার চেয়ে অনেক ভাল হবে আপনি আমায় পুষ্যি নিয়ে নিন, হমে গোদ লে লিজিয়ে।' গওহর নাকি জীবনে এরকম অপমানিত হননি।

বাঁকেবিহারীবাবু কাছে প্রথম ইদনবাইয়ের নাম শুনি। পরে এঁর সম্পর্কে অন্য উস্তাদদের মুখে অসাধারণ তানকারির ক্ষমতার রকম বেরকম গল্প শুনেছি। পাতিয়ালা ঘরানার আলি বখ্‌শ খাঁ ও ফতে আলি খাঁর (আলিয়া ফত্তু) কাহিনী 'কুদ্‌রত্‌ রঙ্গিবিরঙ্গী'র পাঠকদের আশা করি মনে আছে। এঁদেরই জয়পুরের পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ আয়না দেখিয়ে বলেছিলেন, 'বাছারা তোমরা মেহনত করেছ গলা ঘোরানোর পেছনে, তার অর্ধেক যদি সুরের সাচ্চাই ও রাগদারির ওপর খরচ করতে তো ভগবান জানেন তোমরা কোথায় পৌঁছ যেতে।' অতএব পাঁচজনের পরামর্শে এই জোড়া উস্তাদ দিল্লির তানরস খাঁর কাছে গাণ্ডাবন্ধন করিয়ে জাতে ওঠেন। দিল্লি ঘরানার শেষ প্রসিদ্ধ উস্তাদের তালিমে এঁদের গানে কিঞ্চিৎ ঠাহরান এল এবং আস্থায়ী অন্তরা ভরার কায়দাও রীতিবদ্ধ হলো। তখন গোয়ালিয়রের উস্তাদ হদ্দু খাঁর প্রচণ্ড নামডাক। এই ঘরানারই উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ, আর তাঁরই পুত্র মুনব্বর আলির কাছে শুনেছি, এঁরা হদ্দু খাঁর কাছেও তালিম পেয়েছিলেন এবং পরে নাকি বড়ে মুবারক আলি খাঁর কাছে। জয়পুর ঘরানার জনক নিবৃত্তিবুয়া, কেসরবাই, মোঘুবাইর গুরু মন্‌জি ও ভুর্জি খাঁর পিতা ও

মল্লিকার্জুন মনসুরের দাদা গুরু প্রবাদপ্রতিম উস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ যৌবনে উপরোক্ত বড়ে মুবারক আলি খাঁর দ্বারা প্রচণ্ড প্রভাবিত হন এবং তাঁর আত্মজীবনীতে (সম্প্রতি অম্লান দাশগুপ্তর দ্বারা ইংরাজিতে অনূদিত ও প্রকাশিত) বলেছেন, তাঁর জ্ঞানে বড়ে মুবারক আলির মতো তানাইয়াৎ উনি দেখেননি।

ফতে আলি খাঁ সুরের কাজকর্মর দিকে বেশি নজর দিতেন আর আলি বখশের নামডাক ছিল তানকারির জন্য। এঁরা হার মেনেছিলেন আবদুল করিম ও ভাই আবদুল হকের কাছে বরোদার মহারাজার দরবারের জনসভায়—সে কাহিনীও আমি ইতিপূর্বে লিখেছি।

যখন টঙ্কের দরবারে ফতে আলি সভাগায়ক তখন বড়ে গুলাম আলির গুরু ও চাচা কালে খাঁ তাঁর কাছে তালিম নেন। কালে খাঁকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন আমার পিতৃবন্ধু অমিয়নাথ সান্যাল তাঁর 'স্মৃতির অতলে' পুস্তকে। এঁর কণ্ঠ ছিল জোরালো শাঁখের আওয়াজের মতো কিন্তু স্বরপ্রয়োগে তীক্ষ্ণতা ছিল না যা তাঁর সুবিখ্যাত ভাইপোর আওয়াজেও লক্ষণীয়। কালে খাঁর তানের মধ্যে গোয়ালিয়রের ভারী তান ও দুনি স্পষ্ট তান বড়ে গুলাম আলি খাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এ সবই নাকি আলিয়াফত্তু দেন, তাঁদের মেহেরবানি।

ফতে আলি খাঁ টঙ্ক থেকে যান জম্মুর রাজদরবারে। ওঁর পর ওই রাজদরবারে স্থান নেন বড়ে গুলাম আলি খাঁর পিতা আলি বখ্শ। এঁর নামও আলি বখ্শ তবে গানের চেয়ে এঁর নাম হয়েছিল দিলরুবা বাজানোয়। কর্তারা বলতেন অসাধারণ বেমিসাল হাত ছিল এঁর দিলরুবার। ১৯২৫-এর লখনউ-এ গ্রান্ড কন্‌ফারেন্‌সে ইনি দিলরুবা বাজাননি, গান করেছিলেন।

ফতে আলি খাঁ যখন জম্মুতে তখন ইদনবাই পৌঁছন মুজরো করতে। তাঁর তান শুনে সকলের চক্ষুস্থির। প্রথমে রাত্রে ইদনবাইয়ের গানের পর ফতে আলি খাঁর গান জমল না। সে কালে দঙ্গল অর্থাৎ গানের আসরে লড়াই বাধিয়ে আহ্লাদ করার মতো লোকের অভাব ছিল না। জম্মু দরবারেও নয়। এঁরা দু পক্ষকেই উসকাতে লাগলেন। ইদনবাই তৈরি। ফতে আলি গোড়ায় তবায়েফের সঙ্গে এক আসনে বসে গাইলে মান ইজ্জৎ নষ্ট হবে বলে টালবাহানা করছিলেন কিন্তু মহারাজের ইচ্ছায় শেষ অবধি ওঁকে রাজি হতে হলো। ওঁর শাকরেদ ভক্তরা নিশ্চিত ইদনের আর লড়তে হবে না খাঁ সাহেবের সঙ্গে, বিশেষ করে চড়া সুরে পুরুষালি স্কেলে গাইতে হবে যখন। খাওয়াদাওয়ার পর আসর। পাঠক আশ্চর্য হবেন না, পাতিয়ালা ঘরানার গায়করা কেউ খালি পেটে গান করতে পারেন না। নাটোরের রাজবাড়িতে কালে খাঁ দিস্তে দুয়েক লুচি ও আধ সের রাবড়ি সাঁটিয়ে গান করতে বসেছিলেন। বড়ে গোলাম আলি খাঁও যৌবনে গোটা দুয়েক মুরগির কম নাশ্‌তা করতেন না জলসার আগে। যা হোক, গোড়ায় সাব্যস্ত হলো মালকোষ রাগ

দিয়ে শুরু হবে আসর। খাঁ সাহেবের খাদের মধ্যমকে ষড়জ করে ইদনজান গাইবেন।

সুরের কাজে ও গোয়ালিয়রি বহ্‌লাওয়ায় ফতে আলি প্রচুর বাহবা কুড়োলেন। ইদনবাইও খুব একটা পেছনে পড়ে নেই। তারপর শুরু হলো তানের খেলা। ইনি তিন সপ্তকের তান মারেন তো উনিও তৎক্ষণাৎ তিন সপ্তক ঘুরে আসেন আরও স্পিডে, দানা মনে হয় আরও সাফ। ফতে আলি গমকের তান নিতে লাগলেন, ইদনবাইয়ের জবাব অসম্ভব পেঁচালো দ্রুত টপ্পার তান দিয়ে। বেগতিক দেখে খাঁ সাহেব অনৈতিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন বসন্ত রাগ ধরে এই আশায় যে, উত্তরাঙ্গের রাগ ওই একই স্কেল ধরে উচ্চমার্গে কোথায় লড়ালড়ি করবে এই তবায়েফ? কিন্তু ততক্ষণে ইদনবাইয়ের গলা গরম হয়ে গেছে, কণ্ঠে তার বিজলি খেলছে আর দু জন সারেঙ্গিয়ার মধ্যে একজন জবাব দিয়ে দিয়েছে, অন্যজন শুধু সুর ধরে। কারও বুঝতে বাকি রইল না কার জিত হলো এ আসরে।

মশকুর আলির বাবা শকুর খাঁ নাম করা সারেঙ্গিয়া এবং কিরানা ঘরানার প্রসিদ্ধ উস্তাদ বহীদ খাঁ (আমির খাঁর মানসগুরু) এঁর কাকা। ইনি বহু প্রসিদ্ধ উস্তাদের সঙ্গে বাজিয়েছেন এবং গানও মন্দ গাইতেন না। এঁর বক্তব্য, কোনো তবায়েফ বাইজির মুখে এরকম তৈরি সেকালেও কেউ শোনেনি। বয়সকালের রোশনারা বেগম হয়তো ইদনজানের পাশে বসতে পারতেন। হয়তো!

সে যাক, লোক মারফত পাতিয়ালায় ঝটিতি বার্তা গেল জম্মুর সভাগায়কের। অর্থাৎ কাপ্তান ফতে আলি খবর পাঠালেন জার্নাইল আলি বখ্‌শের কাছে, এখানে এক কাঞ্জরি (পাঞ্জাবী ভাষায় পেতি বাইজি বেশ্যা) এসে মহা হাঙ্গামা শুরু করেছে।' জার্নাইল কাপ্তান নামেই এঁরা সংগীত জগতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ফতে আলি আবার কাপ্তান নাম দিয়ে গান রচনা করতেন যার মধ্যে অড়ানা রাগে চিন্ময় লাহিড়ি 'তান কাপ্তান' গানটি আমাদের যৌবনে প্রায়ই শোনাতেন। তবলা নওয়াজ স্বর্গত আল্লারখ্‌খা খাঁও খুব ভাল গাইতেন এঁদের রচিত তানপ্রধান বন্দিশগুলি। অতএব জার্নাইল যেন পত্রপাঠ এসে এই কাঞ্জরির পিতৃনাম ভোলাবার বন্দোবস্ত করেন। অবশ্য পিতৃনাম যদি ইদনের বা ইদনের মাতৃদেবীর জানা থাকে।

এই পর্যন্ত পৌঁছে বাঁকেবিহারী চুপ করে গেলেন। প্রশ্ন করলাম : 'তারপর কী হলো, বলুন?'

'সবিশদ বলতে পারব না, তবে ওঁরা আর একত্র বসেননি। প্রথমে ইদনবাইয়ের গান হলো, ধুঁয়াধার গানা। পরে আলিয়া ফত্তুর যুগলবন্দি। মোটামুটি বলা যায় ড্রন ম্যাচ। তবে কারও কারও মতে পাঞ্জাবীদের তানবাজি যতই তৈয়ার হোক না কেন, শুনতে ততটা সুশ্রাব্য লাগে না। আর আমরা লখনউয়ের লোক, আমরা তানবাজির মজা নিতে অপারগ। গানেমে সুরকা লাগাও, বোলকা মজা, রুহানী গানা যবতক না হো তো ভই, হমারে দিলকো, ছুতা নহী। 'রুহ' মানে আত্মা

বা ইংরেজিতে 'সোল'। এক কথায় অন্তর থেকে যে গান বেরোয় সেই বঙ্কিমবিহারী চাচার মনে ধরে। শুধু তৈয়ারি? রামচন্দ্র! আর পাঞ্জাবীদের সম্পর্কে পুরাতন লখনউবাসীদের মতামত খুব সুশ্রাব্য ছিল না সেকালে। দিল্লিওয়ালাদেরই বর্বর জ্ঞান করতেন, ওঁরা, তো পাঞ্জাবী!

পাঞ্জাবীরা এই পাতিয়ালা ঘরানার দুই পালোয়ান কালোয়াতি গাইয়েকে দেবতা জ্ঞান করতেন কিন্তু আমি তো যেখানেই দেখি সেখানেই এঁদের পরাজয় ঘটেছে। আবদুল করিম ও ভাই আবদুল হকের সঙ্গে লড়াইয়ে কিভাবে বেইজ্জৎ হয়েছিলেন সে খবর আমার 'কুদ্‌রত্ রঙ্গিবিরঙ্গী'র কিরানা ঘরানা পরিচ্ছেদে পাবেন। ইদনবাইয়ের আসরের কাহিনী তো শুনলেন। জয়পুর ঘরানার প্রবর্তক উস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ আবার নাতির কাছে যে স্মৃতিচারণ করেছিলেন সেই ডায়েরিতে ওঁর বাল্যবয়সে শোনা আলিয়া ফত্তুর গানের কথা উল্লেখ করেছেন। ওঁর পিতৃপুরুষের ভিটে যে আতরৌলি নামক গ্রামে তা আলিগড় শহরের থেকে বেশি দূরে নয়। কাকা চিম্মন খাঁর সঙ্গে আলিগড়ের এক সরাইখানায় উঠেছিলেন সেইখানে আলি বখ্‌শ ও ফতে আলিও ডেরা গেড়েছিলেন। আবার অন্য এক ঘরে ছিলেন আল্লাদিয়ার কাকা চিম্মন খাঁর বন্ধু রহমৎ খাঁ সিকান্দ্রাবাদওয়ালে আর তাঁর দুই ছেলে কুদরৎউল্লা ও আজমতুল্লা। সকালে উঠে আল্লাদিয়া খাঁ শুনলেন আলিয়া ফত্তু পাশের ঘরে তেড়ে রেয়াজ করছেন তানের পর তান। বেশ কিছু লোকজনও জড়ো হয়েছে। চিম্মন খাঁ রহমৎ খাঁ ঘরে বসে গল্প করছিলেন। বললেন 'লোকমুখে শুনছি আপনার এ দুই সন্তান সেকেন্দ্রাবাদ ঘরানার মুখোজ্জ্বল করবে, এদের কিরকম তালিম দিয়েছেন শোনবার খুবই ইচ্ছে করছে।' কুদরৎ ও আজমৎ-এর গান সম্পর্কে আল্লাদিয়া খাঁ বলেছেন এদের গায়কি এমনই জোরকস ও প্রভাবশালী ছিল যে ধীরে ধীরে আলিয়া ফত্তুর ঘর থেকে শ্রোতারা রহমৎ খাঁর ঘরে এসে জড়ো হলো। শেষে আলিয়া ফত্তুও এসে হাজির হলেন এবং কিছুক্ষণ ওই দুই ভাইয়ের গান শুনে সেইদিনই ডেরাডাণ্ডা তুলে সরাইখানা পরিত্যাগ করেন। ফতে আলির বাবা সারেঙ্গিয়া মিয়া কালু স্থির করলেন এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে একই আসরে গেয়ে বদনাম কুড়োনোর চেয়ে পরের ট্রেন ধরে অন্য কোনো মুলুকে গমন করাই বিধেয়। উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর পিতৃপুরুষরাও এই সেকেন্দ্রাবাদ ঘরানার গায়ক এবং এই সেকেন্দ্রাবাদ আগ্রা জেলার অন্তর্গত, দক্ষিণের সেকেন্দ্রাবাদ নয়।

বহুযুগ পরে মশকুর আলির কাছে ওই ইদনবাইয়ের আসরের কাহিনীর সমর্থন পেয়েছি। সেও তার বাপ-দাদার কাছে শোনা। সে বলল 'বিলকুল সহী কিস্‌সা হ্যায় ইয়ে', ইদনবাই সুরটওয়ালি এ অঞ্চলে কখনও আসেনি কিন্তু তার তৈয়ারির গল্প আমি ছেলেবেলায় বুজুর্গদের মুখে শুনেছি। তাঁর সঙ্গে একজন সারেঙ্গিয়াই

সঙ্গৎ করতে পারত, সে হলো মির্‌চ খাঁ। তার আসল নাম কেউ জানত না কিন্তু হাতে তার মির্চার মতো তেজ ছিল তাই নাম তার মির্‌চ খাঁ। সে কোনও গর্হিত অপরাধের জন্য এক রিয়াসতে জেলবন্দি হয়ে যায়। সেই রিয়াসতের রাজা সাহেবের কাছ থেকে ইদনবাইয়ের কাছে মুজরার দাওৎ আসে। ইদন গানের পূর্বে হাতজোড় করে রাজা সাহেবের কাছে আর্জি পেশ করেন মির্‌চ খাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। সে আর্জি রাজা কানেই তুললেন না। তখন ইদনবাই প্রশ্ন করলেন, 'সরকার। ফির মেরে সাথ বজায়গা কৌন?' রাজা সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কেন আমার রাজ্যে আপনার সঙ্গে সঙ্গৎ করবার মতো সারেঙ্গিয়া নেই?' ইদনবাই বললেন, 'হুজুর ঠুংরি দাদরায় এঁরা সাথ দিতে পারবেন কিন্তু খেয়াল টপ্পা ইত্যাদিতে হিন্দুস্থানে একজনই আছে যে আপনার এই বাঁদির সঙ্গে সাথ সঙ্গৎ করতে পারে, সে মির্‌চ খাঁ।' রাজা সাহেব বললেন, 'উসকো ছোড় নহী সকতে হেঁ, হারগিজ নহী। তবে তুমি গান শুরু করো, যদি ভাল সাথ সঙ্গৎ না হয় বিবেচনা করে দেখব।'

এই পর্যন্ত বলে মশকুর আলি বলল, 'স্বয়ং জার্নাইল আলি বখ্‌শ খাঁ দিল্লির চাঁদ খাঁকে বলেন এবং চাঁদ খাঁ তাঁর বইয়েতেও লিখেছেন, ওঁর সময়ে তিন বিখ্যাত সারেঙ্গিয়া ছিলেন। মির্‌চ খাঁ সর্বাগ্রে, বদল খাঁ সোনপতওয়ালে, এবং হায়দর বখ্‌শ ফরিশতেওয়ালে (বহীদ খাঁ ও রজব আলি খাঁর উস্তাদ কিরানেওয়ালে হায়দর বখ্‌শ খাঁ নন), ইনি রামপুরের নবাব কলবে আলি খাঁর দরবারে মুলাজিম্ ছিলেন।'

বললাম, 'বল কি মশকুর? নবাব কলবে আলি খাঁ তো আমাদের বাংলার প্রাক্তন গভর্নর নুরুল হাসানের শ্বশুরের ঠাকুরদা। সে তো বহুকাল আগের কথা। আর চাঁদ খাঁ তো সে দিন অবধি বেঁচে ছিলেন। খুব একটা বৃদ্ধ বলে তো মনে হত না তাঁকে দেখলে।'

'কুমার আঙ্কল্', মশকুর বলল 'আলি বখ্‌শ খাঁ, হদ্দু খাঁ ও তানরস খাঁর শাগীর্দ আর উনবিংশ শতাব্দীর থার্ড কোয়ার্টারের লোক। ওঁর সঙ্গে লড়েছেন দাদা আবদুল করিম খাঁ এবং তাঁর ভাই আবদুল হক্ খাঁ বরোদার দঙ্গলে, তখন করিম খাঁ সাহেব ছোক্‌রা। বেঁচেছিলেন জার্নাইল সাব বহু বছর, নব্বই ভালভাবে পার করে গেছেন।'

'বদল খাঁর কথা বললে, ইনি কোন্ বদল খাঁ? আমাদের কলকাতার বদল খাঁ নন তো যিনি ভীষ্মদেব চ্যাটার্জির গুরু এবং একশ দশ বছর বয়সে কলকাতায় দেহ রেখেছেন? অনেকেই ওঁর কাছে চিজ নিতে যেতেন, অমিয় সান্যাল, নগেন দত্ত, শচীন মোতিলাল ইত্যাদিরা। আগে টিকের ডগায় একটি আফিমের গুলি রেখে ওঁকে শোঁকানো হত, তারপর এক চোখ খুলে উনি চিঁচিঁ করে তালিম দিতেন, শাগীর্দরা কান পেতে শুনে তুলত। এইরকমই ডাঃ বিমল রায়ের কাছে শোনা।'

'বিলকুল, ওহী বদল খাঁ সাব হ্যাঁয়। উনিও সে যুগের লোক। ফৈয়াজ খাঁর নানা

উস্তাদ গুলাম আব্বাস খাঁর সঙ্গে বাজিয়েছেন, দরস পিয়া মেহবুব খাঁর সঙ্গে, ভাস্কর বুয়ার গুরু নথ্থন খাঁর সঙ্গে তবে আগ্রার লোক নন, উনি আসলে হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রর পরেই আম্বালা যাওয়ার পথে পড়ে সোনিপত, সেখানকার লোক।'

'সে যাক্, তোমার ইদনবাইয়ের কিসস্য জুড়িয়ে যাচ্ছে। কী হলো তারপর?'

'হলো এই, রাজা সাহেবের প্রসিদ্ধ সারেঙ্গিয়ারা দু-চার তানেই কাত। অবশেষে দ্বিতীয় সন্ধ্যায় মির্চ খাঁকে খালাস করে চুল দাড়ি লম্বা লম্বা নখ ছাঁটিয়ে দরবারে আনা হলো। মির্চ খাঁর মতো তৈয়ার সারেঙ্গিয়া ভূভারতে নেই। তার সঙ্গৎ শুনে তার কয়েদ মকুব শুধু নয়, তিনি পাঁচ হাজার টাকা ইনাম পেলেন আর ইদনবাইয়ের জয়জয়কার।'

বেলা আড়াইটে। খাবার সময় হয়ে গেছে। সভা ভঙ্গ হব হব। কথায় কথায় আমি দিলীপচন্দ্র বেদীর মন্তব্য উদ্ধৃতি দিয়ে বলি, 'আবদুল করিম খাঁ উস্তাদ হদ্দু খাঁর ছেলে রহমৎ খাঁর স্বরপ্রয়োগ এমনকি গলার আওয়াজও নকল করতেন কিন্তু রহমৎ খাঁ কা এক ভি তান উসকে গলেসে নহী নিকলা, বহ্ নিকালা ভাস্কর বুয়ানে।' ওঁর এই মন্তব্য তোমাদের অর্থাৎ কিরানা খানদানের লোকজনের খারাপ লেগেছে শুনলাম, কিন্তু আমি নাচার। এটি বেদীজির মন্তব্য, আমার নয়, আর উনি আবদুল করিম খাঁকে শুনেছেন প্রচুর, আর তালিম পেয়েছেন প্রথমে ভাস্কর বুয়া ও পরে ফৈয়াজ খাঁর কাছে। আর কথাটা হয়তো অতিরঞ্জিত নয়। রহমত খাঁর 'যমুনা কী তীর' ভৈরবীর রেকর্ড আবদুল করিমের ওই 'যমুনা কী তীর' রেকর্ডের পাশাপাশি শুনলে বেদীজির প্রথম অংশের যথাযথ ঔচিত্য বুঝতে অসুবিধা হবে না। আমি 'কুদ্‌রত্ রঙ্গিবিরঙ্গী'তে যখন ভাস্কর বুয়ার বিশদ পরিচয় করিয়ে দি তখন অনেক সংগীতপিপাসু পাঠক আমায় জানিয়েছিলেন তারা জীবনে এই ব্যক্তির নামও শোনেননি, আর যাঁরা শুনেছেন তারা জানেন না ভাস্কর বুয়া বাখ্‌লে অত বড় গাইয়ে ছিলেন। হালে মারাঠিতে গোবিন্দরাও টেম্বের বই ছাড়া আর একটি প্রামাণ্য বই বেরিয়েছে ভাস্কর বুয়ার ওপর মারাঠিতে। লেখিকা শৈলা দাতার বিশ বছর ধরে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বহু লোকের সাক্ষাৎকার নিয়ে এই 'দেবগন্ধর্ব' নামক পুস্তকটি লিখেছেন। এর থেকে গোটা দুই ঘটনার উল্লেখ করছি।

১৯০৮ সালের কথা। ধারবাড় শহরে তখন আবদুল করিম ও ভাস্কর বুয়া দুজনেই প্রোগ্রাম করতে গেছেন। যথারীতি তাঁদের শাকরেদরা কে বড় কে ছোট তর্কবিতর্কে আসর সরগরম করছেন। উদ্দেশ্য এক আসরে দুজনকে বসিয়ে গাওয়ানো। আবদুল ও ভাস্কর বাখ্‌লে কেউই এ সব খেয়োখেয়ির প্রশ্রয় দিতেন না। শুধু তাই নয় পরস্পর পরস্পরের জলসায় উপস্থিত থেকে পরমানন্দে গান শুনলেন। ভাস্কর বুয়াকে আবদুল করিম খাঁ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় উনি বলেন 'উনি গন্ধর্ব, সুরের দেবতা। এ যাবৎকাল কোনও গায়ক এভাবে সুরের মধ্যে

গভীরভাবে মজে যেতে পারেনি যেমনটি করিম খাঁ পেরেছেন।' করিম খাঁকে ভাস্কর বুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করায় উনি বলেন, 'ভাস্কর রাও শুধু যে হিন্দুদের মধ্যে সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ গায়ক সে কথা বললে যথেষ্ট বলা হয় না, হদ্দু হস্‌সু খাঁর সময় থেকে যত খেয়ালিয়া জন্মেছেন তার মধ্যে উনি অন্যতম, গিনে চুনে, আঙুলে গোনা যায় এমন দু-চারজনের সঙ্গে ওঁর তুলনা করা যেতে পারে।'

স্বয়ং রহমৎ খাঁ ১৯২১ সালে কোল্‌হাপুরে ভাস্কর বুয়ার গান শুনে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন এবং সকলের সামনে সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন, 'ইয়ে ভাস্কর রাও নহী হ্যায়, ইয়ে খাঁ সাব ভাস্কর খাঁ হ্যায়। দিলীপ বেদী বলেছিলেন, 'ভাবো তোমরা, জিনকে গানা শুননেকে লিয়ে ভাস্কর বুয়া তরসেতে থে উনকে আঁখো মে বহ্ আঁসু লায়ে। এ ওঁর সংগীতজীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার।'

দিলীপ বেদী বলতেন ওঁর নিজের দুই গুরুর অর্থাৎ ভাস্কর বুয়া ও ফৈয়াজ খাঁর মতো গায়ক সারা দেশে কেউ ছিল না আর হবেও না। বড়ে গুলাম আলি খাঁ একদিন করাচির এক আসরে গাইছেন। এক বৃদ্ধ সারেঙ্গিবাদক গানের শেষে গুলাম আলিকে বললেন 'আপ বহুৎ আচ্ছা গায়ে মগর ইসি শহর মে ভাস্কর বুয়াকা যো গানা সুনা থা উসকে সামনে মেরে নিগাহ্‌মে সব গাওয়াইয়া বেকার। আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গৎ করেছিলাম।' বড়ে গুলাম আলি খাঁ মৃদু হেসে বললেন, 'যে বুজুর্গের নাম আপনি নিলেন তাঁর সামনে আমরা তো কীটাণুকীট, পোকামাকড়। তবে তিনদিন পরে অমুক জায়গায় জলসা আছে, মেহেরবানি করে আসবেন, চেষ্টা করব আপনাকে খুশি করতে।' দরজা বন্ধ করে আটচল্লিশ ঘণ্টা রেওয়াজ করে বড়ে গুলাম আলি খাঁ সেই বৃদ্ধকে গান শুনিয়ে প্রশংসা আদায় করে ছেড়েছিলেন, 'আজ আপনে ভাস্কর বুয়াকে ইয়াদ দিলায়া, মগর ইয়ে গায়কি আপকো মিলি ক্যায়সে?' উত্তরে বড়ে গুলাম আলি খাঁ জানান, তাঁর দাদা গুরু উস্তাদ ফতে আলি খাঁ ভাস্কর বুয়ার গানের মস্ত আশিক ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁরই শাগীর্দ চাচা কালে খাঁর কাছে এই গায়কির আন্দাজ পাই।'

খুদা হাফিজ দিয়ে আমাদের সেদিনকার সভা ভঙ্গ হলো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সারেঙ্গিয়া উস্তাদ মির্‌চ খাঁর গল্প আবার পেলাম আল্লাদিয়া খাঁর আত্মজীবনীতে। ওঁর নাতি আজিজুদ্দিন খাঁকে উনি জীবদ্দশায় অনেক তথ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই ডায়েরি অম্লান দাশগুপ্ত ও উর্মিলা ভির্দিকর ইংরেজিতে অনুবাদ করে সংগীতজগতের উপকার করেছেন। দিল্লির মির্‌চ খাঁ ছিলেন তখন ভারতবর্ষের একনম্বর সারেঙ্গি বাজিয়ে। তিনি হজরত নিজামুদ্দিনের দরগায় বসে দিবারাত্র অসাধারণ পরিশ্রম করে স্বপ্নে পীরের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। রেয়াজ করে করে ওঁর বাঁ হাতের আঙুলগুলি বরাবরের মত বেঁকে গিয়েছিল। আল্লাদিয়া খাঁর মতে কিছু রাগ, যার মধ্যে ওঁর স্মৃতিতে কামোদ নট, ওঁর মতো উনি সারেঙ্গি বা গলায় কারও কাছে শোনেননি। এ রাগটি আল্লাদিয়া খাঁরও বিশেষ পছন্দ ছিল এবং ওঁরই প্রিয় আগ্রা ঘরানার 'নেবর বাজে রে' কেসরবাইয়ের রেকর্ডে এক সময় বিখ্যাত হয়েছিল। যোধপুরের দরবারে উস্তাদ নাজির খাঁর সঙ্গে এক আসরে মির্‌চ খাঁ অসাধারণ সঙ্গত করেছিলেন। নাজির খাঁর গান শেষ হলে আল্লাদিয়া খাঁকে বসতে হল মহারাজার হুকুমে। যাই গান, মির্‌চ খাঁ হুবহু তাই ছেপে দেয় সারেঙ্গিতে, জটিল ফিক্‌রা ফিরৎ সবই তাঁর কাছে জল ভাত। অবশেষে এমনই একটি জটিল ওজনদার গমক তান মারলেন আল্লাদিয়া খাঁ যে মির্‌চ খাঁ সারেঙ্গি নামিয়ে রাখলেন এবং মহারাজকে উদ্দেশ্য করে বললেন 'সরকার, আল্লাদিয়ার সঙ্গে সঙ্গৎ করা আমার কর্ম নয়, এঁর গায়কি এবং তান এতই জোরকস এবং পেঁচিলা যে ঠিক ঠিক সারেঙ্গিতে বার করতে গেলে আমার আঙুল ভেঙে যাবে। নাজির খাঁর মতো উস্তাদদের গিলে খেতে পারে মির্‌চ খাঁ কিন্তু আল্লাদিয়ার ব্যাপার আলাদা, এ ক্ষণজন্মা গায়ক।'

এ প্রকারের একাধিক গল্প ওঁর স্মৃতিচারণের মাঝে মধ্যে আছে যা ওঁর বিনয়গুণের পরিচায়ক না হতে পারে কিন্তু উনি যে বয়সকালে অসাধারণ গায়ক ছিলেন তাই নয়, ওঁকে সে যুগেও স্বচ্ছন্দে জিনিয়াস বলা যেতে পারত। শুধু কলাকার নয়, ওঁর স্থান সংগীতের ইতিহাসে 'সিস্‌টেম বিলডার' হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এঁর সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা ও কৌতূহল অসীম, কারণ একটি সম্পূর্ণ নতুন গায়কি তৈরি করে নিজের জীবদ্দশায়ই বহু প্রখ্যাত শিষ্য শিষ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করে ঘরানার রমরমা দেখে যেতে আর কেউ পেরেছেন বলে

জানি না। এঁর নাম করা শাগীর্দদের মধ্যে পড়েন ভাই হায়দার খাঁ, পুত্র মন্‌জি অর্থাৎ বদরুদ্দিন খাঁ, তাঁর শিষ্য মল্লিকার্জুন মনসুর, ছোট ছেলে ভুর্জি বা শামসুদ্দীন খাঁ, ভাইপো নত্থন, নাতি আজিজুদ্দিন, প্রবাদপুরুষ হিন্দু গায়ক ভাস্কররাও বাখ্‌লে, তানিবাই ঘোরপাড়ে, লক্ষ্মীবাই যাদব, কেসরবাই, কিশোরী আমুনকরের মা মোঘুবাই কুর্দিকর, লীলাবাই শিরগাঁওকর, বামনরাও সাদোলিকর, শঙ্কররাও এবং তাঁর ভাইপো নিবৃত্তিবুয়া সরনায়ক, ত্রিভুবনদাস জারিওয়ালা, এবং গুলুভাই জসদনওয়ালা। এই জয়পুর গায়কির মত সুর ও লয়ের (তাল নয়, লয়) অপূর্ব মেলবন্ধন এবং চিত্রবিচিত্র জড়োয়া তানের খেলা আর কোনো ঘরানার গায়কিতে আমি পাইনি, এমন কি আমি যে দু ঘরানার গোলাম সেই প্রাচীন গোয়ালিয়র ও আগ্রাতেও নয়। এই গায়কিতে তালের চরিত্রের দিকে দৃষ্টি না দিলেও মধ্য বিলম্বিত লয়ে ধ্রুপদি গাম্ভীর্য আছে, তানও ছন্দপ্রধান, জোর পড়ে সেখানে মাত্রার ওপর, আর গোয়ালিয়র আগ্রার মত এ গায়কি বন্দিশকে আলিঙ্গন করে চলে। এ গায়কির বিশ্লেষণ করলে এর সৃষ্টিকর্তা একজন বড় মাপের ধ্রুপদি সে সন্দেহ থাকে না কারণ উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ধ্রুপদ থেকেই আহরণ করা। তবে এ গায়কি তানপ্রধান এবং আল্লাদিয়া খাঁ ধ্রুপদি হিসেবে নাম করে কী ভাবে তানের প্রতি আকৃষ্ট হলেন তা জানতে গেলে আমাদের আর একটু খোঁজ খবর করতে হবে।

আল্লাদিয়া খাঁ সাহেবের জন্ম সিপাহি বিদ্রোহের দু বছর আগে ১৮৫৫ সালে, মৃত্যু একানব্বই বছর বয়সে ১৯৪৬ সালে। এই বিরাট জীবনে উনি অনেক কিছু পরিবর্তন দেখে গেছেন এবং সামাজিক এবং সাংগীতিক পরিবর্তনের সঙ্গে পা ফেলে তাঁর গায়কিরও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। ধ্রুপদির ঘরে জন্মে চোদ্দ পনেরো হাজার ধ্রুপদ ধামার ও মনরঙ্গের ঘরের খেয়ালের বন্দিশ শিখে উনি প্রথম জীবনে খেয়াল বিশেষ গাইতেন না। যুগবাহিত ধ্রুপদ ধামার গায়ক হিসেবেই উনি খ্যাতি অর্জন করেন। আমার ধারণা ছিল সে সময়ে খেয়াল উনি একেবারে গাইতেন না, এখন দেখছি তা ঠিক নয়। বড়ে মুবারক আলি খাঁ সাহেবের প্রভাবই ওঁকে খেয়ালের পথে নিয়ে যায়। আল্লাদিয়া খাঁর পিতার নাম আহ্‌মদ খাঁ, উনি রাজস্থানের একটি ছোট রিয়াসৎ উনিয়ারায় মহারাজ ফতে সিং-এর সভাগায়ক ছিলেন। পরে উনি টঙ্কের রাজসভায় যোগদান করেন। আল্লাদিয়া খাঁর যখন বয়স বছর তেরো কি চোদ্দ, আহ্‌মদ খাঁ আশি বছর বয়সে দেহ রাখলেন। আল্লাদিয়া খাঁর পুরোপুরি শিক্ষা কাকা জাহাঙ্গীর খাঁর কাছে। ভাইপোর মতে ইনি বিরাট ধ্রুপদি ছিলেন আর গলায় এমনই এঁর তাসির বা প্রভাবগুণ ছিল প্রতিটি স্বর যেন চোখের সামনের এসে দাঁড়াত। তদুপরি এঁর নাকি পঁচিশ হাজার বন্দিশ মনে ছিল যা নাকি আহ্‌মদ খাঁর কাছ থেকে পাওয়া। কী করে তা এক জন্মে সম্ভব হয় ভেবে পাই না। আল্লাদিয়া খাঁ এর অর্ধেক হাসিল করেছিলেন এবং উনি বলেছেন আল্লাতালার অশেষ

কৃপা এর প্রতিটি বন্দিশ ওঁর শেষ দিন পর্যন্ত আয়ত্তে ছিল। নিবৃত্তি বুয়া ওঁর কাছে মাসাধিক কাল ধ্রুপদ নয়, খেয়ালের বন্দিশ শুনেছেন, প্রতিদিন সকাল দুপুর বিকেল লাগাতার, কোনোটি দ্বিতীয়বার রিপিট করেননি। আল্লাদিয়া খাঁর পিতা আহ্‌মদ খাঁ এত উচ্চস্তরের ধ্রুপদি ছিলেন যে ডাগরদের পূর্বপুরুষ বহ্‌রাম খাঁ পর্যন্ত আহ্‌মদ খাঁর নাম উচ্চারিত হলে কানে হাত দিতেন। আল্লাদিয়া খাঁ জয়পুরে বহ্‌রাম খাঁকে যখন দেখেন তখন তাঁর বয়স প্রায় পঁচানব্বই হবে এবং তখন তিনি চোখেও দেখতে পান না। আল্লাদিয়া খাঁকে বহ্‌রাম খাঁ বলেন 'তোমার বাবাকে একদিন শুদ্ধ সারং-এর ধ্রুপদ শোনাতে বলেছিলাম। উনি একটির পর একটি ধ্রুপদ গেয়ে গেলেন ঐ রাগে সন্ধ্যা ছটা অবধি। শেষ অবধি আমিই বললাম অব্ খতম করো ভাই, নামাজকা বখ্‌ত হো গয়া। অস্তফ্ উল্লা! তোমার বাপের মত বিদ্বান গায়ক খুঁজে পাওয়া ভার।' বহরাম খাঁ আহ্‌মদ খাঁর সঙ্গে দেখা হলেই সাংগীতিক আলোচনা ও আড্ডায় মেতে যেতেন। একবার বরারি তোড়ির রূপ নিয়ে দুজনের তুমুল তর্ক হয়। শেষ অবধি বহরাম খাঁ আহ্‌মদ খাঁর ঘরানার মতের পেছনে যে যুক্তি তা মেনে 'বিরহন বাবরি বেগী সুধ লেও পিয়ারে' এই ধ্রুপদটি শিখে আসরে গাইতেন। পরবর্তীকালে আল্লাদিয়া খাঁ এটিকে খেয়াল করে নিয়েছিলেন।

আল্লাদিয়া খাঁ বহ্‌রাম খাঁকে বাল্যবয়সে দেখেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঘগ্‌গে খুদা বখ্‌শের নাম করলেও আলাদা করে কিছু লেখেননি, কারণ খুদা বখ্‌শও বহুদিন, প্রায় একানব্বই বছর বেঁচেছিলেন এবং ওই জয়পুরেরই সভাগায়ক ছিলেন। ইনি আগ্রা ঘরানার উস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও গোয়ালিয়রের নথ্‌থন পীর বখ্‌শের কাছে চোদ্দ বছর তালিম নেন খেয়ালের। গলা এঁর এতই কর্কশ ছিল যে সবাই ওঁকে ঘগ্‌গে বলে ডাকত। ওস্তাদখানার ও বন্ধুবান্ধবদের ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য না করতে পেরে একদিন পুঁটলি বেঁধে ডাকাতের জঙ্গল বেহড় চম্বল যমুনা পেরিয়ে উনি গোয়লিয়রে গিয়ে হাজির হন। যখন ফিরে এলেন তখন খুদা বখ্‌শের গান শুনে আগ্রার উস্তাদরা অবাক। এ মানুষটার গলা এত মধুর ও সুরেলা হলো কোথা থেকে? এতই সুরেলা ও তাসির গলার যে বিয়ে শাদিতে খুদা বখ্‌শকে গাইতে দেওয়া হত না, কারণ চোখের জল ফেলা অমঙ্গলের লক্ষণ আর খুদা বখ্‌শের গান শুনলে শ্রোতারা এতই অভিভূত হয়ে পড়তেন যে চোখের জল সামলাতে পারতেন না। ইনি যখন জয়পুরে সভাগায়ক হয়ে যান তখন জয়পুরের গুণিজনখানায় বিরাট বিরাট উস্তাদদের ভিড়—দুল্‌হে খাঁর ছেলে হায়দর বখ্‌শ, তাঁর ভাই করিম বখ্‌শ, মিঞা মনরঙ্গের পৌত্র মোহম্মদ আলি খাঁ, স্বয়ং বহ্‌রাম খাঁ, মিঞা তানসেনের কন্যার বংশধর ইম্‌রৎসেনজী, রেওয়ার বড়ে মহম্মদ আলি খাঁর জারজ সন্তান বড়ে মুব্যরক আলি খাঁ অর্থাৎ কব্‌বাল বচ্চে ভ্রাতৃদ্বয় মখ্‌খন খাঁ ও শক্কর খাঁর পৌত্র, বড়ে রজব আলি খাঁ (ইনি মহারাজ রামসিংজীর সভার

দুনম্বর উস্তাদ, কিরানা ঘরানার তানাইয়াৎ রজব আলি নন) তাঁর ভাই খয়রাত আলি খাঁ ইত্যাদি। খুদা বখ্‌শ এই সভায় যোগ দেওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর এমনই সুখ্যাতি হয় যে সবাই একবাক্যে বলত ইল্‌ম অর্থাৎ বিদ্যার দিক দিয়ে বহ্‌রাম খাঁ যদি সবচেয়ে আগে হন তো শাস্ত্রীয় সৌন্দর্য আর সুরেলা কণ্ঠর মাধুর্যের দিক দিয়ে ঘগ্‌গে খুদা বখ্‌শের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই হিন্দুস্থানে।

আল্লাদিয়া খাঁর বাল্যকালে দেখা লিস্টিতে খুদা বখ্‌শের বিশেষ উল্লেখ না থাকা আরও আশ্চর্যজনক এই কারণে আল্লাদিয়ার কাঁধে তাঁর পরিবারের বাইরে প্রথম উস্তাদ যিনি তানপুরো রাখেন তিনি মুনশি গুলাম হুসেন, খুদা বখ্‌শের শিষ্য। সে দিক দিয়ে দেখলে আল্লাদিয়া খাঁর দাদাগুরু ঘগ্‌গে খুদা বখ্‌শ।

আগ্রা ঘরানার সুগায়িকা ললিত রাওর স্বামী জয়বন্ত রাও তাঁর 'সজন পিয়া' নামে তাঁর স্ত্রীর গুরু উস্তাদ খাদিম হুসেন খাঁর জীবনীতে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। উস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ বোম্বের বাবুলনাথ এলাকায় যখন এই পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেন তখন খাদিম হুসেনের বয়স অল্প। তিনি একদিন আল্লাদিয়া খাঁকে আবদার করে বলেন 'দাদাজী আপনার ইল্‌মের, আপনার বিদ্যার সামান্য অংশ একটু দিন, আমি ধন্য হয়ে যাব।' শোনামাত্র আল্লাদিয়া খাঁ দাঁড়িয়ে উঠে দুকানে হাত দিয়ে বিড়বিড় করে কী সব বলতে লাগলেন, তারপর বললেন, 'দাদা, আমার যা কিছু আছে তোমারই তো সব, তোমার তো হক্ আছে। তুমি নেবে না তো কে নেবে?' রকমসকম দেখে খাদিম হুসেন গেলেন ঘাবড়ে। বললেন, 'দাদাজী আমায় মাফ করে দিন, আমি যদি ভুলে কোনো না-জায়েজ কথা বলে থাকি, তো আপনি রাগ করবেন না।' 'না বেটা', আল্লাদিয়া খাঁ বললেন, 'সত্যি সত্যিই, তোমার হক্ আছে। আমাকে বাল্যকালে যিনি আমার খানদানের বাইরে আমার কাঁধে তানপুরো চড়ান তিনি তোমারই প্রপিতামহের ছোট ভাই, মুন্‌শি গুলাম হুসেন, আগ্রার খুদা বখ্‌শের শাগীর্দ। এই বলে তিনি খাদিম হুসেনকে একাধিক রাগ ও বন্দিশের তালিম দেন। খাঁ সাহেবের শাকরেদরাও আগ্রা ঘরানার তালিম নিতে দ্বিধা বোধ করেননি। যথা কেসরবাই ভাস্কর বুয়ার কাছে, মোঘুবাই বিলায়েৎ হুসেনের কাছে, কিশোরী আমুনকর খাদিম হুসেনের ভাই আনওয়ার হুসেনের কাছে।

আগ্রার সিলসিলা ধ্রুপদ ধামারের। খুদা বখ্‌শই প্রথম খেয়ালের আমদানি করেন আগ্রায়। যদিও আগ্রা ঘরানার বুজুর্গরা এই সর্বজনগ্রাহ্য ঐতিহাসিক তথ্যের সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে ছায়ানটের বিখ্যাত বিলম্বিত বন্দিশ 'নেবর কি ঝন্‌কার' খগ্‌গে খুদা বখ্‌শের পিতা কাইয়ুম খাঁ বা সরসরঙ্গের রচনা। এঁর ভাই দয়াম খাঁ নৌহর বা শ্যামরঙ্গ, মতান্তরে ভাই নয় পিতার বির্জু কা মহলারের রচনা 'আয়ে বদরা কারে কারে।' এর অন্তরায় রয়েছে 'অ্যায়সে সময় শ্যামরঙ্গ

পি কি ইয়াদ মোহে তড়পায়ে।' শেষোক্ত গানটি উস্তাদ খাদিম হুসেন খাঁর মুখে আমার শোনা কোমলগান্ধার যুক্ত মেঘমল্লারে ম ম রে সা, সারে মা মুখড়া দিয়ে শুরু ও শেষ হয়। এই দুটি রচনাই আমার মতে, হয় ধ্রুপদ পরে ভেঙে খেয়াল হয়েছে, নতুবা সরসরঙ্গ ও শ্যামরঙ্গের তখল্লুস প্রক্ষিপ্ত। আরও বলি ছায়ানটের 'নেবর কি ঝন্‌কার' আগ্রা ও গোয়ালিয়র ঘরে পৃথক ভাবে গাওয়া হয়। দু'ঘরেরই ছিটেফোঁটা তালিম আমি পেয়েছি এবং গোয়ালিয়রের ভ'র্শানটি আমি গেয়ে থাকি। আমার মতে ওটি আরও সুন্দর রচনা এবং ছায়ানট রাগের দু তিনটি অপ্রচলিত ফ্রেজ তার মধ্যে পাওয়া যায়।

ফৈয়াজ খাঁ বলতেন তাঁর নানার বাবা খুদা বখ্‌শ বড় সরলপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন, আবার কখনও কখনও খুব বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিতেন। একবার এক বিপর্যয় থেকে অদ্ভুতভাবে বেঁচে ফিরেছিলেন উপস্থিতবুদ্ধি দ্বারা। খুদা বখ্‌শজীর নেমন্তন্ন এসেছিল গ্রীষ্মকালে গোয়ালিয়রের মহারাজার দরবার থেকে। গ্রীষ্মে ও সব অঞ্চলে সাংঘাতিক গরম পড়ে তাই রাত্রে সবাই বলদ টানা গাড়ি হাতি ঘোড়া নিয়ে রাতের বেলা চলতেন। আগ্রা থেকে গোয়ালিয়র এখন মেল ট্রেনে ঘণ্টা দেড়েক লাগে, আটাত্তর মাইল। হাঁটাপথে দিন তিনেকের সফর। পথে আবার পাহাড়ী অঞ্চল, চম্বলের ঘাটি ও বেহড় দিয়ে যাওয়া-আসা একেবারেই নিরাপদ ছিল না, এখনও শুনতে পাই ও তল্লাটের কুখ্যাতি বহাল আছে। সে কালে ঐ পথে যাতায়াত করতে হলে অন্তত জনা পঁচিশেক পথিকদের একত্র হতে হত। খুদা বখ্‌শকে জঙ্গল পার হবার জন্য চার-পাঁচদিন অপেক্ষা করতে হলো, শেষে যখন কাফিলা অর্থাৎ ওদের দলবল তৈরি হলো তখন জলসার মাত্র চারদিন বাকি। সবশুদ্ধ সাতটি ঘোড়া, একটি উটের গাড়ি, বাকিরা পায়ে হেঁটে যাবে। এদের মধ্যে একটি বড়সড় দেশি ঘোড়ায় সওয়ার খুদা বখ্‌শ সর্বাগ্রে সারারাত চলে যখন দূরে চম্বল ঘাঁটির পাহাড় দেখা যাচ্ছে তখন বিশ্রাম নিলেন তাঁবু খাটিয়ে। দ্বিতীয় রাতে সাড়া শব্দ না করে জঙ্গলের পথে রওনা দিলেন সবাই, সামনে পিঠে তানপুরো বাঁধা খুদা বখ্‌শ। পিছু পিছু আর সবাই, কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ অশ্বপৃষ্ঠে। এমন সময় জঙ্গলের মধ্য থেকে জনা কয়েক এসে পথ আটকাল, হাতে তাদের লাঠি, সুড়কি, গাদা বন্দুক। যাত্রীদের তো তখন নাভিশ্বাস উঠছে, কিন্তু খুদা বখ্‌শ ঘাবড়ালেন না। হাঁক ছেড়ে বললে 'খবরদার! আমরা মহারাজার পুলিশি ফৌজ। বলেই রাতের অন্ধকারে গিলাব শুদ্ধ তানপুরোটি ঘুরিয়ে তাক করে বললেন 'আমাদের কাছে গোলা বারুদ আছে, নড়লেই ফৌত হয়ে যাবে সবাই।' রাতের অন্ধকারে ঐ তানপুরোর ভয়ে ডাকাতরা হাত তুলে নিয়ে বলল 'আমরা জানতাম না আপনারা মহারাজার ফৌজ, আপনারা যেতে পারেন। আপনাদের কোনো ভয় নেই, আমাদের লোকেরা আগে আগে

গিয়ে ডাকাতদের সরিয়ে দেবে, দয়া করে মহারাজার কোতোয়ালের কানে আজকের ঘটনা তুলবেন না।' গোয়ালিয়রে·নির্বিঘ্নে জলসা সেরে মহারাজের পুলিশি ফৌজ নিয়ে ফিরতি পথে চম্বল ঘাঁটি পার হলেন। কোনো সমস্যা হয়নি।

এই মানুষটির বৃদ্ধবয়সের গল্প শুনুন। তখন উনি জয়পুরে, বয়স পঁচাশি। সে কালে দঙ্গলে কূট রাগ গেয়ে বা তানবাজি করে কেউ কাউকে পরাস্ত করলে তার তানপুরো কেড়ে নেওয়ার প্রথা ছিল। একদিন খুদা বখ্‌শ একলা বাড়িতে বসে। দুই ছেলে বাজারে গেছেন। কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে উঠে দেখেন মাথায় পাগড়ি বাঁধা এক পাঞ্জাবী। সে নাকি শ্যাম চৌরাসি ঘরানার উস্তাদ, বহু দূর থেকে এসেছে খুদা বখ্‌শের কাছে গান শুনবে বলে। খুদা বখ্‌শ বললেন 'আমি সেই নাচীজ্ খুদা বখ্‌শ, লোকে আমায় ঘগ্‌গে বলে ডাকে, বলুন আমি কী ভাবে আপনার খিদমত্ করতে পারি।' আগন্তুক বললেন আপনার তবলিয়াকে ডাকিয়ে পাঠান। আপনার কাছে কয়েকটি বাছা বাছা রাগের চীজ শোনবার খ্বায়িশ (আকাঙ্ক্ষা) নিয়ে এসেছি।' তবলা তানপুরো বাঁধা হলে প্রথম রাগ জয়েৎ-এর ফরমাস হলো। কিন্তু একে বয়স হয়েছে যাকে বলে উমরকা তাকাদা তায় অর্ধেক সময় খুদা বখ্‌শের রাগের নাম মনে থাকত না, অনেক চেষ্টা করেও ওঁর একটা চীজ্‌ও মনে এল না। পাঞ্জাবী গায়ক তখন ছি ছিক্কার করে বলল, 'এত সাধারণ রাগও আপনি জানেন না, আর আপনার এত নাম ডাক, জয়পুর মহারাজার সভাগায়ক আপনি! তওবা তওবা, চললাম আপনার তানপুরো নিয়ে।' কী আর করেন খুদা বখ্‌শ, বিমর্ষ বদনে বসে আছেন। ওদিকে দুই ছেলে গোলাম আব্‌বাস এবং কল্লন খাঁ বাজার ফেরত দেখে কে এক পাগড়ি বাঁধা মুশ্‌কো চেহারার লোক চেনা একখানা বিরাট তানপুরো ঘাড়ে করে তাঁদেরই বাড়ির দিক থেকে আসছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর গোলাম আব্‌বাস বললেন 'এ হতেই পারে না। জয়েৎ রাগ আমি শিখেছি আব্‌বার কাছে আর আপনি বলছেন উনি জানেন না, অসম্ভব! আপনি ফেরত চলুন।' বাড়িতে ঢুকে গোলাম আব্‌বাস খুদা বখ্‌শকে একটি জায়েৎ-এর ধ্রুপদের মুখ শোনাতেই খুদা বখ্‌শ বললেন 'ঐ রাগটা? তাই বল।' এই বলে তিনি একের পর এক জয়েৎ রাগের ধ্রুপদ ধামার খেয়াল গাইতে লাগলেন। তার সিকিভাগও ছেলেরা শেখা তো দূর থাক, শোনেনও নি। পাঞ্জাবী শেষ অবধি মাফ্ টাফ চেয়ে তানপুরো ফেরত দিয়ে নজরানা পেশ করে প্রভূত প্রশংসা করে বিদায় নিল। যাবার সময় বলে গেল 'যা শুনেছিলাম আপনার সম্পর্কে তা মিথ্যা নয়, আপনি এ যুগের তানসেন।'

খুদা বখ্‌শের প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকবে যদি না উল্লেখ করা হয় যে ডাগরদের পূর্বপুরুষ বহ্‌রাম খাঁ ধ্রুপদিয়ার সঙ্গে ওঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। মেয়েরা যেমন আমাদের দেশে সই পাতায় তেমনি ওঁরা মাথার টুপি এক্সচেঞ্জ করে 'টোপি বদল ভাই'

হয়েছিলেন। ১৯২০ সালে ভাতখণ্ডেজীর দ্বারা আয়োজিত প্রথম গ্র্যাণ্ড কন্‌ফারেন্‌সে মইনুদ্দিন আমিনুদ্দিন খাঁ ডাগর ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রপিতামহ ওস্তাদ আল্লাবন্দে খাঁ তাঁর বড় ভাই জাকিরুদ্দিন খাঁকে নিয়ে ধ্রুপদের আলাপ করতে করতে বলেন 'এ সিলসিলা আমাদের বংশের বাইরে কোথাও নেই, আমাদের পর আর থাকবে না। চল্লিশ বছরের নওজোয়ান ফৈয়াজ খাঁ এ কথা শুনে পরের দিন সওয়া ঘণ্টা দরবারি কানাড়ার এমনই আলাপ করেন যে ভাতখণ্ডেজীর মতে তার পাশে জাকিরুদ্দিন আল্লাবন্দের আলাপও ম্লান হয়ে যায়। সেদিন ফৈয়াজ খাঁ আলাপের পর ধ্রুপদ ধামার ও পরিশেষে খেয়াল গেয়েছিলেন। তাঁর গান শেষ হওয়ার পর আল্লাবন্দে খাঁ স্টেজের ওপর উঠে ফৈয়াজ খাঁকে বুকে জড়িয়ে বলেছিলেন, 'আমি যখন বলছিলাম আমাদের খানদানের বাইরে এ আলাপের সিলসিলা নেই তখন আমি তোমার কথা ভেবেই বলেছিলাম, তোমার দাদাগুরু ঘগ্‌গে খুদা বখ্‌শ আর বহ্‌রাম খাঁ তো "টোপি বদল ভাই" ছিলেন, মায়ের পেটের মতো ভাইয়ের চেয়েও অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ তাঁদের সম্পর্ক, তুম তো হমারেই হো।'

এই কন্‌ফারেন্‌সেই ফৈয়াজ খাঁর জিগরি দোস্ত বিলায়েতের বাবা সেতারি এনায়েৎ খাঁ আসর মাত করেছিলেন 'দুর্গা' রাগ বাজিয়ে। বহু ওস্তাদের সপ্তাহ -ব্যাপী রকম-বেরকমের কলাকৌশল তুবড়িবাজির পর যুবক এনায়েৎ খাঁর বারি যখন এল তখন সেতার ধরে উনি শুধু একবার রাগের আরোহী অবরোহী বাজালেন সা রে ম প ধা, সা ধা পা ম রে ধ সা। প্রতিটি স্ট্রোকের পেছনে এমনই সাচ্চাই, এমনই সুরেলা হাত, এমনই তার তাসির, এমনই প্রভাবগুণ, যে সারা কন্‌ফারেন্‌সের শ্রোতারা হায় হায় করে উঠল। বিলায়েৎ খাঁও আমাকে বহুকাল পূর্বে বলেন যে 'এত রেয়াজ করেও আমার হাত দিয়ে আমার বাবার স্ট্রোকের সাচ্চাই আমি হাসিল করতে পারিনি।' কথাটা শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হয় বিশেষ করে আমাদের কানে, যারা বিলায়েৎকে পীক ফর্মে শুনেছি।

এনায়েৎ খাঁ যেমন ফৈয়াজ খাঁর বন্ধু ছিলেন তেমনই ইয়ুনুসের ঠাকুরদাদা ভাস্কর বুয়ার গুরু আগ্রা ঘরানার নথ্‌থন খাঁ এনায়েৎ খাঁর পিতা ইমদাদ খাঁর বন্ধু এবং গুণগ্রাহী ছিলেন। একবার মহীশূরে প্রধান সভাগায়ক উস্তাদ নথ্‌থন খাঁকে মহারাজা ফরমাস করলেন পুরিয়া রাগের। পুরিয়া রাগ আগ্রা ঘরানার প্রিয় রাগ কিন্তু নথ্‌থন খাঁ হাত জোড় করে বললেন 'মহারাজ গোশ্‌তাকি মাফ করে অন্য কোনো রাগ গাইবার হুকুম দিন। এ সভায় নিমন্ত্রিত উস্তাদ ইমদাদ খাঁ এসেছেন, তাঁরই কাছে পুরিয়া রাগ শোনা উচিত, পুরিয়া রাগকে উপর ইমদাদ খাঁ কা মোহর লগ্ চুকা।'

আমার বাবা ধূর্জটিপ্রসাদও বলতেন যৌবনে উনি আড়াই ঘণ্টা ইমদাদ খাঁর ঐ পুরিয়া শুনেছিলেন সুরবাহারে ও সেতারে। দেবপ্রসাদ গর্গও ইমদাদ খাঁ সম্পর্কে

স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর একটি লেখায়।

ইমদাদ খাঁর একটি জলসা হয়েছিল আমার সেজ ভাই-এর অন্নপ্রাশনে মহিষাদলে। এখনও সেই জলসা স্বপ্নের মত মনে পড়ে। ওঁর চেহারা ছিল ছোটখাট, মাথায় রাজপুত দোপাট্টা পাগড়ি। চুস্ত চুড়িদার পাজামা, গায়ে আঙ্‌রাখা। গায়ের রঙ মাজামাজা, সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ওঁর ছাঁটা দাড়ি। গোঁফ দাড়ির তিন রকম রঙ ছিল—গোড়ার দিকে সাদা, তারপর বাদামি, আর ডগার রঙ ছিল খয়েরি। যাঁরা দাড়ি গোঁফে মেহেদি লাগান এবং সপ্তাখানেক মেহেদি লেপনে বিরাম দেন, তাঁদের গোঁফ দাড়ির রঙ ঐ রকমই হয়। আমি এর আগে এ রকম বিচিত্র রঙের গোঁফ দাড়ি দেখিনি বলেই ইমদাদ খাঁর দাড়িটিই আমার শিশুমনকে সবচেয়ে আকর্ষণ করেছিল। দ্বিতীয় দিন কিন্তু তাঁর দাড়ির রঙ খয়েরি একরঙা হয়ে গিয়েছিল। সেদিন তাঁর অতিকায় সুরবাহারে বেহাগ শুনতে শুনতে লোকজনের সামনে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছিলাম। সে কথা আজও মনে পড়ে। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ইমদাদ খাঁ সাহেব বেহাগে আলাপ শুরু করেছিলেন। জমজমাট আসর, সকলেই মন দিয়ে শুনছেন। প্রায় পনেরো মিনিট বাজাবার পর আমার মনে হল খাঁ সাহেবকে যেন জীবন্ত অবস্থায় দেওয়ালে গেঁথে ফেলা হচ্ছে, আর উনি যন্ত্রণায় কাঁদছেন। সে কান্না আমার কাছে প্রাকৃতিক মনে হয়নি, সে কান্নার কোনো ভাষা ছিল না, শুধু ব্যথার ঝংকারে ওপর থেকে মোমবাতির ঝাড়গুলোর ভেতর থেকে সেই কান্না দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আমার বয়স তখন চার বছর। সেই অভিজ্ঞতা আমি ঠিক প্রকাশ করতে পারব না। আসরের মধ্যেই আমি ডুকরে কেঁদে উঠলুম, কি জানি কেন বারবার পিতৃদেবকে বলতে লাগলুম—ওঁকে তুমি ছেড়ে দাও, ওঁকে কেন এমন মারা হচ্ছে?' পিতৃদেব কোনো উত্তর দিলেন না, তাঁর চোখেও দেখি জল টলটল করছে। তাড়াতাড়ি রুমালে চোখ মুছে বেচারাম খানসামাকে আদেশ করলেন আমাকে মার কাছে নিয়ে যেতে। মাকেও জ্বালাতন করতে লাগলুম খাঁ সাহেবকে রেহাই দেবার জন্য। শেষে না খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লুম। পরের দিন সকালে উঠে হাত মুখ ধোবার পর শুনলুম বাইরে পিতৃদেব ডেকে পাঠিয়েছেন। বাইরে আসতে ভয় হচ্ছিল। বেচারামের কোলে চড়ে বাইরে এসে দেখি পিতৃদেবের সামনে ইমদাদ খাঁ বসে আছেন। তিনি হাসিমুখে বেচারামের কোল থেকে আমায় কোলে তুলে নিলেন। ওঁর কোলে চড়ে বলেই ফেললুম 'আমি কান্না চাপতে চেষ্টা করেও পারিনি, কি করব?' ইমদাদ খাঁ সাহেব পিতৃদেবকে বললেন, 'মুঝে ইস বেহাগকে লিয়ে বহুত ভারী কুরবাণী দেনা পড়া' (বিরাট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে)। শুনেছিলাম পরে মায়ের কাছে, খাঁ সাহেব একদিন রেওয়াজে বসেছেন। তার

কিছুদিন আগে ওঁর এক মেয়ে অসুখে ভুগছিলেন, চিকিৎসাও চলছিল। যেদিনকার কথা সেদিন উনি রেওয়াজে বসার পর মেয়েটির অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হয়। ওঁর স্ত্রী একবার আসতে বললে উনি বললেন ডাক্তার আনাও কাউকে পাঠিয়ে। পড়শির ডাকে ডাক্তার এলেন, ওষুধও দিলেন, কিছুতেই কিছু হলো না। খাঁ সাহেব কিন্তু রেওয়াজ ছেড়ে উঠলেন না। শেষে মেয়েটি মারা গেল। ওঁকে জানাতে উনি নাকি বলেছিলেন যে লোক ডাকিয়ে মেয়ের দাফনের ব্যবস্থা কর, ততক্ষণে আমি আমার বাকি পাল্‌টাগুলি সেরে ফেলি। পরে ওঁর পুত্র এনায়েৎ খাঁ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। উনি বলেছিলেন কথা তো সত্যি কিন্তু বেহাগ রাগের পালটা সাধছিলেন কি না তা বলতে পারেন না। কারণ ঐ ঘটনা যখন ঘটে তখন তিনি খুবই ছোট। তারপর কিছুক্ষণ পর হেসে বলেছিলেন 'আব্‌বা বোধ হচ্ছে যেন বলছিলেন পুরিয়া, বেহাগ নয়, কিংবা বেহাগ হতেও পারে।

দেবপ্রসাদ আরও লিখছেন :

ইমদাদ খাঁ প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে ওঁর একটি জলসার বিবরণ দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এ জলসাও আমাদের বাড়িতেই হয়েছিল, বোধহয় আমার জন্মের আগে কিংবা আমার অতি শৈশবে। সেই জলসায় উপস্থিত ছিলেন জওহরলাল এবং সম্ভবত ধামারী বিশ্বনাথ রাওজী। ইমদাদ খাঁ ছিলেন তবলিয়াদের যম, সকলেই তাঁকে ভয় করত। ওঁর সঙ্গে অনেক সময়ে আসতেন অবনী গাঙ্গুলী মশাই। অবনী গাঙ্গুলী ছাড়া একমাত্র পিরু মিঞাই ওঁর সঙ্গে সঙ্গত করার স্পর্ধা রাখতেন। ইমদাদ খাঁ কেবল বিলম্বিত তিনতালের গৎই পছন্দ করতেন। পরে যখন দ্রুত তিনতাল বা সিতারখানি গৎ ধরতেন তখন উনি অচেনা তবলিয়াদের শুদ্ধ ঠেকাই দিয়ে যেতে বলতেন এবং গতের বাঁধুনির মধ্যেই এমন সব অদ্ভুত জায়গায় স্ট্রোকে জোর দিতেন যে তবলিয়ারা শুদ্ধ ঠেকাতেই গোলমাল করে ফেলতেন। সেবার আলাদা করে আনা হয়েছিল সে যুগের প্রসিদ্ধ তবলিয়া প্রসন্নকুমার সাহাকে। উনি প্রসন্ন বণিক নামেই খ্যাত ছিলেন। পিতৃদেব যদিও ইমদাদ খাঁর মেজাজ জানতেন, তবুও এদের দুজনের সাথ সঙ্গতের ব্যাপারে উপস্থিত অনেকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বললেন না। সুরবাহারে আলাপ বাজাবার পর সেতার তুলেই খাঁ সাহেব বললেন প্রসন্ন বণিক মশাইকে 'একটা মোমবাতি পুড়তে যত সময় লাগে ততক্ষণ তোড়া না বাজালে আসর জমে না।' বণিকমশাই উত্তর দিলেন, 'গৎ তোড়াই আসল কাম। যতক্ষণ তা বাজবে ততক্ষণে আমার ঠেকাও চলবে।' খাঁ সাহেবের সঙ্গে বাজাতে বসেছিলেন ওঁর পুত্র ওয়াহিদ খাঁ (এঁরই নাতি শাহীদ পরভেজ)। সেই অল্পবয়সেই নাকি খাঁ সাহেব তাঁর পুত্রটিকে এক নাগাড়ে বারো ঘণ্টা মেহনত

করাতেন। যাই হোক, দুজনেই গতের মুখ একসঙ্গে ধরছিলেন, তারপর একের পর এক তোড়া বাজাচ্ছেন। বেশিটা ওয়াহিদ খাঁই বাজাচ্ছিলেন, ঠেকাও চলছিল বাঁয়ার দোলানিতে সঙ্গে মিশে দ্রুত লয়ে না-ধি-ধি-না। আসর একেবারে আগুন। খাঁ সাহেব ঝালার কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে এক বিপর্যয়। প্রসন্ন বণিকমশায় তক্ষণি উপজ আরম্ভ করলেন, যেমন পর্বত সিংজী করতেন সরোদীয়া উস্তাদ হাফিজ আলি খাঁর সঙ্গে। খাঁ সাহেব বণিকমশাইকে হেঁকে বললেন, 'ঠেকা।' বণিকমশাই ফিরে গেলেন ঠেকায়। তখন ইমদাদ খাঁ সাহেব হঠাৎ বলে উঠলেন 'বাবুকো ইতনাহিমে পসিনা আগয়া, তাজ্জব!' অবশ্য এই কথাগুলি বলার সময়ে ওয়াহিদই বাজাচ্ছিলেন। বণিকমশায় তখন বাজাতে বাজাতে যেখানে অতিকায় সুরবাহারটি শোয়ানো ছিল তার কাছে সরে এসেছেন। ইমদাদ খাঁ সাহেব আবার ঝালা অর্থাৎ তোড়ার অর্ধেক লয়ে চিকারির পটভূমিতে লয়ের মজা নিচ্ছিলেন। বণিক মশাইও সেই লয়ের উপজ আরম্ভ করলেন। খাঁ সাহেব হাঁকলেন, 'ঠেকা।' বণিকমশায়ও পালটা হাঁকলেন 'তোড়া'। খাঁ সাহেব নিরুপায় হয়ে তোড়ায় ফিরে এলেন। বণিক মশায়ও শুদ্ধ ঠেকায় প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু সেতার বাজনায় ঝালার বিশেষ প্রয়োজন। আবার ঝালা আরম্ভ করলে বণিকমশাই উপজ শুরু করবেন। তাতে 'শম্' হারিয়ে যাওয়ার ভয় আছে। তাই ওয়াহিদ খাঁ ঝালা বাজাতে লাগলেন আর ইমদাদ খাঁ সেতারের তুম্বার ওপর ডানহাতে তাল রাখতে লাগলেন। তারপর ইমদাদ খাঁ ঝালা বাজাবার সময় ওয়াহিদ খাঁ তাল রাখলেন যদিও ওয়াহিদ খাঁ বেশিক্ষণ ঝালা বাজাচ্ছিলেন। প্রসন্ন বণিকমশাইয়ের সাথসঙ্গতে আসর একেবারে আগুন। কিন্তু ওয়াহিদ বেচারা কতক্ষণ আর বাজাবেন? আবার সেই খাঁ সাহেবকে তোড়াই বাজাতে হচ্ছিল। ওঁদের অবস্থা তখন একটু জিরিয়ে নেবার, এমন সময়ে হঠাৎ বজ্রপাত। বণিকমশায় বলে উঠলেন 'তুমি বেটা লেকে বাজাতে কেঁও? মুঝসে লড়না হ্যায় তো বেটাকো বন্ধ করওয়া দো, ইয়াতো মুঝকো ফওরণ এক বেটা লা দো, আভি মোমবত্তি আধিভি গলি নহী।' ঐ বেটা লা দো—বলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী গওহরজান উঠে দাঁড়িয়ে তিনজনকেই থামিয়ে দৃপ্তস্বরে মন্তব্য করলেন 'গানে বাজানেকা মেহ্‌ফিলকো অগর ডাণ্ডাবাজিকা আখাড়া বনায়া যায় তে বহ্ কুড়োঁকো পসন্দ আওয়ে ওর তালিভি বজে, ইনসানকো অ্যায়সে জলসোঁকো তওবা করনাহি চাহিয়ে।' এর পরও বণিক মশাই মোমবাতির দিকে তাকিয়ে বললেন 'এতো এখনো শেষ হতে অনেক বাকি।' তখন গওহরজান নাকি বলেছিলেন 'বাবুজী খাঁ সাহেবকে দাফন করতে ওঁর বেটা ওয়াহিদ খাঁ আছে, আপনি যখন বেটা খুঁজে পেলেন না তখন আপনাকে চিতায় কে তুলবে শুনি? আর জলসা এইরকম চললে তো দুজনেরই কেয়ামৎ এসে গিয়েছিল। এখন চুপ করে 'চতর সুঘর

মোরা পিউ' শুনুন দরবারিতে।' হারমোনিয়ামে বশীর খাঁ, তানপুরো নিয়ে এগিয়ে এলেন লায়লাবাই আর তবলিয়া মৌলাবক্স ঢিমা তিলওয়াড়ায় ঠেকা ধরলেন। আসর শেষ হলে কেউ কেউ প্রসন্ন বণিকমশাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন তিনি সুরবাহারের দিকে ক্রমশ সরে গিয়ে বসেছিলেন। বণিকমশাইয়ের উত্তর 'শ্রাদ্ধ আর বেশিদূর গড়ালে ঐ সুরবাহারের তুম্বাটি খাঁ সাহেবের মাথায় ভাঙব বলে'।

উস্তাদ নথ্থন খাঁ মহারাজার প্রিয় গায়ক ছিলেন। তৎকালীন প্রথামত বাঁ পায়ে মহারাজার দেওয়া মণিমুক্তো বসানো সোনার মল পরে সভায় বসতে হত সভাগায়ককে। নথ্থন খাঁ শৌখিন খাওয়া দাওয়া পছন্দ করতেন এবং খাওয়ার চেয়ে দাওয়া বেশি। একবার সভায় গাইতে বসেছেন, বাঁ পায়ে চুড়িদার পাজামার ওপর মল নেই দেখে মহারাজ প্রশ্ন করলেন নথ্থন খাঁকে। খাঁ সাহেব হাতজোড় করে বললেন 'হুজুর, গোশ্তাকির জন্য মাফি চাইছি, কি করব সরকার? উয়ো তো পেটমে চলা গয়া।' মহারাজ মৃদু হেসে নতুন মল গড়াবার আদেশ দিলেন।

নথ্থন খাঁ ও আল্লাদিয়া খাঁ অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং পরস্পরের গুণগ্রাহী ছিলেন। একবার বোম্বাইয়ের কলবাদেবীতে সহসওয়ান ঘরানার উস্তাদ হায়দর খাঁর গান হচ্ছিল। উনি আমার দু নম্বর গুরু পদ্মভূষণ উস্তাদ মুশ্তাক হুসেন খাঁর প্রথম শ্বশুর এবং উস্তাদ নিসার হুসেন খাঁর ঠাকুরদাদা। উনি গাইছিলেন জয়ৎকল্যাণ। আসরে আল্লাদিয়া খাঁকে উপস্থিত হতে দেখে উনি ওঁর ঘরের সেই বন্দিশের অন্তরাটি চেপে শুধু আস্থায়ী গেয়ে থেমে গেলেন। আল্লাদিয়া খাঁ উচ্চৈঃস্বরে বললেন 'জনাব এ রাগ তো পুরো গাওয়া হল না অন্তরা বাদ দিয়ে। থামছেন কেন? এ অন্তরা আমার জানা আছে।' এই বলে উনি অন্তরা গেয়ে শুনিয়ে দিলেন। সেদিনের ম্যহ্ফিলের শেষে হায়দর খাঁ নথ্থন খাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এই আল্লাদিয়া, কোন ঘরের উস্তাদের বাচ্ছা, গায় কিরকম?' নথ্থন খাঁ শুনে চোখ কপালে তুলে বললেন, 'আপ কহ্ কিয়া রহেঁ হ্যাঁয়, আপকো মালুম নহী আল্লাদিয়া খাঁ কৌন হ্যায়? ইনকা নাম লেনেকে পহলে গুলাবজলসে কুল্লা কর লিজিয়ে, ইয়ে মামুলি ইনসান নহী হ্যাঁয়, হম্ আপ তো ইনকে নাম লেনেকে কাবিল নহী।' স্বয়ং নথ্থন খাঁর মুখে এ ধরনের কথা শুনেও হায়দর খাঁর বিশ্বাস হয়নি। আল্লাদিয়া খাঁর গান শুনে উনি নথ্থন খাঁকে বলেন 'মান গয়ে ভই।' পরে দুজনেরই ভাব হয়ে যায়। হায়দর খাঁরও আল্লাদিয়া খাঁর মত বন্দিশ রচনা করার শখ ছিল, পরস্পরকে শুনিয়ে ওঁরা আনন্দ পেতেন।

তৎকালীন ওস্তাদরা দু প্রকারের ছিলেন। এক দল পণ্ডিত ও মৌলানা প্রকৃতির, তবায়েফদের সংসর্গ করা ও মদ্যপান হারাম বলে বিবেচনা করতেন। অন্য দল তবায়েফদের তালিম দিতেন এবং তাদের রোজগারের পয়সায় একটু আধটু ফুর্তি

করতেন, দিশি ও বিলিতি উভয় প্রকারই তাঁদের চলত। আমার দেখা আমার দু ও তিন নম্বর গুরু সহসওয়ানের মুশ্‌তাক হুসেন খাঁ ও আগ্রা ঘরানার আতা হুসেন খাঁ প্রথমোক্ত শ্রেণীতে পড়তেন, সেই সঙ্গে আমাদের ঘরের পণ্ডিত বিলায়েৎ হুসেন খাঁ, তসদ্দুক হুসেন খাঁ ও খাদিম হুসেন খাঁ। উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ শাহী মেজাজের মানুষ ছিলেন, স্কচ ছাড়া কিছু ছুঁতেন না। রোজ সন্ধ্যায় একটি বোতল খোলা হত। খাঁ সাহেব সারা সন্ধ্যায় অর্থাৎ ঘণ্টা চার পাঁচ ধরে চার পাঁচটি ছোট পেগ খেতেন, বাকি বোতলের সদ্‌ব্যবহার করতেন অতিথি অভ্যাগতরা এবং দু একজন চেলা চামুণ্ডা যাদের মধ্যে লখনউএর ক্রিশ্চিয়ান কলেজের ইংরেজির লেকচারার এস. কে. চৌবে ছিলেন, যাঁর ওপর খাঁ সাহেবের বিশেষ নেকনজর ছিল। ইনি ম্যারিস কলেজের পাশ করা সংগীত বিশারদ হলেও ভাতখণ্ডেজী ও শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন না করে গেলাস ছুঁতেন না। খাঁ সাহেব অবশ্য ঐ প্রকারের কটূক্তি বা সমালোচনায় যোগ দেওয়া দূরের কথা, দস্তুরমত অপছন্দ করতেন।

আগ্রা ঘরানার পুরোনো কালের উস্তাদদের মধ্যে নথ্‌থন খাঁ নাম করা শরাবী ছিলেন। আল্লাদিয়া খাঁর উদ্যোগে নথ্‌থন খাঁ কোল্‌হাপুরের দরবারে একবার গান করতে আসেন মহীশূর থেকে। সন্ধ্যাবেলা উনি যথারীতি গোলাপী নেশার আমেজে ছিলেন কিন্তু যখন গান করতে বসেছেন তখন তাঁর তুরীয় অবস্থা। অত বড় উস্তাদ তাঁর কেলেঙ্কারি দেখে সবাই থ। কী গাইবার চেষ্টা করছেন আর গলা দিয়ে কী বের হচ্ছে এ দুয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। শাহু মহারাজ আল্লাদিয়া খাঁকে প্রশ্ন করলেন 'খাঁ সাহেব, ইনি কি সেই ব্যক্তি, সেই উস্তাদ নথ্‌থন খাঁ যাঁর তারিফে আপনি পঞ্চমুখ?' আল্লাদিয়া খাঁ কি আর করেন। আমতা আমতা করে বললেন 'মহারাজ একে এঁর শরীর খারাপ তায় লম্বা সফর করে এসেছেন, এঁকে দিন দুয়েক আরাম করতে দেওয়া উচিত ছিল। আপনি দিন দু'তিন পরে ম্যহ্‌ফিল ডাকুন। নথ্‌থন খাঁ আগ্রা ঘরানার বিরাট নামি উস্তাদ, তাঁর গান শুনে আপনি আনন্দ পাবেন, এ আমি নিশ্চিত বলছি।' অতঃপর তৃতীয় দিন আবার দরবারে আসর বসবে। সন্ধ্যাবেলা নথ্‌থন খাঁ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন দেখে আল্লাদিয়া খাঁ বললেন 'আজ আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়া চলবে না। যদি ভাইসাব আপনি আমার কথা না শোনেন তো মনে রাখবেন আমার বাড়ির দরওয়াজা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।' তখনকার মত নথ্‌থন খাঁ চুপ করে গেলেন কিন্তু মহারাজের প্রাসাদে পৌঁছে নথ্‌থন খাঁ আল্লাদিয়ার হাত ধরে বললেন, 'ভাই এক আধ গেলাসের ব্যবস্থা কর, না হলে আমি একেবারেই গাইতে পারব না।' আল্লাদিয়া খাঁর হুকুমে মেপে গোটা দুই পেগ বেয়ারা নথ্‌থন খাঁকে দিয়ে গেল। সে রাতের গান শুনে সবাই ধন্য ধন্য করল। মহারাজও প্রচুর আহ্লাদ করলেন, আল্লাদিয়া খাঁরও মান

ইজ্জত বাঁচল। ইদানীং কালে পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর জীবনে এবম্প্রকার ঘটনা যে বিরল নয় সে অনেকেই জানেন। এখন অবশ্য তিনি বৃদ্ধাবস্থায় শুধু চা পান করেন, তাতে তাঁর গানের মেজাজে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বরঞ্চ দেখছি গান আরও জমছে। এ ধরণের ঘটনা ইতিপূর্বেও নথ্থন খাঁর জীবনে ঘটেছিল। ওঁর মহীশূরের মহারাজার সভাগায়ক হওয়ার পেছনেও একই গল্প শোনা যায়। মহারাজার আমন্ত্রণে বোম্বাই থেকে লম্বা সফর করে সন্ধ্যায় এসে মহীশূরে পৌঁছন নথ্থন খাঁ। সঙ্গে পরিবারাদি এবং ভক্ত শিষ্য ভাস্কররাও বাখ্লে। পৌঁছেই শরীরের ক্লান্তি দূর করার জন্য খাঁ সাহেব বোতল নিয়ে বসে পড়লেন। ইতিমধ্যে ডাক এসে গেছে দরবার থেকে। খাঁ সাহেব বলে পাঠালেন লম্বা সফরের পর আজ মহারাজার হুকুম তামিল করতে তিনি অপারগ, পরের দিন উনি মহারাজার তলবের ইজ্জৎ রক্ষা করবার চেষ্টা করবেন। কিয়ৎকাল পরে আবার লোকজন এসে হাজির, চামরাজ ওয়াড়িয়ার মহীশূর রাজ খাঁ সাহেবের অনেক নাম ডাক শুনেছেন, আজই তাঁর গান শোনবার জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করছেন, অতএব দয়া করে উস্তাদ তসরীফ নিয়ে চলুন। খাঁ সাহেবের ততক্ষণে গান করা তো দূরের কথা, হাঁটার মত অবস্থা নেই। কিন্তু দু দু'বার দরবার থেকে বুলাওয়া এসেছে, অমান্য করা চরম বেয়াদবির পর্যায়ে পড়ে। অতএব শিষ্য এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ খাঁর স্কন্ধে ভর দিয়ে খাঁ সাহেব টলতে টলতে রাজ দরবারে হাজির হলেন। গানও হলো সেই রকম। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, সুর লাগছে না, আস্থায়ী ভুলে যাচ্ছেন, কেলেঙ্কারির একশেষ। পরের দিন রাজ দরবার থেকে অ্যাসিস্টেন্ট খাজাঞ্চী এসে দুহাজার টাকার একটি থলি ধরিয়ে দিয়ে জানালেন মহারাজা বলেছেন খাঁ সাহেবের আর তাঁর রাজ্যে থাকার প্রয়োজন নেই, উনি বোম্বাই ফিরে যেতে পারেন। খাঁ সাহেব ভাস্করকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন 'কি হয়েছে বল তো, আমার মনে আছে আমি দরবারে বসে কামোদ রাগের আলাপ ধরেছিলাম আর কিছুই তো মনে করতে পারছি না। এও খেয়াল নেই কী করে এই ধরমশালায় ফিরেছি, মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল বোধ হচ্ছে।' ভাস্কর চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে, কী আর জবাব দেবেন? কারও মুখে কথা সরছে না। খানিকক্ষণ পর খাঁ সাহেব বললেন 'ঠিক আছে, আপনি টাকা ফেরত নিয়ে যান আর মহারাজকে তাঁর গুলাম নথ্থন খাঁর তরফ থেকে জানাবেন গতকাল লম্বা সফর ও প্রবল জ্বরের প্রকোপে আমি গান করতে পারিনি, আজ যদি আমাকে ক্ষমা করে পুনরায় ম্যহ্ফিলে বসবার সুযোগ দেন তো আমি যাতে আমার ঘরানার ঝাণ্ডা উঁচু থাকে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব।' সেদিন সন্ধ্যার গান শুনে চামরাজ এতই আনন্দিত হলেন যে তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করলেন আজ থেকে উস্তাদ নথ্থন খাঁ তাঁর সভার প্রধান গায়ক। পুরস্কারও দিলেন বিশ হাজার টাকা। সেই থেকে মহীশূরে আগ্রা ঘরানার প্রতিষ্ঠা অম্লান ছিল

যতদিন গদি ছিল মহীশূররাজের। উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁও 'আফতাব্-এ-মৌসিকী' খেতাব পান এই চামরাজের কাছ থেকেই।

বোম্বাইয়ের নথ্থন খাঁর শরাবের দোকান থেকে বোতল আনার ভার ছিল শিষ্য ভাস্কর রাও বাখ্লের অর্থাৎ পরবর্তীকালের প্রবাদপুরুষ গায়ক ভাস্কর বুয়ার ওপর। একদিন সেই শরাবের দোকানের মালিক পার্শি ভদ্রলোকের কৌতূহল হলো কার জন্য এই ছোকরা রোজ বোতল নিয়ে যায়। ভাস্কর রাওর কাছে যখন জানলেন যে মাল যায় খাঁ সাহেবের জন্য, এই মারাঠি শিষ্যের গুরু যিনি পাক্কা গানার প্রসিদ্ধ উস্তাদ, তখন একদিন সেই পার্শি দোকানদার নথ্থন খাঁর গান শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নথ্থন খাঁকে বলাতে তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'বেশখ, নিয়ে এস তাকে কালই সন্ধ্যাবেলায়।' পরের দিন গান শুনে সে পার্শি কী বুঝল সেই জানে, ওঠবার সময় তিনটি টাকা নজরানা দিয়ে গেল। ভাস্কর রাও তো চটে কাঁই, বলল 'উস্তাদ, আপনার মত হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ কলাকারকে তিন টাকা নজরানা। আমি এর দোকান থেকে আর কোনো দিন আপনার বোতল আনব না, তার জন্য তিন মাইল হেঁটে যদি চৌপাটি অবধি যেতে হয় তাও আচ্ছা।' নথ্থন খাঁ বললেন 'হু! ব্যাটা আমার অনেক পয়সা খেয়েছে এ যাবৎকাল।' তারপর কিয়ৎকাল চুপ থেকে বললেন 'যেতে দাও। যার যেরকম নজর। রাজা মহারাজের নজরে যে গানের কিমৎ দশ বিশ হাজার টাকা, শরাবওয়ালার নিগাহ্এ তার দাম তিন টাকা। নিদেন পক্ষে ব্যাটা একটা বোতল তো দিয়ে যেতে পারত। যাক্! তিন টাকায় তিন-চার দিনের বাজার হয়ে যাবে।'

ভাস্কর রাও বাখ্লের দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই, অসাধারণ গুরুভক্তি, ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে তাঁর উস্তাদ ফয়েজ মুহম্মদ খাঁর জন্য গোশ্ত কিনে পাকানোর গল্প ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে আমার 'কুদ্রত্ রঙ্গিবিরঙ্গী'তে পাওয়া যাবে। ফয়েজ মহম্মদের পর তাঁরই সুপারিশে ভাস্কর নথ্থন খাঁর কাছে যান। এখানেও ওই একই ব্যাপার, চাল নেই চুলো নেই, কপর্দকহীন হিন্দু মারাঠির সন্তান—নথ্থন খাঁ তালিম দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ গা করতেন না। বড় ছেলে মহম্মদ খাঁর গলা ভাল ছিল না, তবে ছোট আবদুল্লা খাঁ খুবই প্রতিভাবান ছিলেন। এদের তালিম দেওয়ার সময়ে নথ্থন খাঁ ভাস্করকে পাঠিয়ে দিতেন বাজারে। নথ্থন খাঁর স্ত্রী দরস পিয়ার বোন জাসিয়া বেগম এই মারাঠি বাচ্চার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং নথ্থন খাঁর অনুপস্থিতিতে একাধিক 'চীজ' এর তালিম দিতেন চুপিচুপি। একবার সন্ধ্যাবেলা ভাস্করকে মাইল দুয়েক দূরে বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে দরবারির তালিম দিচ্ছিলেন ছেলেদের, আগ্রা ঘরের ধ্রুপদ ভাঙা খেয়ালের প্রাচীন বন্দিশ ·

'কানা ঘর আয়ে জনম লিয়ে,
দুর্জনকে দেশ দেশ বা, ভকতনকে ইচ্ছা ভয়ে,

প্রকট হো মহাবলী অতি যোদ্ধা,
কংস পছাড়ো সংহার কিয়ে,
কুদপড়ে যমুনা ভিতর কালীনাগ সাথ লিয়ে, জনম লিয়ে॥'

তালিম শেষ হতে হতে বেশ রাত হয়ে গেছে, ভাস্করও বাজার থেকে ফিরে এসেছে, খাঁ সাহেব বেগমকে বললেন 'খাবার সময় হয়ে গেছে রোটি পাকাও।' উত্তরে জাসিয়া বেগম জানালেন 'আজ চুলা জ্বালানো হয়নি, কোনো রান্নাই হয়নি, হবেও না। আমার ছেলে ভাস্করকে যতক্ষণ খাস তালিম দেওয়া না হবে, ততক্ষণ চুলা জ্বলবে না।'

এই ভাস্করই ধীরে ধীরে খাঁ সাহেবের এত প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে যে উনি বলতেন, 'ভাস্কর হমারা বেটা হ্যায়, মহম্মদ, আবদুল্লা ঔর বিলায়েৎ মেরা আওলাদ।' অর্থাৎ ভাস্কর আমার প্রিয় পুত্র আর মহম্মদ আবদুল্লা এবং বিলায়েৎ আমার সন্তান।' মাঝে কিছুদিন ভাস্কর যখন একটু আধটু বাইরে গান করতে শুরু করে তখন গিরগাঁওতে এক চাওলে ঘর ভাড়া করে থাকত, খাঁ সাহেব তাঁর বোতল টোতল নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাস্করকে তালিম দিতে যেতেন। একবার বাড়িওয়ালা গানের আওয়াজ পেয়ে এসে হাজির, ভাস্কর তখন বোতল সরাতে ব্যস্ত। খাঁ সাহেব ইমন কল্যাণে 'মুকুট পর বারি যাউ নাগর নন্দা' গাইছেন। বাড়িওয়ালা কিছু কালোয়াতি গানবাজনার লাইনের লোক নয়, সে খাঁ সাহেবের গান আর ভাস্করের সাথ সঙ্গত শুনে এতই মুগ্ধ হয়ে গেল যে ঘণ্টা দুয়েক পরে ওঠবার সময়ে হাত জোড় করে বলল, 'জনম ভর পুজো আর্চা নিয়ে আছি কিন্তু খাঁ সাহেব আপনার কৃপায়, আপনার এই অপূর্ব সংগীতের মধ্যে দিয়ে পরমেশ্বরের আসল রূপ আজ আমার দর্শন হলো।'

নথ্থন খাঁ মারা যাবার সময়ে সন্তান-সন্ততিকে উপদেশ দিয়ে যান 'ভাস্কর রাওকে বড় ভাইয়ের মত মান্য করবে', আর ভাস্করকে বলেন 'তুমি এদের দেখ —ভাল কোরো, ছোট ছেলে বিলায়েৎ হুসেনকে তালিম দিও। নথ্থন খাঁ চলে যাচ্ছে কিন্তু তার গায়কি তোমার গলায় জিন্দা থাকবে।' ভাস্কর ধারবাড়ে বাড়ি করে জসিয়া বেগম আর তাঁর সন্তানদের সেখানে থাকার ব্যবস্থা করেন। গোরেগাঁওর বাড়িতে যখন নথ্থন খাঁর ছেলেরা আসতেন তখন ভাস্কর বুয়া তাদের বারান্দায় খেতে দিয়ে নিজে হাতে এঁটো বাসন মাজতেন। বিলায়েৎ হুসেনকে তালিম দিতেন প্রায়ই বোম্বাইয়ে নিয়ে এসে এবং স্যাণ্ডহার্স্ট রোডে বিষ্ণু দিগম্বরের গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ে বিলায়েৎ হুসেন খাঁর প্রথম আসর অর্থাৎ গুণিজনমহলে বউনি করান ভাস্কর বুয়া। ওঁর শিষ্যরা, বিশেষ করে বিলায়েৎ হুসেন একবার প্রশ্ন করেন 'এক একটা তান, এক একটা পাল্টা আপনি পঞ্চাশ ষাট বার করে সাধান কেন? গলায় উঠে যাওয়ার পরও আপনার মন ওঠে না, আপনি বার বার সেই তান পাল্টা

রটতে বলেন।' ভাস্কর বুয়া কিছু জবাব না দিয়ে শিষ্যদের নিয়ে বোম্বাইয়ের ভিণ্ডিবাজারে একটি পুরোনো বাড়িতে নিয়ে গেলেন একদিন। বাড়িতে ঢুকেই একটি অপ্রশস্ত উঠোন, সেইখানে শিষ্যদের বসতে বললেন। ভেতরে একজন রেয়াজ করছেন 'ভূপালী'র পাল্‌টা। একই পাল্‌টা, বেশ শক্ত পাল্‌টাই, রেয়াজ করে যাচ্ছে দশবার, বিশবার, পঞ্চাশ, একশ বার। আধঘন্টার পর সেই পাল্‌টার মধ্যে যা গায়ক অবলীলাক্রমে করছিলেন তাতে ক্রমশ গোলাই এল, এল সুরের চমক। যে তান পাল্‌টা এতক্ষণ মনে হচ্ছিল মেকানিকাল, নিছক গলাবাজি, ধীরে ধীরে তার সৌন্দর্য প্রকট হয়ে উঠল, মনে হতে লাগল আহা! তান যদি করতে হয় এই প্রকার সাবলীলতা ও সুরিলাপনের সঙ্গে করাই উচিত। এইবার ভাস্কর বুয়া উঠলেন এবং ভেজানো দরজায় ঠক্‌ঠক্‌ করলেন। ভেতর থেকে এক উস্তাদ বের হলেন, প্রচণ্ড কালো, বিরাট গোঁফ, খালি গা, পরনে লুঙ্গি। ভাস্কর বুয়া বললেন, 'খাঁ সাহেব, আপনার দর্শনের জন্য এসেছি। আমার এই শাগীর্দের অনেক কপাল খুশ্‌ কিসমৎ, তারা শুধু উস্তাদ কালে খাঁর দর্শনই পেল না, বাইরে বসে তাঁর রেয়াজও শুনতে পেল।' এই কালে খাঁই বড়ে গুলাম আলি খাঁর চাচা ও গুরু। এঁর গানের সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যাবে অমিয়নাথ সান্যালের 'স্মৃতির অতলে' পুস্তকে।

কথা হচ্ছিল বহ্‌রাম খাঁ ও ঘগ্‌গে খুদা বখ্‌শের—এসে পড়লাম নথ্‌থন খাঁ প্রসঙ্গে যিনি খুদা বখ্‌শের বড় ভাই জঙ্গু খাঁর নাতি এবং খুদা বখ্‌শের শিষ্য ও ভাইপো উস্তাদ শের খাঁর ছেলে। বহ্‌রাম খাঁর অভ্যাস ছিল সব সময়ে লোকেদের পেছনে লাগা, বিশেষত টোপি বদল ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর খুনসুটির গল্প একাধিক। ঘুরে ফিরে তিনি বলতেন 'ভাই খুদা বখ্‌শ, তোমার আর রীতকা গানা শেখবার সুযোগ হল না, এবার আমার কাছে গাণ্ডা বাঁধাও তবে যদি কিছু হয়। খেয়ালগান কি কোনো গান? যেমন তার কথা তেমনি তাঁর অশাস্ত্রীয় স্বরপ্রয়োগ। আর তোমাদের আগ্রা ঘরানার ধ্রুপদ ধামার? কোথায় লাগে নৌহরবাণী আমাদের ডাগুরবাণীর সিলসিলার কাছে? নাঃ তোর ভাই আর গান হলো না এ জন্মে।'

একদিন খুদা বখ্‌শ এক আসরে এমনই সুর লাগালেন যে অন্যান্য শ্রোতাদের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি, স্বয়ং বহ্‌রাম খাঁর চোখেও জলে এসে গেল। গান শেষ হলে মৃদু হেসে ঘগ্‌গে খুদা বখ্‌শ জিজ্ঞেস করলেন 'বহ্‌রাম ভাই, তোমার তো ধারণা এ জন্মে আমার আর গান হলো না, তা তুমি চোখে রুমাল দিয়ে বসে কেন?'

'সে দুঃখেই তো কাঁদছি ভায়া,' বহ্‌রাম খাঁ বললেন 'এত খাটলি, সারাটা জীবন মেহনত করলি কিন্তু গান আর তোর দ্বারা হলো না। এ কত বড় আফশোসের কথা।'

আল্লাদিয়া খাঁ তাঁর স্মৃতিচারণে তাঁর যুবা বয়সের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একদিন বড়ে মুবারক আলি খাঁর বাড়ি গেছেন উনি আরও দু চারজনের সঙ্গে। গিয়ে দেখেন বহ্‌রাম খাঁ, ঘগ্‌গে খুদা বখ্‌শ, মহম্মদ আলি ও খয়রাত আলি খাঁ সবাই বসে। মুবারক আলি চারপাইয়ের ওপর, অন্যরা পাশেই আর একটি খাটিয়ায়, ছেলেছোকরারা অনতিদূরে 'দরী'র ওপর বসলেন। আগেই বলেছি বহ্‌রাম খাঁর ব্যায়রাম ছিল সকলের পেছনে লাগার, সাধারণত ওঁর টোপি বদল ভাই খুদা বখ্‌শের পেছনেই বেশি। এদিন উনি ঘগ্‌গেকে দিয়ে শুরু করে খেয়ালিয়াদের নিয়ে পড়লেন, বিশেষত গোয়ালিয়রিদের খেয়াল নিয়ে। 'এই যে খুদা বখ্‌শ, আচ্ছা খাসা নৌহরবাণী ধ্রুপদের তালিম পেয়ে জনানাদের মত গোয়ালিয়রের খেয়াল গাইছে—এতে সে নিজের আগ্রা ঘরানার নাম ডোবাল না তো কি? খেয়ালিয়ারা তো সব বেসুরো, গলা দিয়ে ফ্যারফেরে তান করে। আর গানের ভাষা কী! ওই মেরে ইয়ে লগি, উই মেরি উও লগি। এই তো মেয়েলি কথা আর গান তোমাদের খেয়ালিয়াদের।' বড়ে মুবারক আলি খেপে গিয়ে নমাজের ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে এমনই সাংঘাতিক এক গমক তান নিলেন যে চারপাই ভেঙে পড়ল। দড়ির জালে আটকা পড়া খাঁ সাহেবকে উদ্ধার করার পর ওই আধশোয়া অবস্থায় বহ্‌রাম খাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে মুরাবক আলি বললেন 'হিন্দুস্থানের সব তা বড় তা বড় ধ্রুপদীয়াদের একঠ্‌ঠা করে আমার কাছে নিয়ে এস, এমন গমক তান নিতে গেলে তাদের মুখে রক্ত উঠে আসবে।'

তখনকার দিনে হলক ও গমক তানের বড় কদর ছিল, আর খেয়াল গাইয়েরাও ছিলেন আস্‌লি ঘি দুধ খাওয়া বিরাট বিরাট গোঁফজোড়ার মালিক বাঘা বাঘা গাইয়ে। গোয়ালিয়র গায়কি তখন জনানাদের এখতিয়ারে আসেনি, তাঁদের আবির্ভাব হলো আগ্রা ঘরানার ওস্তাদদের কাছে তালিম পাওয়ার পর, যথা শের খাঁ ও দরস পিয়া অর্থাৎ মেহবুব খাঁর শিষ্যা জোহরাবাই, কল্লন খাঁর শিষ্যা ফিরদৌসী বাই আগ্রেওয়ালি ও বিব্বোবাই জয়পুরওয়ালি ইত্যাদি। গোয়ালিয়র ঘরানার প্রবাদ প্রতিম গায়ক হদ্দু ও হস্‌সু খাঁ এই মর্দানা তানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর একটি লেখায় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এই গল্পটির উল্লেখ করেছেন।

'গল্প বলার ক্ষমতার দিক থেকে আমি যত লোক দেখেছি তার মধ্যে তিনি ছিলেন অসামান্য। ...কখনো তিনি আমাদের শোনাতেন গোয়ালিয়রের বুড়ো বুড়ো ওস্তাদদের কাছে যে সব গল্প শুনেছেন তার কথা। তাঁরা সবাই নাম করতেন মাধোজী সিন্ধিয়ার। একবার গান গাইছেন হদ্দু খাঁ। মাধোজী আস্তে আস্তে বললেন, 'ওস্তাদজী, আপনি কি আমার পিলখানা থেকে হাতি বের করে আনতে পারেন? [তানসেন নাকি নিয়মিত এই কর্ম করতেন] ওস্তাদ জানালেন 'হাঁ হুজুর।' আর

যেমন বলা, তেমন কাজ। হদ্দু খাঁ কী একটা জানি রাগ ধরলেন—আমার এখন মনে নেই কি সে রাগ—অমনি হাতিরা পিলখানা থেকে পিলপিল করে চলে আসতে লাগল দরবারে। আর তারপর শুরু হলো তাদের নৃত্য।' আমরা তো গল্প শুনে হাসিতে ফেটে পড়লাম। ভাতখণ্ডেজী বললেন এইখানেই কিন্তু গল্পের শেষ নয়। কারণ কী করে এখন হাতিদের ফেরত পাঠানো যায়। তখন হদ্দু খাঁর ভাই হস্‌সু খাঁ ধরলেন কেদারা। দাদা তাঁকে বাৎলে দিলেন 'ভায়া, উল্টো তান লাগাও'। দুই ভাই তাই করলেন। হাতিরাও আবার পিলপিল করে ফিরে গেল পিলখানায়।'

ভাতখণ্ডেজী এ গল্প ইংরেজিতে বলেননি—তিনি বলেছিলেন তাঁর মারাঠিতে। মস্ত সে গল্প, তার প্রতি সুবিচার করাও আমার অসাধ্য। এ কাহিনীর আবার পাঠান্তরও আছে নানা রকম।'[১]

আর একটি আমার প্রিয় গল্প যা বারবার শুনেও শ্রোতারা আবার 'ইরশাদ, ইরশাদ' বলে শুনতে চেয়েছেন। অন্যত্র আমি লিখেছি, তবে বুড়ো বয়সে স্মরণ থাকে না কবে ও কোথায়। হদ্দু হস্‌সু ও নথ্‌থু খাঁ তিন ভাই তাঁদের ঠাকুরদা নথ্‌থন পীর বখ্‌শের দেওয়া তালিমের গায়কিই গাইতেন। এই সময়ে নথ্‌থন পীর বখ্‌শের খুড়তুতো ভাই শক্‌কর খাঁর ছেলে রেওয়ার সভাগায়ক বড়ে মহম্মদ খাঁ গোয়ালিয়রের দরবারে এসে হাজির। এঁরই জারজ সন্তান পূর্বোক্ত বড়ে মুবারক আলি খাঁ সাহেব। বড়ে মহম্মদ খাঁর ধ্রুপদ ও কাওয়ালির ঢঙে মেলানো মধ্য ও দ্রুত লয়ের খেয়াল শুনে দুই ভাই একেবারে মুগ্ধ, মহারাজেরও খুব ভাল লেগেছিল, তা সোজাসুজি তিন ভাইকে মহম্মদ খাঁর শাগীর্দ করে দিলেই ল্যাটা চুকে যেত। তা না, পর্দার পেছনে বসে ভাইয়েরা রোজ মহম্মদ খাঁর গান ও তানের ফিরৎ মখ্‌শো করলেন ঝাড়া দুটি বছর। মহারাজ ভেবেছিলেন এইবার হদ্দু হস্‌সুর গান মহম্মদ খাঁকে শুনিয়ে চমকে দেবেন, এর যে একটা নৈতিক দিক আছে তা তাঁর খেয়াল হয়নি। যা হোক, ছোক্‌রা ওস্তাদদের গান ও মেহনতের যখন প্রচুর তারিফ হলো আসরে, তখন মহারাজা শেষমেশ সামলালেন সভায় ঘোষণা করে যে এঁরা ঠাকুরদার কাছে তালিম পেলেও বড়ে মহম্মদ খাঁর সুন্নী শাগীর্দ এবং পরের দিন এঁদের গাণ্ডা বাঁধা হবে। মহম্মদ খাঁ আর কি করবেন, অগত্যা সর্বসমক্ষে নাড়া বেঁধে দিলেন বটে কিন্তু মনে মনে গোয়ালিয়র রাজকে ক্ষমা করেননি। উনি রেওয়ার আশ্রয়ে চলে গেলেন অব্যবহিত পরে। সিন্ধিয়া অনেক চেষ্টা করেও মহম্মদ খাঁকে ভাঙিয়ে আনতে পারেননি।

নাড়া বাঁধার পর একটি আসরে দুই ভাই গাইছেন মিঞা মলহার উস্তাদের

১. দ্র. "সংগীতস্মৃতি" : 'ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী', ৩য় খণ্ড ১ম সম্ভার, পৃ. ২১১, দে'জ পাবলিশিং।

সামনে। যেমন গম্ভীর রাগ, তেমনি সে রাগের ভারী ভারী তান একের পর এক নিচ্ছেন দুই ভাই। এমন সময় হস্‌সু খাঁ দাদার একটি তানের জবাবে ভয়ংকর সেই হাথী চিংঘাড় তান নিলেন যা শুনে হাতি পিলখানা থেকে বেরিয়ে আসে। এমনই সে সাংঘাতিক তান যে মাঝপথে হস্‌সু খাঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এল। ঠাকুরদা নথ্থন পীর বখ্‌শ কাছেই বসে ছিলেন। উঠে এসে নিজের শাল দিয়ে নাতির মুখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'বেটা, মরনা হি হ্যায় তো তান পুরি করকে মরো।'

আল্লাদিয়া খাঁ হদ্দু খাঁর গান শুনেছিলেন জয়পুরে—সেই প্রসঙ্গে এবার আসি। হায়দর বখ্‌শের বাড়ি একদিন আসর বসেছে হদ্দু খাঁর। সবাইয়ের মুখে সুভানাল্লা, মরহব্বা ধ্বনিতে সভা মুখরিত। একটা জটিল ফিক্‌রা নিতে সবাই সমস্বরে কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ করে উঠল। উপস্থিত ছিলেন দিল্লির তানরস খাঁ এবং বড়ে মুবারক আলি খাঁ। তাঁদের দিকে তাকিয়ে হদ্দু খাঁ বলে উঠলেন 'চার ঘড়ে রসকে ভরে। চোর তাকে লে না সকে।' তানরস খাঁ ও মুবারক আলি উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে জানতে চাইলেন এর মানে কি। হদ্দু খাঁ বেজায় আত্মম্ভরী মানুষ, মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'ব্যস্‌ যো হমকো কহনা থা বহ্‌ হমনে কহ দিয়া, জবাব দেনা হো তো ময়দানমে আ যাও।' অতঃপর আস্তিন গুটিয়ে হদ্দু খাঁর দু পাশে এসে বসলেন তানরস খাঁ ও বড়ে মুবারক আলি খাঁ। গোবিন্দরাও টেম্বের আল্লাদিয়া খাঁর জীবনীতে লেখক লিখছেন, ভাবতেও রোমাঞ্চ হয় হিন্দুস্থানের তিন দিকপাল গায়ক একত্র বসে গাইছেন। আল্লাদিয়া খাঁ বলেছেন, সে যেন তিন তেজি জংলি মুর্গার লড়াই। হদ্দু খাঁর যেমন পাল্‌লাদার আওয়াজ, তেমনই ওজনদার তান তবে রাগদারির ব্যাপারে দু একজন প্রকৃত সমঝদার ভুরু তুলেছিলেন। তানরস খাঁর গানে শাস্ত্রীয় সৌন্দর্য ছিল। আর বড়ে মুবারক আলি খাঁর তান। সে যেন রেশমি সুতা দিয়ে জাল বুনে যাচ্ছেন, যখন মনে হচ্ছে এ জাল কেটে উনি বের হতে পারবেন না, তখনই একটি আশ্চর্য নিখুঁত ফিরৎ নিয়ে উনি শমে আসছেন। সে যেন এক নতুন দুনিয়ার সঙ্গে যুবক আল্লাদিয়ার সে দিন পরিচয় ঘটল আর সে প্রভাব শেষদিন পর্যন্ত আল্লাদিয়া খাঁর গায়কিতে পাওয়া গেছে। এর সামান্য নমুনা মাত্র আমরা পাই মল্লিকার্জুন মনসুর ও কেসরবাইয়ের তানকর্তবে।

দঙ্গল চল্‌ল ঘণ্টাখানেক, কেউই হার মানলেন না। অবশেষে হায়দর বখ্‌শ উঠে হাত জোড় করে বললেন 'খুদাকে ওয়াস্তে অব্‌ খতম করো, বহুৎ হো গয়া, অব্‌ খানা ঠাণ্ডা হো রহা হৈ।' ভয় ছিল হদ্দু খাঁর ওই বেআদবির পর এ গানের লড়াই মারদাঙ্গায় পরিণত হবে, হলো হাসি মশকরা ও কোলাকুলিতে।

আল্লাদিয়া খাঁ বিরাট ধ্রুপদি আহ্‌মদ খাঁর সন্তান, কাকা জাহাঙ্গীর খাঁও ধ্রুপদি

এবং যৌবনে আল্লাদিয়া খাঁ ধ্রুপদ গায়ক হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অতএব ডাগর ব্রাদার্সের বৃদ্ধ পিতামহ উস্তাদ বহ্‌রাম খাঁ সম্পর্কে ওঁর প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল। উনি বলতেন মুসলমান উস্তাদদের মধ্যে পণ্ডিত আখ্যা যদি কাউকে দেওয়া যায় তিনি বহ্‌রাম খান্‌জী। উনি কাশীতে বারো বছর সংস্কৃত শিখে সংগীতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তখনকার দিনে অব্রাহ্মণের সংস্কৃত শেখার অধিকার কাশীতে ছিল না। উনি পৈতে ধারণ করে কপালে চন্দনের প্রলেপ লাগিয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করতেন কিন্তু মন্দিরে যেতেন না। এইভাবে মতঙ্গ ভরত শার্ঙ্গদেব ইত্যাদি ঋষিতুল্য সংগীত শাস্ত্রকারদের প্রাচীন সংগীত বিষয়ক শাস্ত্রাদি সংস্কৃতজ্ঞ গুরুর সাহায্যে বারো বছর ধরে অধ্যয়ন করে কাশী ত্যাগ করার সময় উনি মুসলমান বলে নিজের পরিচয় দেন এবং গুরুর পা ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এর জন্য ওঁকে গুরুর ব্রহ্মশাপ পেতে হয়নি। উপরন্তু গুরু ওঁকে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যেন বহ্‌রাম খাঁ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গায়কদের মধ্যে আসন নিতে পারে।

বহ্‌রাম খানের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর উদারতা। তখনকার কালে নিজের খানদানের বাইরে ধ্রুপদিরা কাউকে তালিম দিতেন না। আল্লাদিয়া খাঁর সময়ের ডাগুর, খাণ্ডার, নৌহর এবং গোবরহর (গৌরহর) বাণী প্রচলিত ছিল এবং এক ঘরানার বাণী যাতে অন্য ঘরের শিষ্য না নিতে পারে সে বিষয়ে উস্তাদরা দস্তুরমত সচেতন ছিলেন। খাণ্ডারবাণীর গায়ক নিয়ামৎ খাঁর নাতি ও দুল্‌হে খাঁর পুত্র হায়দার বখ্‌শ বড় উস্তাদ ছিলেন। এমন কোনো রাগ নেই যার দুশো ধ্রুপদের বন্দিশ ওঁর আয়ত্তে ছিল না। বহ্‌রম খাঁ ছিলেন ঢাটি সম্প্রদায়ের লোক। উনি হায়দর বখ্‌শ এবং আলমসেনজীকে অনুরোধ করেন ওঁর নাতি জাকিরুদ্দিন ও আল্লাবন্দেকে শেখাতে। উপরোক্ত দুজন উস্তাদদের জাতের ও বংশ গৌরব ছিল।* কিন্তু তাঁরা খুশি হয়ে ওঁর নাতিদের তালিম দেন। শুধু তাই নয়, বহ্‌রাম খাঁ খানদানি ঘরের শিষ্যর বাইরেও শেখাতে কসুর করেননি, এমনকি বেশ কিছু জোলাদের সন্তানকে একত্র করে সরগমের এমনই তালিম দিয়েছিলেন যে কিছুকালের মধ্যেই তারা শক্ত রাগের সরগম অনায়াসে করতে পারত এবং খাঁ সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় ভাল ভাল আসরে তাদের গান হত। অনেকের মত ধ্রুপদের আলাপে সর্‌গম করা উচিত নয় এবং এ কর্ম ঐতিহ্যবিরুদ্ধ। তাঁরা শুনলে আশ্চর্য

* আলমসেন সেনী ঘরানার। হায়দর বখ্‌শ তালিম দিয়েছিলেন খাণ্ডারবাণীর। দিলীপকুমার রায়ের 'ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা'তে আছে লখনউ কন্‌ফারেন্‌সে আল্লাবন্দে খাঁ ও তাঁর বড় ভাই জাকিরুদ্দিন খাঁ খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ গাইছেন। এঁদেরই নাতিরা ডাগর ব্রাদার্স নামে প্রসিদ্ধ হন। তাহলে প্রশ্ন: ডাগরবাণী কী এবং তার তালিম এঁরা পেলেন কোথা থেকে? —লেখক।

হবেন যে সর্‌গমের সিলসিলা ধ্রুপদে বহু প্রাচীন এবং বহ্‌রাম খাঁ এবং তাঁর ঘরের ও পরিবারের উস্তাদরা সর্‌গমের দ্বারা অত্যন্ত চাকচিক্যময় স্বরসমূহের কমপোজিশন দিয়ে তাঁদের আলাপ এমন কি ধ্রুপদের নিবদ্ধ সংগীতকেও অলংকৃত করতেন—এ কথা স্বয়ং আল্লাদিয়া খাঁ বলে গেছেন। খেয়ালে আমার হিসেবমত সর্‌গম অষ্টাঙ্গের মধ্যে পড়ে না। এটিকে নবম অঙ্গ বলা যেতে পারে এবং এর প্রয়োগ প্রাচীন ঘরানাগুলিতে প্রায় পাওয়াই যায় না। যথা, গোয়ালিয়রে পটবর্ধন ও নারায়ণ রাও ব্যাস ভিন্ন কেউ সর্‌গম করেননি। আগ্রায় গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে জোহরাবাইয়ের রেকর্ডে এর নমুনা আছে, ফৈয়াজ খাঁ কদাচিৎ দ্রুত আলাপে গমকযুক্ত সর্‌গম করতেন, আর কোনো আগ্রা ঘরানার উস্তাদদের কাছে আমি শুনিনি। সবচেয়ে বড় কথা আল্লাদিয়া খাঁ নিজে সর্‌গম দিয়ে বেশ কিছু শক্ত বন্দিশ আড়াচৌতাল, চৌতাল এবং সুলতালে রচনা করেছিলেন কিন্তু খেয়ালে নয়, আর ওঁর প্রবর্তিত জয়পুর গায়কিতে কেউ সর্‌গম করেন না। ইদানীং পাতিয়ালা ও কিরানায় আমীর খাঁর গায়কিতে সর্‌গমের প্রাচুর্য পেয়েছি আর পূর্বাঞ্চলে এখন দেখছি খেয়ালের অন্যান্য অঙ্গ থাকুক আর নাই থাকুক সর্‌গমের উৎপাত কিঞ্চিদধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আল্লাদিয়া খাঁ তাঁর নাতির কাছে স্মৃতিচারণে তখনকার একাধিক ওস্তাদদের নাম করেছেন যাঁর মধ্যে ওঁর শোনা শ্রেষ্ঠ খেয়ালিয়া অবশ্যই বড়ে মুবারক আলি খাঁ। আর একজনের নাম করেছেন যিনি আল্লাদিয়া খাঁর পৈতৃক ভিটে যে আতরৌলি শহরের সেখানকারই উস্তাদ এবং সম্পর্কে তিনি আল্লাদিয়ার প্রপিতামহ—নাম তাঁর মনতোল খাঁ। একদা আলওয়ারের মহারাজা বন্নে সিংজী তাঁর দরবারে বসে গায়কদের প্রশ্ন করেন 'আপনাদের এ যাবৎকাল কোনো এমন গায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে যিনি গেয়ে শ্রোতার চক্ষে জল আনতে পারেন আর সে কোনোক্রমেই রোধ করা যায় না?' উত্তরে দরবারের কিছু কসবি সমঝদার বলেন 'মহারাজ, একজনেরই নাম করতে পারি তিনি আতরৌলির মনতোল খাঁ। তবে তিনি সাধু মানুষ, নিজের মনে থাকেন—দরবারে এসে তাঁর গান শোনাবেন কি না বলতে পারছি না। শুনেছি তিনি যোগ ব্যায়াম করেন, গান করেন ও গান শেখান কতিপয় শাগীর্দদের। এর বাইরে তাঁর কোনো জগৎ নেই। ওঁর পুত্র সন্তান করিম বখ্‌শের জন্মের পর উনি স্ত্রীকে বলেন 'এবার তোমার দেখভাল করবার লোক একজন হলো, তোমার আর আমাকে প্রয়োজন নেই, আমি চললাম, আমার জীবন এখন ভিন্ন খাতে বইবে।' এই বলে উনি গেরুয়া ধারণ করলেন, কদাচ ওঁকে বাড়ির বাইরে দেখা যায়, সাধুদের মত মাথায় কোনো টুপি বা পাগড়ি চড়ান না, না পরেন পায়ে জুতো। স্ত্রীর মুখ উনি সেই থেকে দেখেন নি, দেখলেন যখন তাঁর জানাজা (শবযাত্রা) বের হল। এমন গায়ককে দরবারে নিয়ে আসা সহজ

কর্ম নয়।'

একদিন দুদিন নয় তিন বছর ধরে আল্ওয়ারের রাজার দূত নিয়মিত মনতোল খাঁর বাড়িতে হানা দিল। এক দিন ওঁর বড় ছেলে জহুর খাঁ মনে মনে এক ফন্দি আঁটলেন। সন্ধ্যাবেলা মনতোল খাঁর কাছে গিয়ে বললেন 'আপনার বাগানে কেমন ফুলের সমারোহ একদিনও কি বেরিয়ে আপনি দেখেছেন? দেখতে চান তো বাইরে আসুন।' মনতোল খাঁ ঘর থেকে তিন বছর পরে বেরিয়ে দেখেন আলওয়ারের রাজার পাইক বরকন্দাজ ও আমলারা দাঁড়িয়ে। অবাক হয়ে মনতোল খাঁ প্রশ্ন করলেন 'এরা কারা?' জহুর খাঁ বললেন 'আব্বাজান, আপনার হয়তো মনে আছে তিন বছর আগে এদের সঙ্গে আলওয়ারের মহারাজার দূত এসেছিলেন আপনাকে তাঁদের দরবারে গান করার আমন্ত্রণ নিয়ে। আপনি তখন বলেছিলেন এখন নয়, পরে অন্য কোনো সময়ে যেতে পারি কি না আমি ভেবে দেখব। সেই থেকে এঁরা তাঁবু খাটিয়ে এইখানেই বসবাস করছে। দয়া করে এবার মহারাজার আমন্ত্রণ আপনি রক্ষা করুন।' মনতোল ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন 'তা কি করে হয়, আমার রেয়াজ, আমার শাগীর্দদের ছেড়ে আমি যাব কি করে, রাজারাজড়ার দরবারে মুজরো করার জন্য আমি সংগীত শিক্ষা করিনি। মহারাজকে বোলো আমায় মাফ করতে।' বেগতিক দেখে জহুর খাঁ আর এক চাল চাললেন। বললেন 'আব্বা, তিন বছর ধরে এরা এখানে রয়েছে এবং আমাদের সংসারের সব খরচ-খরচা এরাই বহন করছে, এখন যদি আপনি এদের মুখের ওপর না বলে দেন তো এরা আমাদের সবাইকে গ্রেফতার করবে।' সাধুসন্তরাও গ্রেফতারের ভয় করেন, অতএব মনতোল খাঁ নিমরাজি হয়ে বললেন 'ঠিক আছে তুমি আর করিম বখ্শ আমার সঙ্গে যাবে, দেখি কবে আমরা রওনা হতে পারি।'

মহারাজার দরবারে গোড়ায় ছোকরা করিম বখ্শের গান শুরু হলো। খানিকক্ষণ পরেই মনতোল খাঁ বললেন 'কী করছ, এভাবে কি এ রাগ গাওয়া হয়?' এই বলে তিনি বসে গান শুরু করলেন। ঘণ্টা তিনেক পরে যখন তাঁর গান শেষ হলো তখন একটি লোকও ছিল না দরবারে যার চোখের পাতা শুষ্ক। আর স্বয়ং মহারাজা তো হাপুসটি কাঁদতে কাঁদতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে এলিয়ে পড়েছেন সিংহাসনে। জ্ঞান ফিরলে বললেন, 'আপনি মানুষ নন, আপনি পীর। বলুন আপনি কী চান, আপনার মত কলাকারকে আমার অদেয় কিছু নেই। উত্তরে মনতোল খাঁ বললেন, 'মহারাজ, আপনার মৌসিকি কলাকারদের প্রতি নওয়াজী শ্রদ্ধা ভালবাসা সর্বজনবিদিত। আপনার কাছে আমার একটি মাত্র প্রার্থনা, দয়া করে হুঁজুর আমাকে আর কখনও ডাকবেন না।'

মহারাজা মনতোল খাঁকে বিশ হাজার টাকা ইনাম দিয়েছিলেন যা আজকের বিশ লক্ষ টাকার সমান। মনতোল খাঁর টাকা পয়সার লোভ ছিল না। তিনি বলতেন

বিষয় সম্পত্তি সব অনর্থের মূল, আমি আমার সন্তানদের জন্য রেখে যেতে চাই এক একটি তানপুরা। বাকি সব দান খয়রাতে গিয়েছিল।

সেকালের রাজা-মহারাজারা কলাকারদের কী প্রকার সম্মান করতেন এবং দুহাতে তাদের কোঁচড় ভরে দিতেন তার একাধিক উল্লেখ আল্লাদিয়া খাঁ করেছেন। বিয়ে শাদিতে গোড়ায় তবায়েফদের গান দিয়ে আসর জমানো হত। তার পর বসতেন সেতারি এবং সেতারির পর সুরশৃঙ্গার এবং রবাবিরা। শেষে বসতেন গাওয়াইয়ারা, তাঁদের মধ্যে ধ্রুপদিরা গোড়ায় এবং খেয়ালিয়ারা সর্বশেষে। ঢাঢি সম্প্রদায়ের গায়কদের সংগীতের বিষয়বস্তু নবাব-বাদশা-রাজা-মহারাজাদের স্তুতি। ডাগরদের পূর্বপুরুষ বহ্‌রাম খাঁ এই সম্প্রদায়ের লোক। এঁদের সভায় আর পাঁচজন উস্তাদদের পাশেই স্থান হত। পরবর্তীকালে অবশ্য ঢাঢিরা সারেঙ্গি ও তবলা ধরেন এবং তবায়েফদের অনুগ্রহে জীবন ধারণ করতেন। মিরাসিরা ছিলেন এঁদেরও সমাজে এক ধাপ নীচে এঁদের কাজ ছিল বিয়ে শাদিতে খাটাখাটনি করা এবং এঁদের ঘরের স্ত্রীলোকরা সেসব আসরে গান করতেন। তবায়েফ এবং মিরাসি ভিন্ন কোনো ওস্তাদঘরের জেনানারা সর্বসমক্ষে কখনও গান করতেন না। বেশির ভাগ মুসলমান তবলচি ও সারেঙ্গি বাজিয়ে এই ঢাঢি ও মিরাসি সম্প্রদায়ের মানুষ।

রাজা-মহারাজাদের বা মহারানী ও তাঁদের সন্তানসন্ততিদের জন্মদিন উপলক্ষে বড় বড় আসর বসত। যোধপুরের মহারাজা যশবন্ত সিংহের আসরের উল্লেখ করেছেন আল্লাদিয়া খাঁ। আসরের এক পাশে রহিসদের বসার জায়গা হত, পাশে থাকত তাঁদের টাকার থলি যা মওকা মাফিক সুভানাল্লা, কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ ধ্বনির সঙ্গে ছুঁড়ে দেওয়া হত। এক এক জন উস্তাদ এক এক সন্ধ্যায় বিশ পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ইনাম পেতেন। মহারাজার ভাই কিশোরী সিংজীর প্রাসাদের এক আসরে উস্তাদ নাসির খাঁ গাইছেন। আস্থায়ীর প্রথম কলি 'মোতিয়ন মেহা বরসে'। কিশোরী সিংজীর হুকুমে এক 'তশ্‌তরী' ভর্তি মতি তৎক্ষণাৎ হাজির করা হল। তিনি মুঠো মুঠো কার্পেটের ওপর মোতি বরসাতে লাগলেন। একবার তিনি রাজকোষ থেকে সেনাদের মাসমাইনের বরাদ্দ তিন লাখ টাকা তিনদিনে কুস্তিগীর, তবায়েফ এবং ওস্তাদদের দান খয়রাত করে দেন। কিশোরী সিংজী ছিলেন সেনাধ্যক্ষ অর্থাৎ কমাণ্ডার ইন চীফ্‌। এর কিছুদিন পরই পে-ডে, সেপাই শাস্ত্রীদের মাস মাইনে পাওয়ার তারিখ। কিশোরী সিংজী গভীর চিন্তায় পড়ে কোনো উপায় না খুঁজে পেয়ে শোবার ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিলেন। তিনদিন পরে মহারাজা নিজে এসে হাজির ভাইয়ের হলো কি? কিশোরী সিংজী সজল নয়নে বড় ভাইয়ের হাত দুটি ধরে বললেন 'আমি একটা ঘোরতর অন্যায় করে ফেলেছি দাদা, আমার বাড়িতে অনেক অতিথিরা এসেছিলেন ভিনরাজ থেকে—তাঁদের খাতিরে উৎসব আনন্দ করতে গিয়ে লাখ তিনেক টাকা খরচ করে ফেলেছি। এখন আমি জানি

না সেপাইদের মাস মাইনে কোথা থেকে দেব।' মহারাজা সব শুনে বললেন 'ওঃ এই ব্যাপার! আমি ভাবলাম তোমার বুঝি ঘোরতর কোনো অসুখ বিসুখ করেছে। আগে বলনি কেন? এই সামান্য টাকার জন্য কেউ বিছানা নেয়। নাও, এখন খাবে চল।'

ডাগুরবাণীর বিখ্যাত ধ্রুপদি পিতা-পুত্র শাদি খাঁ ও মুরাদ খাঁর গান শুনে অসম্ভব খুশি হয়ে দতিয়ার মহারাজা তাঁদের নিমন্ত্রণ করেন। তাঁদের বসার জন্য সওয়া লাখ চাঁদির টাকা দিয়ে বসার তখ্‌ত তৈরি করে তার ওপর রেশমি কার্পেট ঢাকা হলো। গানের শেষে সেই সওয়া লাখ টাকা শাদি খাঁকে দান করলেন মহারাজা, সেই সঙ্গে একটি হাতি সে টাকা বয়ে নিয়ে যাবে। বিদায় দেবার সময় মহারাজ বললেন 'খাঁ, সাহেব আপনি আপনার অভিজ্ঞতায় এমন দাতাকর্ণ রাজা কখনও দেখেননি আর দেখবেনও না জেনে রাখুন।' শাদি খাঁ কিছু বললেন না, দতিয়া শহরে অতিথিশালায় যাবার পথে হাতির পিঠ থেকে মুঠো মুঠো চাঁদির টাকা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে গেলেন। শহরে প্রচণ্ড শোরগোল। খবর শুনে খাঁ সাহেবকে তলব করে পাঠালেন মহারাজা। মহারাজার প্রশ্নের উত্তরে উস্তাদ শাদি খাঁ বললেন 'মহারাজ, আপনার মত দানশীল রাজা আমি দেখিনি বটে কিন্তু আমার মত দিলওয়ালা উস্তাদও আপনি গাওয়াইয়াদের মধ্যে পাবেন না।' দতিয়ার মহারাজা খুশি হয়ে আরও দশ হাজার টাকা বখশিস করলেন।

আল্লাদিয়া খাঁর পিতামহ উস্তাদ জহুর খাঁর এক অভিজ্ঞতার কাহিনী দিয়ে আল্লাদিয়া প্রসঙ্গ শেষ করি। একবার উনি আজমীর শরীফ থেকে ফিরছেন যোধপুরে। পথে জঙ্গলে পড়ল, এটি বিখ্যাত ডাকাত ডুঙ্গর সিং-দওহর সিং খুড়ো ভাইপোর রাজ্য। এঁরা রবিনহুডের মত ধনী ব্যক্তিদের ওপর বেছে বেছে হামলা করতেন এবং গরীব দুঃখীদের মধ্যে টাকা বিলোতেন। এঁদের নামে চারণ কবিরা এখনও গান করেন। ডাকাতরা ওঁর ঘোড়া পালকি আটকাতে, জহুর খাঁ মুখ বাড়িয়ে বললেন 'তোমরা কে? আমি যোধপুরের মহারাজা মানসিং-এর প্রধান সভাগায়ক উস্তাদ জহুর খাঁ, আমার লোকজনকে বাধা দিচ্ছ কে তোমরা, কোন সাহসে?' ডুঙ্গর সিং বললেন 'আমার কি ভাগ্য ওস্তাদজী, আপনার খ্যাতি আমাদের কানেও পৌঁছেছে। আপনার আপত্তি না থাকলে আপনার আসর এই জঙ্গলেই আজ রাতে হবে।' ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে শামিয়ানা খাটানো হলো, কার্পেট বিছোনো হলো, তানপুরা ও যন্ত্রপাতি মিশিয়ে জহুর খাঁ ডাকাতদের গান শোনালেন, এবং তারিফও পেলেন প্রচুর। সেই সঙ্গে বেশ কিছু টাকাকড়ি গহনাগাঁটি ডাকাতদের লুটের সামগ্রী। ডুঙ্গর সিং-এর হুকুমে তার সশস্ত্র অনুচরবৃন্দ খাঁ সাহেবকে যোধপুর শহরের প্রান্ত পর্যন্ত সসম্মানে পৌঁছে দিয়ে গেল।

তখনকার রাজা-মহারাজারা শুধু কলাবন্তদের সম্মান ও প্রচুর দক্ষিণা দিতেন

তাই নয়, তাঁরা নিজেরা গানবাজনার চর্চা করতেন এবং বেশির ভাগ সভাগায়করা হতেন তাঁদের গুরু। এই সেদিন পর্যন্ত এর ভুরি ভুরি নিদর্শন আমরাই দেখেছি। মাইহারের রাজা ছিলেন উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর শিষ্য, বরোদার যুবরাজ ফতে সিং রাও গাইকোয়াড়ের গুরু উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, আবার মহিষাদলের রাজা দেবপ্রসাদ গর্গও তাঁর শাগীর্দ। রামপুরের নবাব হামিদ আলি খাঁ ছিলেন তানসেনের বংশধর উজীর খাঁর গাণ্ডাবন্ধ শিষ্য, তাঁর ছেলে নবাব রেজা আলি খাঁ আমার দু নম্বর গুরু উস্তাদ মুশ্‌তাক হুসেনের। এ রকম বহু উদাহরণ দিতে পারি। পৃষ্ঠপোষক নবাব-বাদশারা এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা প্রকৃত সমঝদার ছিলেন এবং নিজেরা গানবাজনায় দক্ষ ছিলেন। এঁদের জায়গা এখন নিয়েছে আই.টি.সি, ডোভার লেন, স্যার শঙ্করলাল ফেস্টিভালের হোতা ডি. সি. এম্. গ্রুপ। আর কসবি, সমঝদার শ্রোতাদের স্থান পূর্ণ করছেন মধ্যবিত্ত সমাজ। আগে উস্তাদদের উদ্দেশ্য ছিল গান বাজনা করে আনন্দ পাওয়া যার ভাগ পেতেন শ্রোতা ও রাজা মহারাজারা। এখনকার মত আগে থেকে দর কষাকষি করবার মত সাহস বা বেআদবি ছিল কল্পনাতীত। এখন সংগীত হয়েছে পণ্যসামগ্রী আর বছর বছর ফাইভ স্টার কলাকারদের প্রাইস্ ট্যাগ্ মূল্যস্ফীতির এক কদম এগিয়ে বাড়তে বাড়তে চলেছে। জেন্টলম্যান্‌স গেম টেস্ট ক্রিকেট আজ ওয়ান ডে ক্রিকেট, শুধু মাঠে ময়দানে নয়, গানের জলসায়ও। ঘোর কলি!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম পরিচ্ছেদে উস্তাদ মুজফ্‌ফর খাঁ ও তারাপদ চক্রবর্তীর গল্প পড়ে কতিপয় পাঠক এবং আমার দু-একজন বন্ধু আরও জানতে চেয়েছেন গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর গুরু মুজফ্‌ফর খাঁ সম্পর্কে। এর জন্য আমায় মহিষাদলের কুমার দেবপ্রসাদ গর্গর শরণ নিতে হচ্ছে। ওঁর ঝুলিতে সংগীতজগতের দিকপালদের সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতা ও গল্প ছিল, তার মধ্যে বেশির ভাগই ওঁর গুরু মুজফ্‌ফর খাঁ ও ফৈয়াজ খাঁ সম্পর্কে। আমি ওঁকে বারবার বলতাম 'আপনি অসাধারণ ভাগ্যবান পুরুষ, এইরকম দুজন মহারথীর তালিম ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছেন। এ ছাড়াও বহু গুণিসংসর্গ করেছেন। আপনার লেখা উচিত।' অবশেষে উনি কলম ধরেন এবং সম্ভবত 'দেশ' পত্রিকার বিনোদন সংখ্যায় ওঁর 'সঙ্গীত সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' নামে একটি প্রবন্ধ বার হয়, সে বোধহয় বছর বিশ বাইশ পূর্বে। খুব কম সংগীতানুরাগীই এই অনবদ্য স্মৃতিচারণটির হদিশ পেয়েছেন এবং যাঁরা তখন পড়েছিলেন তাঁরা হয়তো ভুলে গেছেন। দেবপ্রসাদের নিজের বয়ানে মুজফ্‌ফর খাঁর কাহিনী শুনুন।

গত শতাব্দীর ঘটনাবলীর কথা জেনেছি প্রবীণদের কাছে যেমন শ্যামলাল ক্ষেত্রী, সাতকড়ি মালাকার, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী এবং মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেব। যতটা স্মরণ করতে পারছি, বলছি।

মুজফ্‌ফর খাঁর জন্ম হয় সিপাহী বিদ্রোহের এক বছর আগে। এক বছর বয়সের শিশুপুত্রকে নিয়ে পিতা মস্তে খাঁ জয়পুরে আশ্রয় নেন। মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহ্ জফরকে ইংরেজরা বন্দী করে রেঙ্গুনে পাঠায়। বন্দী সম্রাটের সঙ্গে মুঘল দরবারের গায়ক আলি বক্‌শও ছিলেন। ইনি ছিলেন মুজফ্‌ফর খাঁর পিতামহ। আলি বক্‌শ কিন্তু রেঙ্গুনে না গিয়ে মেটেবুরুজে ইংরেজের বন্দী নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্‌র দরবারে থেকে যান এবং পুত্র মস্তে খাঁ ও পৌত্র মুজফ্‌ফর খাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। জয়পুর থেকে কলকাতায় আসার যে রোমাঞ্চকর বিবরণ আমি মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেবের কাছে শুনেছি তা না বলে পারছি না।

জয়পুর থেকে ওঁরা দিল্লি আসেন উটের পিঠে ও বয়েল গাড়িতে চড়ে। লেগেছিল দু সপ্তাহ। সেখান থেকে সপরিবারে যমুনায় কিস্তি বা জেলেডিঙিতে

যাত্রা করেন। এলাহাবাদ পৌঁছতে সময় লাগে এক মাস। ওখানে যমুনা নদী ছেড়ে গঙ্গায় কিস্তি চলতে আরম্ভ করে। দু দিনে কাশী পৌঁছন। তারপর পাটনা হয়ে পুরো সাড়ে তিন মাস ধরে নৌকাপথে কলকাতার মেটেবুরুজের ঘাটে এসে নামেন। উনি অবশ্য এসব কথা ওঁর পিতার মুখে শুনেছিলেন।

ছ' বছর বয়স থেকে মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেবের তালিম শুরু হয় পিতামহ আলি বক্‌শ খাঁ সাহেবের কাছে। ওঁর যখন জ্ঞান হয় তখন অল্প কয়েকজন বাঙালি আলি বক্‌শের কাছে শিখতে আসতেন। তাঁদের মধ্যে একজন বাঁ হাতে খেতেন ও তানপুরা ছাড়তেন। তাঁর দুটি হাত থাকলেও ডান হাতে কোনো জোর ছিল না। ইনিই পরে নুলোগোপাল নামে খ্যাত হন। ওঁর আসল নাম ছিল গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী। এই গোপালবাবুর সুপারিশেই পাথুরেঘাটার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর আলি বক্‌শ খাঁ সাহেবকে পরম সমাদরে নিজের দরবারে নিয়ে আসেন। মুজফ্‌ফর খাঁ ওঁর সঙ্গে থেকে প্রতিদিন আট দশ ঘণ্টা রেয়াজ করতেন। কিছুদিন পরে পিতা- ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে কলকাতার পাট তুলে দিল্লী চলে যান। ওখানেই ওঁর দেহান্ত হয় এবং সেই মৃত্যু-সংবাদ পাবার পর আলি বক্‌শও পৌত্রকে নিয়ে দিল্লী যান। দিল্লীতে গিয়ে দেখেন মুঘল রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তানরস খাঁ (এঁর পৈতৃক নাম কুতুব বক্‌শ) এবং অন্যান্য দরবারী গায়ক ও গায়িকারা দিল্লী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাই তিনি আবার রাজধানী কলকাতায় পৌত্রসহ ফিরে আসেন। আমি ঠিক বলতে পারব না অঘোর চক্রবর্তী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কোনো দূরসম্পর্কের আত্মীয় হতেন কিনা। মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেব বলতেন উনি মহারাজার আজিজ্‌ অর্থাৎ আত্মীয় ছিলেন এবং মহারাজার অনুগ্রহে পিতামহ আলি বক্‌শ অঘোরবাবুকে ধ্রুপদ ধামার তালিম দিতেন। কিন্তু, মেটেবুরুজের পেয়ারা সাহেব* আমাকে পরে বলেছিলেন যে মহারাজার সঙ্গে অঘোরবাবুর কোনো আত্মীয়তা ছিল না। উনি সৌখীন ছিলেন, অফিসে চাকরী করতেন। তবে মহারাজার পাথুরেঘাটার দরবারে অঘোরবাবুর বিশেষ সম্মান ছিল। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমাকে বলেছিলেন অঘোর চক্রবর্তী আলি বক্‌শের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। উস্তাদ মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেব তাঁর পিতামহের মৃত্যুর পর অঘোরবাবুর কাশীধামের বাড়িতে বহুদিন থেকে এসেছিলেন। অনেক বলে যদু ভাটজীও [ভট্ট ভুল করে বলা হয়] আলি বক্‌শের কাছে শিখেছিলেন। এ কথার সমর্থন কোথাও পাইনি। উস্তাদ মুজফ্‌ফর খাঁ ভাটজীর গান শুনেছিলেন যখন

* এঁর Twin নামক একটি কোম্পানির রেকর্ডে গান বেরিয়েছিল, খুব উঁচু স্কেলে গান করতেন এবং শুনলে নারী কণ্ঠ বলে ভ্রম হত—লেখক]

উনি প্রথম যতীন্দ্রমোহনের দরবারে আসেন। উনি অবশ্য শুধু ধ্রুপদই গাইতেন।* ফকিরসদয় নন্দী নামে একজন গায়ক আমার ভাগ্নীদের গান শেখানোর জন্য নিযুক্ত হন। উনিই আমাকে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে নিয়ে যান। গিরিজাবাবু তখন স্টক এক্সচেঞ্জে যাতায়াত করতেন। কাজের অবসরে নিজের বাড়িতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন। আমার গান শেখার ইচ্ছা তখন প্রবল, তাই একদিন একান্তে ওঁর পরামর্শ চাই। উনি আমাকে মুজফ্ফর খাঁ সাহেবের কাছে শেখার পরামর্শ দিয়ে উনি কী ভাবে খাঁ সাহেবের কাছে তালিম নিতে সমর্থ হয়েছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন।

মুজফ্ফর খাঁ তখন ওঁর পিতামহের সঙ্গে কলকাতায় থাকতেন। গিরিজাবাবুর বয়স তখন কম। উনি বহরমপুরে থাকতেন এবং কলকাতায় এসে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে ধ্রুপদ শিখতেন। সেই সময়ে ওঁর খাঁ সাহেবের গান শোনা সম্ভব হয়নি। পরে কোলকাতায় পাকা বসবাস করে উনি দুলীচাঁদবাবুর দমদমার বাগানবাড়িতে খলিফা বদল খাঁ সাহেবের কাছে শিখতে আরম্ভ করেন। দুলীচাঁদবাবুরই বিশেষ আমন্ত্রণে মুজফ্ফর খাঁ সাহেব কখনও কখনও ওঁর কাছে এসে থাকতেন। দুলীচাঁদবাবুর বাগানবাড়িতেই একদিন শ্যামলাল ক্ষেত্রীর উদ্যোগে গিরিজাবাবু মুজফ্ফর খাঁর গান শুনতে পান এবং গান শুনে ওঁর প্রায় বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়ার যোগাড় হয়। এর পরই ওঁর কাছে শেখার জন্য উনি অস্থির হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সাহায্য প্রার্থনা করলে

* দেবপ্রসাদের দেহান্তের অনেক পরের কথা। ভবানীপুরবাসী নিদানবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মেয়ে রূপাকে শ'তিনেক ধ্রুপদ ধামার ও খেয়াল শেখাবার পর আমার কাছে নিয়ে আসেন গায়কির তালিমের জন্য। অনেকের ধারণা আগ্রা গোয়ালিয়রের গায়কি মেয়েদের জন্য নয়, পাতিয়ালাও নয়, কিন্তু নিদানবাবুর ধারণা অন্য রকম। ওঁর কাছে জেনেছিলাম ওঁর জ্যাঠামশাই বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পঁচাত্তর বছর বয়সে ১৯৪৫ সালে দেহ রাখেন। উনি আলি বক্‌শ খাঁ সাহেবের কাছে খেয়ালের তালিম পেয়েছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই ভারী চালের খেয়াল দু-চারটি নিদানবাবু আমায় শুনিয়েছেন। বর্তমানে নিদানবাবু ধ্রুপদি হিসেবে এই বৃদ্ধ বয়সে কলকাতার আসরে খ্যাতি লাভ করেছেন, কিন্তু ওঁর আজীবন তালিম খেয়ালের মেহেদী হুসেন ও রামপুরের আশ্‌ফাক হুসেন খাঁর শিষ্য কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। ধ্রুপদ নিদানবাবু শেখেন বিখ্যাত পাখোয়াজি গোপাল মল্লিকের পুত্র বিনোদ মল্লিকের কাছে আর তবলা শিক্ষা ফিরোজ খাঁর শিষ্য চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়ের হাতে। পুরোনো দিনের বাঙালি গুণিমহলের অবশিষ্ট দু একজনের মধ্যে এই অশীতিপর বৃদ্ধ নিদানবাবুর নাম সর্বাগ্রে করব কারণ এঁর কাছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়। কলকাতাবাসী মেহেদী হুসেন রামপুরের লোক, এঁর জামাই স্বর্গত খ্যাতনামা তবলিয়া কেরামতুল্লা খাঁ। মেহেদী হুসেনেরও পিতামহর নাম আলি বক্‌শ ধাড়ী। উনি রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আশ্রয়ে ছিলেন এবং তাঁরও বহু শিষ্য-শিষ্যা ছিল, যার মধ্যে গওহরজানের নাম উল্লেখযোগ্য—লেখক।

উনি ওঁকে নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে বলেন যে, বদল খাঁ সাহেবের কাছে এখনও ওঁর অনেক কিছু শেখার আছে। তা ছাড়া মুজফ্ফর খাঁ সাহেবের কাছে শেখার মত আর্থিক সঙ্গতিও গিরিজাবাবুর ছিল না। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আরও এক বছর বদল খাঁ সাহেবের কাছে যাতায়াত করতে থাকেন। বিভিন্ন রাগ ও তালের গান শেখেন, কিন্তু মুজফ্ফর খাঁ সাহেবের কাছে ওঁর শেখার বাসনা আরও উদগ্র হয়। শেষে একদিন কাশিমবাজার রাজবাড়িতে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে প্রার্থনা করলেন এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রর বদান্যতা সর্বজনবিদিত। উনি দয়ার্দ্রচিত্তে গিরিজাবাবুর সঙ্গীত শিক্ষার সবরকম ব্যবস্থা করে দেন।

গিরিজাবাবু অবিলম্বে দিল্লী রওনা হলেন। কিন্তু খাঁ সাহেবের বাড়ি নয়ীতহ্সীল ২ নং তানরস খাঁ লেনে গিয়ে শুনলেন যে খাঁ সাহেব বোম্বাই গিয়েছেন। ওখান থেকে হায়দ্রাবাদ মহীশূর ও গোয়ালিয়র হয়ে ফিরবেন। মাস খানেক সময় লাগবে। গিরিজাবাবু তখন বিলসীতে চলে যান নবাব সাদত আলির কাছে গান শিখতে। উনি রামপুর নবাবের কাকা হতেন এবং ওঁর ডাকনাম ছম্মন সাহেব বলেই পরিচিত ছিলেন। ধ্রুপদ ছাড়া ওঁর ঠুংরীর ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। বহুত তবায়েফ ওঁর কাছে শিখতে যেতেন। গিরিজাবাবু ওঁর কাছে ঠুংরীর গায়কী আয়ত্ত করেন। এ ছাড়া ছম্মন সাহেব গিরিজাবাবুকে সেনী ঘরানার প্রসিদ্ধ রামপুরের সভাগায়ক ওয়াজীর খাঁর বহু ধ্রুপদও শিক্ষা দেন।* বিল্সী থেকে মাস ছয়েক পরে দিল্লী এসে গিরিজাবাবু মুজফ্ফর খাঁর কাছে গাণ্ডা বাঁধান এক হাজার এক টাকা দিয়ে। দিল্লী থাকার সময়ে গিরিজাবাবু রামপুরে যাবার সুযোগ পেতেন এবং ছম্মন খাঁ ও এনায়েৎ হুসেন খাঁ সাহেবের [মুশ্তাক হুসেন এবং নিসার হুসেন খাঁর শ্বশুর] কাছে তালিম নিতেন কারণ মুজফ্ফর খাঁ সাহেব দিল্লীতে মাস খানেকের বেশি বড় একটা থাকতেন না, বাইরে জলসা করতে যেতেন। দিল্লীতে থাকলে গিরিজাবাবুকে মেহনত করাতেন খুবই। অন্য সময়ে ওঁর ব্যবহার খুব ভাল হলেও শেখানোর ব্যাপারে উনি অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করতেন। একবার গিরিজাবাবু কোনও একটি বিশেষ 'হরকত্' বার বার দেখানো সত্ত্বেও গলায় তুলতে না পারায় মুজফ্ফর খাঁ ওঁর কান মলে দিয়েছিলেন। পরে ঐ আচরণের জন্য দুঃখপ্রকাশ করলে গিরিজাবাবু বলেছিলেন—'আপনি আমার পিতার মত, ভুল করলে যদি শাস্তি না পাই তো

* এই ওয়াজীর খাঁর পিতা তানসেনের মেয়ের বংশে জন্মেছিলেন এবং এই ওয়াজীর খাঁই একাধারে আলাউদ্দিন খাঁ ও হাফিজ আলি খাঁর গুরু। তৎকালীন রামপুরের নবাব হামিদ আলি খাঁও এঁর কাছে গাণ্ডা বাঁধান এবং এই ঘরের ধ্রুপদ ধামার যোগাড় করার তালে স্বয়ং বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে নবাব সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন—লেখক।

ভুল চিরকাল ভুলই থেকে যাবে।...

...আমি যখন মুজফ্‌ফর খাঁর কাছে শিখতে যাই তখন গিরিজাবাবুর কথা মনে করে বেশ ভয় ভয়েই ছিলাম। গাণ্ডা বাঁধার পর উনি মস্ত একটি মালা দিয়েছিলেন, তাতে দু হাজারটি গুটি ছিল। সেই মালা এক হাতে আর তানপুরা অন্য হাতে নিয়ে সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে পরের দিন সকাল পর্যন্ত এক আসনে বসতে হত। সা রে গা মা পা ধা নি এই সাতটি সুর আরোহ অবরোহ ক্রমে দু হাজার বার প্রতিদিন করতে হত। একবার আরোহণ অবরোহণ সমাপ্ত হলে মালার একটি গুটি সরত। রেয়াজ চলার সময় উনি একটি রুপো বাঁধানো লাঠি নিয়ে কাছেই একটি সোফায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। রেয়াজের সময়ে ঢুলে পড়লেই খাঁ সাহেব আস্তে লাঠির হাতলটি দিয়ে মাথার পেছনের ঠুকে দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু করে দিতাম। এ রকম অবিশ্রান্তভাবে রাত জেগে চল্লিশ দিন চলবার পর উনি গান দেন। যতদূর মনে পড়ে প্রথমে একটি গৌড় মলহারের গান শিখিয়েছিলেন।...

...খাঁ সাহেবের মেজাজ হলে ঠুংরীও গাইতেন। তবে অত্যন্ত কম। আসরে একেবারেই গাইতেন না। ঠুংরী শেখানোর অনুরোধ করলে একটু রুষ্ট হয়ে বলতেন, 'আমার কাছে ধ্রুপদ খেয়াল শিখুন। ঠুংরী অন্য কোথাও গিয়ে শিখবেন।' গিরিজাবাবুরও ঐ একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমার বাড়িতে কখনও কখনও বেশ মেজাজে ঠুংরী গাইতেন, বিশেষত ওঁর ছোট ছেলে সুদক্ষ হার্মোনিয়াম শিল্পী আনোয়ার হুসেন বাজালে ওঁর ঠুংরী আরও জমে যেত। তবে কখনই উনি ম্যহ্‌ফিলে ঠুংরী গাননি। ওঁর বড় ছেলে মুনাওয়ার খাঁ কিন্তু রেডিও জলসাতে খেয়ালের পর ঠুংরী গাইতেন।*...

...মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেব মাঝে মাঝে আমাকে 'প্যাঁট' আনিয়ে দেবার কথা বলতেন। 'প্যাঁট' অর্থাৎ পাঁইট। চিরকাল ভাল হুইস্কির প্রতি ওঁর একটু দুর্ব্বলতা ছিল। বৃদ্ধাবস্থায়, যখন একমাত্র বোম্বাই ছাড়া অন্যত্র জলসায় বিশেষ ডাক পেতেন না, তখন হুইস্কির পরিবর্ত্তে সস্তার পানীয়র দ্বারা ওঁকে তৃষ্ণা নিবারণ

* দেবপ্রসাদ আমায় বলেছিলেন আগ্রার সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ গায়িকা জোহ্‌রা বাই, যাঁর সম্পর্কে অকুণ্ঠ প্রশংসা আমি ফৈয়াজ খাঁ ও বড়ে গুলাম আলি, দুজনেরই মুখে শুনেছি, তিনি নাকি মুজফ্‌ফর খাঁরই জারজ সন্তান। জোহ্‌রা বাইয়ের তালিম অবশ্য হয় ঘগ্‌গে খুদা বখ্‌শের ভাইপো শের খাঁ, গুলাম আব্বাস খাঁর ভাই কল্লন খাঁ ও আগ্রা আতরৌলির মেহবুব খাঁর (দরস পিয়া) কাছে। এছাড়া উনি ঠুংরি গজলের তালিম নেন ঢাকার আহ্‌মদ খাঁর কাছে। জোহ্‌রা বাই জোয়ান ফৈয়াজ খাঁকে নিজের বাড়ির তয়খানায় (বেসমেন্টে) বসিয়ে রেয়াজ করাতেন দরজার বাইরে থেকে হুড়কো বন্ধ করে। জোহ্‌রা বাইয়ের অজস্র পুরাতন রেকর্ড আছে যা শুনলে ওঁর গানে ফৈয়াজ খাঁর গায়কির আভাস পাওয়া যায়।—লেখক।

করতে হত। ওঁর জন্য ভাল 'স্কচ' আনিয়ে রেখেছি বললে উনি খুশি হতেন।

দিল্লীতে থাকার সময় খাঁ সাহেবকে নিয়ে ট্যাক্সী করে বেড়াতে যেতুম। সেবারে দিল্লীতে সারাদিনে দশ টাকা আর পেট্রল যা লাগে দেবার কড়ার করে একটা গাড়ি ঠিক করলুম। একদিন দশটার মধ্যে কিছু খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম খাঁ সাহেবকে তুলতে। উনি এবং ওঁরই প্রায় সমবয়সী একজন বৃদ্ধ পাখোয়াজী আল্লাদিয়া খাঁকে নিয়ে রওনা হলুম। আল্লাদিয়া খাঁ পথ দেখিয়ে দিল্লী রোহতক রোড ধরে ঝিন্দের পথে নিয়ে চললেন। দুটো নাগাদ রোহতকে পৌঁছে কিছু জলযোগ করে ঝিন্দের দিকে আরও অনেকটা এগিয়ে গিয়ে একটি গ্রামে পৌঁছলুম। গ্রামটির নাম জয়জয়ন্তী, একটি মধুর রাগের নাম। মুজফ্ফর খাঁ সাহেব বললেন গ্রামটি তানসেনের গুরু ঠাকুর হরিদাসের জন্মস্থান এবং ঐ গ্রামই ওঁর সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্র। ঐ রাগটির সৃষ্টি করে উনি ওঁর গ্রামের নামটিও অবিস্মরণীয় করে গেছেন। ওঁর জীবনের অর্দ্ধেক সময় অতিবাহিত হয় বৃন্দাবনধামে। উনি অবিবাহিত ছিলেন, ওঁর-ভাইয়ের বংশধারা আজও অক্ষুণ্ণ। ওঁরা 'ডাগর' বলে পরিচিত। 'ডাগর' শব্দটি 'ঠাকুর' শব্দেরই পরিবর্তিত ইসলামীয় রূপ।...

...সেবারে দিল্লীতে থাকার সময়ে প্রায় সত্তরটি চীজ্ বা গান মুজফ্ফর খাঁ সাহেব আমাকে দিয়েছিলেন। মোটামুটি বলতে পারি ওঁর কাছে আমি দু শ রাগের হাজার খানেক গান শিখেছি। অনেক বিচিত্র তালের বন্দিশ যেমন 'ফিরদৌস্ত', 'লছমী', 'পঞ্চমসওয়ারী' তালের গান আমি ওঁর কাছ থেকেই আয়ত্ত করেছি। সবচেয়ে বড় কথা গলার মেহনত প্রথমে করিয়ে গলায় তালের একটা গতি আনিয়ে উনি গান শেখাতে আরম্ভ করতেন।

ওঁদের ঘরানাকে বলা হয় সেকেন্দ্রাবাদী ঘরানা। উনি ওঁর ঘরানা সম্বন্ধে গর্ব্বিত ছিলেন। ওঁদের ঘরানায় বহু বিখ্যাত উস্তাদের আবির্ভাব হয়েছিল। ওঁদেরই ঘরানার রমজান খাঁকে মিঞা রঙ্গীলে বলে উল্লেখ করা হয়। মিঞা রঙ্গীলের বন্দিশ সব গায়কই গেয়ে থাকেন।*

* ফৈয়াজ খাঁর পিতৃবংশ এঁরা আগ্রার নিকটবর্তী সেকেন্দ্রাবাদ ঘরানার এবং রমজান খাঁ রঙ্গীলে যাঁর রচনা নটবেহাগে 'কৈসে কৈসে বোল' নায়কি কানাড়ায় 'নয়না নহি মানে' ছায়া বেহাগে 'সব নিশি জাগে', ইত্যাদি আমরা এখনও গেয়ে থাকি, উনি ফৈয়াজ খাঁর পূর্বপুরুষ। ফৈয়াজ খাঁর অবশ্য তালিম ওঁর দাদামশায় গুলাম আব্বাস খাঁর কাছেই, কারণ ওঁর জন্মের তিন মাস পূর্বেই ওঁর বাবা সফদর হুসেনের মৃত্যু হয় এবং ফৈয়াজ খাঁর মা পুনর্বিবাহ করেন। দাদামশায়ের কাছে তালিম ছাড়াও রঙ্গীলা ঘরানার অনেক গান ফৈয়াজ খাঁ ওঁর চাচা ফিদা হুসেনের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। সম্পর্কে মুজফ্ফর খাঁ ও ফৈয়াজ দূরসম্পর্কের ভাই। লেখক।

...মুজফ্‌ফর খাঁ বলতেন, উনি ছেলেবেলায় হদ্দু খাঁর গান শুনেছিলেন। হদ্দু খাঁ ছিলেন গোয়ালিয়র ঘরানার প্রবাদপুরুষ। হদ্দু খাঁ ও তাঁর পুত্র রহমৎ খাঁ 'ছত্রে কি খেল' নামে পরিচিত এক মহারাষ্ট্রবাসীর সার্কাস পার্টির সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতেন। মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেব ও ওঁর পিতামহ দিল্লীতে ছত্রের সার্কাস দেখতে গিয়ে হদ্দু খাঁ সাহেবকে ওঁদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন এবং ওঁদের বাড়িতে হদ্দু খাঁ সাহেবের গান হয়। আসরের গোড়ায় মুজফ্‌ফর খাঁও গেয়েছিলেন। অনেকের ধারণা হদ্দু খাঁ সাহেবের গলার ভল্যুম বেশি ছিল কিন্তু মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেব বলতেন যে, তাঁর গলার আওয়াজ অত্যন্ত 'বারিক' বা মিহি ছিল এবং চড়া পর্দ্দায় তিনি গান করতেন। এমন তৈরী ছিলেন যে ঐ বৃদ্ধবয়সেও একদমে একনিঃশ্বাসে লাখ দানা বেরিয়ে আসত তুবড়ির ফুলকির মত ওঁর গলা থেকে।...

...আমি আল্লাদিয়া খাঁর গান যখন শুনি তখন ওর গলা কাঁপত বয়সের জন্য। সে সময় মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেবেরও গলায় কম্পন শোনা যেত প্রথম সুর লাগাবার সময়ে, কিন্তু মিনিট দশ গাইবার পর গলা গরম হলে সে কম্পন থাকত না। কিন্তু ওঁর তানের স্পীড কমে গিয়েছিল অনেকখানি। তাই মাঝে মাঝে সরগম করে তানের অভাব পূরণ করতেন। আল্লাদিয়া খাঁ সাহেবের গলা গরম হলেও কম্পন থাকত, তবে তাঁর তানের স্পীড কমেনি। আল্লাদিয়া খাঁ সাহেব সরগম করতেন না। ওঁদের গায়কীতে সরগমের স্থান নেই। তা ছাড়া ওঁর প্রধান শিষ্যা কেসরবাইয়ের মুখে শুনেছিলাম যে, শেখাবার সময়ে সরগম জিজ্ঞেস করলে বলতে পারতেন না। বিনায়ক রাও পটবর্দ্ধনজী তাঁর গুরু বিষ্ণু দিগম্বর সম্পর্কেও ঐ কথা বলেছিলেন এবং ওঁর বই রচনার সময়ে একজনকে হার্ম্মোনিয়াম বাজিয়ে স্বরলিপি করে দিতে হত। মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেব অবশ্য ছাত্র বুঝতে না পারলে তাকে সরগম করে বুঝিয়ে দিতেন, কিন্তু গানের মধ্যে সরগম করার বিপক্ষে ছিলেন, এবং বলতেন যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সরগমের স্থান নেই, ওটা দক্ষিণীদের অলঙ্কার। বৃদ্ধবয়সেই উনি হলক তানের সঙ্গে বিলম্বিত ও মধ্যলয়ের খেয়ালে সরগমের আশ্রয় নিয়েছিলেন। একদিন ফৈয়াজ খাঁ বলেছিলেন 'বড়ে মিঞার রিয়াজ কমে গেছে, দুচারদিন রিয়াজ করলেই আবার বিজলীর মত তান চলবে।' একথা শুনে উনি দুঃখ করে বলেছিলেন 'ভাই ফৈয়াজ হুসেন, তোমার চেয়ে আমি পঁচিশ বছরের বড়, যে বিজলীর মত তানকে আমি এত মেহনত করে পেয়েছিলাম সেই তান আমাকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে গেছে, এ বয়সে মেহনত করলেও ফিরবে না। তাই যে সরগম করাটা আমার গায়কীর পরিপন্থী সেই সরগমের ওপর ভরসা করে গাইতে

হয়, না হলে খেতে তো পাব না।'*...

...অনেক গান যা মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেব চারতালে ধ্রুপদে গাইতেন সেগুলি আল্লাদিয়া খাঁ সাহেব বিলম্বিত তিন তালে খেয়াল গাইতেন। যেমন বরারী রাগে 'বিরহন বাওরী' গানটি চারতালের ধ্রুপদ, ওটি আল্লাদিয়া খাঁ বিলম্বিত তিন তালে খেয়াল করে গেয়েছিলেন। সেবারে ওঁর সঙ্গে গেয়েছিলেন ওঁর পুত্র ভুর্জ্জি খাঁ ও ছাত্র নথ্থন খাঁ।

...আবার লচ্ছাশাখের অতি প্রাচীন গান 'দেবী দুর্গে সদা সন্ত ঋষিপালনী' গানটি আমি মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেবের কাছে শিখে রেডিওতে গেয়েছিলাম। আল্লাদিয়া খাঁ সাহেবও ঐ একই গান লচ্ছাশাখ রাগে অ্যালফ্রেড থিয়েটারে গেয়েছিলেন, কিন্তু ওঁর প্রধান শিষ্যা কেসরবাইকে ঐ একই গান কুকুভ বিলাওলে শিখিয়েছিলেন। আমরা শিখেছি কুকুভ বিলাবলে মধ্যম প্রধান। কেসরবাই যখন গেয়েছিলেন তখন শুধু কোমল নিখাদটি বর্জ্জন করেছিলেন। লচ্ছাশাখ ও কুকুভ বিলাবলে অনেক পার্থক্য। শুধু কোমল নিখাদ বাদ দিলেই কুকুভ বিলাবল লচ্ছাশাখে পরিণত হয় না। তবে যদি কেউ প্রশ্ন করেন কেসরবাই গাইতেন কেমন? তার একটিই উত্তর—অতি উত্তম, চমৎকার। অনেক ধ্রুপদ ধামারও জানা ছিল কেসরবাইয়ের, সবই আল্লাদিয়া খাঁর স্টাইলে। তবে ঠুংরী উনি আল্লাদিয়া খাঁ সাহেবের শিষ্যা হবার আগেই ওঁর মার কাছে শিখেছিলেন বলে সোজা স্টাইলে বেশ দরদ দিয়ে গাইতেন। ওঁর ভজন গানে ঠুংরীর গায়কী এসে গেলেও ভাল লাগত।

...উস্তাদ মুজফ্‌ফর খাঁকে আমাদের মহিষাদলের বাড়িতে বেশ কিছুদিন রাখতে সক্ষম হয়েছিলুম। অনেক গানও তখন শিখেছিলুম। কিন্তু উনি প্রায়ই রেডিও বা জলসার আমন্ত্রণে বিভিন্ন জায়গায় চলে যেতেন। উনি এক জায়গায় স্থায়ীভাবে থাকা পছন্দ করতেন না। তাই একবার বলতেন—বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি, শেখাবার শক্তিও কমে গেছে ইত্যাদি। সেই সুযোগে আমি জিজ্ঞাসা করি 'ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কাছে কি আমি গান শিখতে পারি?' উনি বললেন 'বেশখ, তবে গাণ্ডা বাঁধতে পারবে না।' ফৈয়াজ খাঁ তার অনেক আগে থেকেই মহিষাদলে আসতেন এবং তাঁর কাছে এমনিও আমার অনেক গান শেখা হয়ে গিয়েছিল। উনিই আমাকে ধ্রুপদ ধামার শেখার জন্য বিশেষ জোর করেন। অবশ্য উস্তাদ মুজফ্‌ফর খাঁও বলতেন ধ্রুপদ জানা একান্ত প্রয়োজন, এবং অনেক

* ফৈয়াজ খাঁর একটি পেটেন্ট দ্রুত 'হলক' তান ছিল, তার সপ্তকের গান্ধার বা মধ্যম থেকে হুংকার দিয়ে সে তান আছড়ে পড়ত, খাঁ সাহেব দেবপ্রসাদকে বলেছিলেন সেটি নাকি বড়ে মিঞার কাছ থেকেই শুনে নেওয়া। লেখক।

ধ্রুপদও উনি শিখিয়েছিলেন। কিন্তু ধামার আমি ফৈয়াজ খাঁর কাছেই শিখি। আমি যে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কাছে ধ্রুপদ ধামার খেয়াল ঠুংরী এমন কি গজলও শিখতুম তা মুজফ্ফর খাঁ সাহেব জানতেন, ফৈয়াজ খাঁই ওঁকে বলেছিলেন। তাতে উনি বলেছিলেন রক্তের সম্পর্কে তো ওঁরা ভাই ভাই, তাতে আর কি হয়েছে? ফৈয়াজ খাঁও ওঁর কাছে কয়েকটা রাগ শিখেছিলেন। দুজনের গায়কীতেও কিছু কিছু মিল ছিল, যেমন 'দো মুখি তান'—এটি ফৈয়াজ খাঁ সাহেব মুজফ্ফর খাঁ সাহেবের কাছেই শিখেছিলেন। তেমনি কয়েকটি রাগের বিস্তারে ওঁদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। যেমন জয়জয়ন্তী রাগে মুজফ্ফর খাঁ পকড় নিতেন ধ ণ রে গ ম প গ ম রে জ্ঞ রে সা। ফৈয়াজ খাঁ সাধারণত দেশ রাগের পকড়ের মতন ধরতেন ন সা রে ণ ধা প ন সা সা ম গ রে জ্ঞ রে সা। খলিফা বদল খাঁ সাহেব বলতেন তিন ভাবে জয়জয়ন্তী গাওয়া যায়। ওয়াজীর খাঁ সাহেবের পৌত্র দবীর খাঁ সাহেবের পিতৃব্য সগীর খাঁ বলতেন যে ঠাকুর হরিদাস জয়জয়ন্তী রাগ রচনা করেছিলেন দেশ ও কাফি রাগের সংমিশ্রণে। সুতরাং ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের পকড় ধ্রুপদীয়াদের আর মুজফ্ফর খাঁ সাহেবের পকড় খেয়ালীয়াদের। অবশ্য যাঁরা আলাপে নোম্ তোম্ করেন তাঁরা প্রায় সবাই দেশ অঙ্গেই পকড় নিয়ে থাকেন। ফৈয়াজ খাঁ বলতেন দুটিই ঠিক, তবে দেশ অঙ্গে তাঁর গাইতে সুবিধে হয়। উনি কোনো বাদানুবাদের মধ্যে যেতেন না। কেউ যদি জিজ্ঞেস করত কোনটি ঠিক? উনি বলতেন, শ্রোতারা যা গ্রহণ করেন সেটাই করা উচিত কারণ তাঁদের আনন্দ দেওয়াই গায়কের কর্ত্তব্য। তবে সকলের গলায় সব জিনিষ আসে না। গলার আওয়াজের তারতম্য অনুসারে এক একটি বিশেষ অঙ্গ শ্রোতাদের কাছে ভালভাবে পেশ করতে চেষ্টা করা উচিত।... *

...সে যুগে গায়ক বাদকদের নজরানা আজকালকার তুলনায় অতি সামান্য ছিল। রাজোয়াড়ায় যাঁরা বেতনভুক্ ছিলেন তাঁদেরও মাইনে এমন একটা বেশি কিছু ছিল না। ফৈয়াজ খাঁ তো মোটে একশ টাকা বেতনে ১৯১০ সালে বরোদা রাজ দরবারে বহাল হয়েছিলেন।** ...কিন্তু ঐ সব গায়কদের বাইরে বাইরে গান গেয়ে রোজগার করবার অধিকার ছিল এবং বাড়িতে বাড়িতে ঘুরেও অনেকে গান শিখিয়ে রোজগার করতেন। রাজওয়াড়াতে গুণীজনখানা বলে

* আমি অবশ্য ফৈয়াজ খাঁকে বাগেশ্রী বা খাম্বাজ অঙ্গে ম ধ ণ সা করেও জয়জয়ন্তী গাইতে শুনেছি এবং সে প্রকার তালিমও পেয়েছি—লেখক।

** ফৈয়াজ খাঁর মাসতুতো ভাই যিনি সারাজীবন ওঁর সঙ্গে হার্মোনিয়মে সঙ্গত করেছিলেন তিনি আমায় বলেছিলেন ফৈয়াজ খাঁর মাস মাইনে ছিল দেড়শ আর সাড়ে বারো টাকা টাঙ্গা অ্যালাউয়েন্স, সব মিলিয়ে যা আজ হাজার পনেরো ষোলর সমান—লেখক।

গায়ক বাদকদের সপরিবারে থাকবারও ব্যবস্থা ছিল। জয়পুর দরবার বা রামপুর নবাব সাহেবের দরবারে শতাধিক গাইয়ে বাজিয়েদের সপরিবারে ভরণপোষণ করা হত। এঁদের মধ্যে যাঁরা নাম করা তাঁদের প্রতিদিন রাজবাড়ি থেকে সিধে আসত, যেমন আটা, ডাল, সবজী, দুধ, চিনি পাউরুটি ইত্যাদি।...

...উস্তাদ মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেব কিছুকালের জন্য জয়পুর দরবারে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মাত্র তিনমাস ছিলেন। সে সময়ের একটা মজার ঘটনার কথা প্রায়ই হাসতে হাসতে বলতেন। গল্পটি আমি গিরিজাবাবুর কাছে আগেই শুনেছিলুম। উস্তাদ মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেব নিজাম মেহবুব আলি খাঁর দরবারে ১৯০৭ থেকে ১৯১০ পর্য্যন্ত ছিলেন হায়দ্রাবাদে। নিজাম সাহেবের মৃত্যুর পর যখন ওসমান আলি খাঁ নিজাম হলেন তখন তিনি গায়ক বাদকদের রাখা নিষ্প্রয়োজন মনে করলেন এবং প্রত্যেককে আজীবন দু টাকা চার টাকা পেনসনের ব্যবস্থা করে বিদায় দিলেন। মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেব মাসিক তিন টাকা পেনসন পেয়েছিলেন এবং প্রথম মাসের টাকা পেয়ে সে টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। সুতরাং ও তিন টাকা পেনসনও বন্ধ হয়ে গেল। উনি জয়পুরের মহারাজার দরবারে চাকরী নেবার মাসখানেকের ভেতর জয়পুর থেকে খানিক দূরে এক ছোট রাজার নেমন্তন্ন পেলেন। জায়গাটার নাম সীকার।...

...হঠাৎ জয়পুরের গুণীজনখানায় একজন পাগড়ী বাঁধা লোক এল এক সকালে এবং বলল উস্তাদ মুজফ্‌ফর খাঁ যেন সীকারে তশরিফ নিয়ে যান অমুক দিন এবং অন্ততঃ দিন তিনেকের জন্য তৈরি হয়ে যান। আর সঙ্গে লালমণিবাইকেও যেন নিয়ে যান, জলসা হবে রাজা সাহেবের বাগিচায়। এই বলে ওঁর হাতে পঞ্চাশটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন রসিদ এনেছি, সই করে দিন। খাঁ সাহেব সই করে টাকা নিয়ে বললেন 'এ টাকাটা তো আমার বায়না হিসেবে পেলুম কিন্তু লালমণি কালামণি নামে আমি কাউকেও চিনি না, তার ব্যবস্থা আমি করতে পারব না। আপনি নিজেই তার ব্যবস্থা করুন।' সীকারের দূত 'বেশ তাই হবে' বলে রওনা দিলেন ট্রেনে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ সীকার।...

...সেদিন সকালেই বাজারে যাবার আগে উস্তাদ ধ্রুপদী মুহম্মদ বক্‌শের কাছে গেলেন। মুহম্মদ বক্‌শ ওঁর চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় ছিলেন এবং রোজই মুজফ্‌ফর খাঁ বাজার যাওয়ার পথে ওঁর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে দুজনের সংসারের বাজার করে আনতেন। মুহম্মদ বক্‌শের কাছে পয়সা নিতে নিতে মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেব বললেন, 'আজ সকালেই কিছু টাকা পেয়ে গেলুম, বাক্সে তুলে রেখে আসছি।' টাকাটা কী ভাবে পেলেন বলতে মুহম্মদ বক্‌শ সাহেবের চক্ষু ছানাবড়া। বললেন 'আমরা কেউই সীকারে যাই না, ও রাজাটা উন্মাদ।' মেওয়াতের একজন গুণী তুলসীরাম খাঁ সাহেবের বাসায় উপস্থিত ছিলেন তিনিও

চমকে উঠে বললেন 'সর্ব্বনাশ করেছেন, এখুনি মনিঅর্ডার করে টাকা ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা করুন আর টেলিগ্রাম করে দিন আপনার শরীর খারাপ। ও রাজাটা অত্যন্ত খামখেয়ালী। কী আর বলব, অনেক উস্তাদ সীকারে গান করতে গিয়ে শুধু পরণের লুঙ্গিটি পরে ফেরৎ এসেছেন।...

...মুজফ্ফর খাঁ দু ছেলের সঙ্গে আলোচনা করলেন, বললেন যখন টাকা দেবে তখন গিয়েই দেখা যাক, একটা অভিজ্ঞতা তো হবে। যেদিন রওনা হবার কথা সেদিন একটা পুরোনো শেরওয়ানী পুরোনো কাপড়জামা পরে ট্রেনে উঠলেন। মেডেল টেডেল কিছু নিলেন না, সঙ্গে একজন তবলীয়া। দু ছেলের ছোট যে খলিফা আনোয়ার খুব ভাল হার্ম্মোনিয়াম বাজায়, বড় খলিফা মুনাওয়ার সঙ্গে গাইবে। ওঁদের ট্রেনেই লালমণি বাই ছিল। তার সাজ সরঞ্জামও ছিল, সঙ্গে সারেঙ্গীয়াও একজন ছিল।...

...সীকার স্টেশনে নেমে দেখেন সেই দূত দাঁড়িয়ে আছেন, মাথায় বিরাট পাগড়ী। দুটি বয়েল গাড়ীও তৈরি। ওখানে ঘোড়া উট হাতি ও বয়েল গাড়ী ছাড়া অন্য কিছু চলবার উপায় নেই—চারদিকে কেবল বালি। প্ল্যাটফর্ম্মে লালমণিবাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হল।...

...লালমণিবাইয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে একটি আংটি ছিল। সেই আংটির বাইরের দিকে ইঞ্চিখানেক ব্যাসের একটি আয়না লাগানো ছিল। খাঁ সাহেব লক্ষ্য করলেন লালমণি পান খান আর ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি খাড়া করে আংটিতে লাগানো আয়নায় ঠোঁট উলটে জিভ বার করে দেখেন বেশ লাল দেখাচ্ছে কি না। যদি দেখেন কম হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি পান মুখে পুরে দু একবার চিবিয়েই আবার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল খাড়া করে ঠোঁট উলটে জিভ বার করেন। গরুর গাড়িতে মাইল খানেক পথ পার হতে যা সময় লাগে তার মধ্যে বার তিনেক লালমণির ঠোঁট জিভের লালিমা পরীক্ষা করা হয়ে গেছে। দেখে দেখে খাঁ সাহেব ভাবলেন আজ লালমণির ভাগ্য খারাপ। জয়পুরে যা শুনে এসেছেন তাতে বুঝলেন শ্রীমতী লালমণিকে এক আল্লাই রক্ষা করতে পারেন। যাই হোক ওখানে পৌঁছে দেখেন রাজবাড়ী বেলে পাথরের বেশ বড়সড় প্রাসাদ। ওঁদের ওরই মধ্যে দুটি ঘর দেখিয়ে দূত বললেন মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নিন। আপনাদের খাবার প্রাসাদের রসুই ঘর থেকে আসবে। ওঁরা দুপুরের একটু আগে পৌঁছে ছিলেন। খাওয়া দাওয়া ভালই মুর্গী ও খাসী দুয়েরই এলাহী ব্যবস্থা। জলসা হবে আড়াই মাইল দূরে রাজার বাগানবাড়ীতে। তাও সেই বয়েল গাড়ীতে যেতে হবে, রাজা যাবেন হাতীর পিঠে। দূত এসে খবর দিতেই ওরা রওনা হলেন। যাবার আগে বিশেষ করে নামাজ পড়লেন। শুনলেন লালমণিকে রাজাসাহেব হাতীর হাওদায় চড়িয়ে

নিয়ে গেছেন সঙ্গে করে।...

...ক্যাঁচকোঁচ করতে করতে বাগানবাড়ীর উদ্দেশ্যে ওঁরা চলেছেন। চারিদিকে কেবল বালির সমুদ্র। সেই পাগড়ীবাঁধা দূতও চলেছে সঙ্গে। খানিক দূর গিয়ে ওঁরা দেখেন বিপরীত দিক থেকে আর একটা বয়েল গাড়ী আসছে। সেই পাগড়ীধারী দূত একটু ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'একটু দাঁড়ান। ঐ গাড়ীটাতে লালমণির সাঙ্গপাঙ্গরা গিয়েছিল। কেন ফিরে আসছে খবর নিতে হবে।' গাড়ী দাঁড় করাতেই নারীকণ্ঠের করুণ ক্রন্দন 'আমাকে হাতীর পিঠ থেকে রাজা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে, উঃ আমার কোমরটা বোধহয় ভেঙ্গেই গিয়েছে।' ভাগ্যিস মরুভূমি অঞ্চল বালির জন্য হাড়গোড় ভাঙ্গেনি।...

...খাঁ সাহেব গাড়ী থেকে নেমে একটু আহাউহু সহানুভূতি প্রকাশ করে সাঙ্গপাঙ্গদের উদ্দেশ্য করে বললেন 'তোমরা কি রকম বেআক্কেলে। দাও জিনিষগুলো সরিয়ে বাইজীর শোবার ব্যবস্থা করে দাও।' নিজেই তানপুরা হার্ম্মোনিয়াম নিজের গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে বললেন 'এবার বেশ জায়গা হয়ে গেল, টান করে বাইজীকে শুইয়ে দাও। আর পার তো একটু মালিশ টালিশ করে দিও।' বলেই নিজের গাড়ীতে উঠে পড়ে 'চল জোরসে' বলে রওনা দিলেন। অবশেষে চলার শেষ হল বাগিচা নামে খ্যাত সেখানে।...

...মরু অঞ্চলে লম্বা লম্বা একরকম কাঁটা গাছ হয়, সেই গাছ দিয়ে ঘেরা খানিকটা স্থান। একটা একতলা বাড়ী ও একদিকে পিলখানা বা হাতীশালা। দুচারটে পাথরের দেওয়াল দেওয়া গোল খাপরার ছাদওয়ালা আউট হাউস। ওঁরা বয়েল গাড়ী থেকে নামতে দূত ওঁদের আউট হাউসের একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে বলল 'রাজা সাহেব প্রস্তুত হলেই আমি আপনাদের নিয়ে যাব।' সময়টা ছিল শীতের। বাগিচার আউট হাউসে ওঁদের কাঁপুনির অন্ত নেই। শেষে বিছানা খুলে রজাই টজাই বার করে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তানপুরোটা মিলিয়ে নিয়ে এক পেগ হুইস্কি বার করে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। তখন দূত এসে খবর দিল রাজাসাহেব গান শুনতে প্রস্তুত। ওঁরা গিয়ে দেখলেন রাজাসাহেব একটি জাজিমের ওপর বসে। বয়স ত্রিশের কিছু বেশি হতে পারে, গালে রাজপুত মার্কা গালপাট্টা ও বেশ কালো একযোড়া [য]গোঁফ। মাথায় পাগড়ী হলুদ রঙের। কপালে চন্দনের ফোঁটা আর চোখ দুটি গোল গোল রক্তবর্ণ। ঘরে খাঁ সাহেব ঢুকে ঝুঁকে আদাব করলেন, রাজাও প্রত্যভিবাদন করে একটি কাঁসার থালায় খিলিকরা অজস্র পানের পাত্রটি খাঁ সাহেবের দিকে এগিয়ে দিলেন। খাঁ সাহেবরা সবাই এক একটি খিলি পান তুলে নিয়ে আবার আদাব জানালেন। তখন একজন পরিচারক একটি মাটির হাঁড়ি থেকে এক গেলাস পানীয় এনে দিলেন, রাজাসাহেব তা চোঁ চোঁ করে চুমুক দিয়ে শেষ করলেন।

গন্ধতে বোঝা গেল জিনিষটা তাড়ী। খাঁ সাহেব অনুমতি নিয়ে গান ধরলেন, কিন্তু রাজাসাহেবের মুখ দিয়ে কোনো কথাই শোনা গেল না। গান গাইতে গাইতে খাঁ সাহেব রাজাসাহেবের দিকে দৃষ্টি সমানেই রেখেছিলেন। এর মধ্যে আরও কয়েকবার পরিচারক এসে পানীয় দিয়ে গেছে। গান যখন চলছিল রাজাসাহেব অন্যমনস্ক ছিলেন। ভাল লাগছে কিনা রাজাসাহেবকে দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। একটু একটু [করে] খাঁ সাহেব উপলব্ধি করতে পারছিলেন রাজাসাহেবের অবস্থা তাড়ীর দৌলতে এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাচ্ছে। এমন সময়ে হঠাৎ খাঁ সাহেবের দিকে রক্ত নেত্রে তাকিয়ে রাজাসাহেব বলে উঠলেন, 'ব্যস আপনার গান শোনা হয়ে গেছে।' গানের মাঝখানে এভাবে সাধারণত কেউ বলে না তা সে রাজাই হোক্ বা মহারাজাই হোক্। ভয়ে ভয়ে খাঁ সাহেব বললেন 'হুজুর অন্য কিছু শোনাব কি?' রাজাসাহেব ততোধিক চোখ পাকিয়ে বললেন, 'এক মদ খাওয়ার গান যদি শোনাতে পারেন আর সে গান যদি আমার ভাল লাগে তবেই শুনব, না হলে কালই আপনি জয়পুরে ফিরে যান।' খাঁ সাহেবের খাম্বাজের একটি ঠুংরী মনে পড়ে গেল, 'দারু পিয়ে মতওয়ারে।' খুব মজা করে বোল টোল বানিয়ে পেশ করতে লাগলেন। এতক্ষণে রাজাসাহেবের মুখ থেকে তারিফ বের হল। 'বাহ্ বাহ্' 'বহুৎ খুব' ইত্যাদি হাঁক-ছাড়তে ছাড়তে এক পরিচারককে ডাকলেন তারপর তার কানে কানে কিছু বলাতে সে ভেতরে গেল এবং একটি হাজার চাঁদির টাকার তোড়া নিয়ে এসে পানের থালার উপর রাখল। রাজাসাহেব তোড়ার মুখটা খুলে খাঁ সাহেবের কাছে সরে এসে মাথার উপর টাকার বর্ষণ আরম্ভ করলেন, তখনো খাঁ সাহেব গেয়ে চলেছেন 'দারু পিয়ে মতওয়ারে'। ওদিকে ওঁর দুই পুত্র ও তবলিয়া হার্মোনিয়াম তানপুরো তবলা বন্ধ করে লেগে গেল টাকা কুড়োতে, মুখে তাদের খালি গলায় সুরে বেসুরে চীৎকার 'দারু পিয়ে মতোয়ারে।' এদিকে উন্মত্ত রাজাসাহেবের মুখে খালি 'হুহুহুহু' চীৎকার। যতক্ষণ টাকা বৃষ্টি হল ততক্ষণ হৈ হুল্লোড় চলল। তারপর পরিচারক ও সেই পাগড়ীবাঁধা দূত এসে টাকা থলিতে পুরে খাঁ সাহেবকে বাইরে যেতে ইশারা করাতে হার্মোনিয়াম তানপুরো ইত্যাদি তুলে নিয়ে বয়েল গাড়ীতে চড়ে মাঝরাতে সীকার পৌঁছলেন। ফুরণ অনুসারে সকালে আড়াইশ টাকাও পেলেন। তবলিয়াকে দুশ টাকা দিয়ে আটশ টাকা পকেটস্থ করে প্রথম যে ট্রেন পেলেন তাতেই রওনা হলেন জয়পুরের দিকে। নিজের ডেরায় ফেরার পর মুহম্মদ বক্‌শ খাঁ সাহেব সব শুনলেন। খবরটা আর চাপা রইল না। মেওয়াত-এর তুলসীরামজীও আদ্যোপান্ত পুরো কহানী শুনে ওঁকে যুদ্ধেজয়ী সেনাপতির সম্মান দেখালেন।...

...অনেকদিন পরে গিরিজাবাবুর মুখে খাম্বাজের ঐ ঠুংরীটি শুনি। উনিও

খাঁ সাহেবের সীকারের ঐ অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে ঐ ঠুংরীটি নেন।

অনেক গুণীর সম্পর্কে দেবপ্রসাদের গল্প শুনেছি। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গিটি বড়ই মজলিশি ছিল, লেখাও তাই। এই কারণে এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতিটি দিলাম। ওঁর উস্তাদদেরই সবাই ভুলে গেছে, দেবপ্রসাদ গর্গ বা তাঁর ভাই শক্তিপ্রসাদকে কে আর মনে রাখবে? কিন্তু এমন গানপাগল গুণীরা রাজবংশে সচরাচর জন্মগ্রহণ করেন না।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম ওঁকে তিনজনের সম্পর্কে—আবদুল করিম, মৌজুদ্দিন খাঁ ও ফৈয়াজ খাঁ। আবদুল করিম খাঁ মোট দুবার আসেন কলকাতায়। প্রথম ওঁকে দিলীপকুমার রায় যখন ১৯২৪ সালে নিয়ে এসে থিয়েটার রোডের মামার বাড়িতে জলসা করেন তখন কেউই বড় একটা ওঁর নাম শোনেননি। সেখানে দিলীপকুমারের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, প্রমথ চৌধুরী ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই আসরের নিমন্ত্রণ পেয়েই শরৎবাবুর বিখ্যাত উক্তি 'যখন বলছ এত করে, যাব না হয় শুনতে, তা তোমাদের উস্তাদ থামতে জানে তো?' ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছিলেন আনন্দ ভৈরবী ও আর একটি কি অপ্রচলিত রাগ উনি গেয়েছিলেন কিন্তু আসর খুব একটা জমেনি। তার প্রধান একটি কারণ, গানের মাঝ মধ্যিখানে গান্ধীজী দাঁড়িয়ে উঠে শ্রোতৃবৃন্দের কাছে চাঁদা তুলতে শুরু করেন। গান্ধীজী ভজন শুনতেন, কালোয়াতি কেন কোনো গানেরই ভক্ত ছিলেন না। একবার বন্দে আলি খাঁর শিষ্য বিখ্যাত মুরাদ আলি খাঁর বীণ আহমদাবাদে শোনেন। 'কী রকম লাগছে?' প্রশ্ন করেন সারাভাই। গান্ধীজীর উত্তর 'ভাল, কিন্তু আমার চরখার গান এর চেয়ে আমাকে বেশি আনন্দ দেয়।' ১৯৩৬এ যখন আবদুল করিম দ্বিতীয় বার কোলকাতায় এলেন তখন ওঁর রেকর্ড, বিশেষত ওঁর ঠুংরি দুটি 'পিয়া বিন নহি আবত চৈন' ও 'যমুনাকি তীর' অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছে। অতএব শহরের লোক ভেঙে পড়েছিল ভূপেনবাবুর অল বেঙ্গল কন্‌ফারেন্‌সে।

দেবপ্রসাদ বলেছেন ১৯৩৬ সালে আবদুল করিম খাঁকে উনি প্রথম শোনেন এবং ওঁর দেড় ঘণ্টার মিঞা কি তোড়ির সঙ্গেই প্রথম, সম্ভবত শামসুদ্দিনের তবলায়, আটচল্লিশ মাত্রার অতি বিলম্বিত একতালের ঠেকা শুনেছিলেন। কোলকাতায় বড়দিনের সময়ে উনি আসেন। ঠিক তার পূর্বেই এলাহাবাদে মুজফ্‌ফর খাঁ সাহেবকে করিম খাঁর চেয়ে বেশি নিয়েছিল সমঝদাররা। ওর গানে রাগ শুদ্ধ থাকে না ইত্যাদি কিছু কথা গুণীরা বলেছিলেন যার মধ্যে এলাহাবাদ কন্‌ফারেন্‌সের হোতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্‌সেলর ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য পড়েন। ধূর্জটিপ্রসাদের রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে দেখেছি, উনি লিখেছেন 'বড়ো আলাপিয়ার পদ্ধতি সুসংগত, তার নির্বাচন যথেচ্ছচারিতা নয়। ভাল ঘরানায় পথটি

পাকা। যদি কোনো ওস্তাদ প্রতিভার জোরে আরো ভাল রাস্তা তৈরি করে, তাহলে তাকে আর তার পথকে কদর করবই করব। আলাপে এই প্রকার প্রতিভার সাক্ষাৎলাভ দুর্লভ, আল্লাবন্দে খাঁর ঘরানা ভিন্ন। তবে অন্য গানে আবদুল করিমকে আমি খুব উচ্চ স্থান দিই। আপনি বোধ হয় শুনেছেন যে আবদুল করিম [উস্তাদ মহলের চোখে] ফৈয়াজের মত ঠিক ঘরানা গাইয়ে নয়। সে অনেক সময় বন্দিশ ভুলে যায় কিংবা দু-একটি লাইন গায়, বড়ো ওস্তাদে তাকে সেজন্য ঠাট্টাও করে, হিন্দোলে শুদ্ধ মধ্যম দেয়, ভৈরবীতে শুদ্ধ পর্দা লাগায়, গায় নিজের মেজাজে। কিন্তু সে মেজাজে কি মজা।'*

এই নিয়ে প্রশ্ন করায় উনি আমাকে বলেছিলেন অনেক লিবার্টি নিত। একটু আধটু ভুলভালও গাইত—সব যে ইচ্ছাকৃত তা নয়, (ওঁর শুদ্ধ বিলাবলের রেকর্ডেই নি রে গা মা গা ফ্রেজটির একাধিক ব্যবহার মনে পড়ছে) তবে Whatever he sang was music, এ কথা আর কারও সম্পর্কে বলতে পারি না।

দেবপ্রসাদ আমায় বলেছিলেন 'এমন পাগল করা গান জীবনে শুনিনি। সে কি সুর! মন্ত্রমুগ্ধের মত ওঁর মিয়া কি তোড়ী শুনেছিলাম। ওঁর গলা গরম হত বেশ খানিকক্ষণ পরে, কিন্তু বিলম্বিত লয়ে কী বিস্তার আর কী অসম্ভব সুরের মাদকতা! দেড় ঘণ্টা ধরে উনি বিলম্বিত একতালায় গাইলেন। পরে বিচার করে দেখেছি মিয়া কি তোড়ীতে উনি পঞ্চম ব্যবহার করলেনই না, তাই গুজরি তোড়ীর মতই শোনাচ্ছিল। আবদুল করিম খাঁ স্বল্পভাষী ছিলেন। ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পাথুরেঘাটায় ভুপেনবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলুম। ওঁকে ওঁর সেদিনকার মিয়া কি তোড়ীর সম্পর্কে প্রশ্ন করাতে উনি বললেন 'ইয়াদ নহী পঞ্চম লগায়া থা ইয়ে নহী, আপ বতাইয়ে প্রোগ্রাম আপকো আচ্ছি লগী ইয়া নহী।' অর্থাৎ 'রাগ পেশ করার সময় একটু আধটু এদিক ওদিক হল কি না সেটা গ্রাহ্য নয় যদি গান শ্রোতার প্রাণস্পর্শ করে।' এর ওপর আর কথা চলে না।

ডক্টর রানাডে একজন বিখ্যাত সংগীতবিদ্‌। তাঁর বক্তব্য আবদুল করিম খাঁর ঠুংরি এবং খেয়ালের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। দেবপ্রসাদেরও বক্তব্য তাই। ওঁর ঠুংরি অসাধারণ হৃদয়গ্রাহী হলেও তাতে খেয়াল অঙ্গই বেশি থাকত। আর একটা লক্ষণীয় জিনিস, ঠুংরির শেষ ভাগে যে লগ্‌গী বাজে তাকে উনি তেতালে পালটে নিতেন। অবশ্য এ কাজ ফৈয়াজ খাঁও করতেন। তবে আবদুল করিম খাঁকে যাঁরা সামনে শোনেননি শুধু রেকর্ড শুনেছেন—বা আমার মত অতি অল্প বয়সে শুনেছেন যখন বিশেষ বোধশক্তি জন্মায়নি, তাঁরাও স্বীকার করবেন যে সুরের ঐ প্রকার বাতাবরণ আর কোনো উস্তাদ তৈরি করতে সমর্থ হননি, এমন কি বড়ে গুলাম

দ্র. "সুর ও সঙ্গতি," 'ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী-৩, পৃ. ৩৮।

আলি বা কিরানা ঘরানার উস্তাদ আমীর খাঁও নয়। ঠাকুর জয়দেব সিং বলতেন খেয়ালের অন্যান্য অঙ্গের দিকে খাঁ সাহেব নজর কম দিতেন, সুরে এমনই ডুব দিতেন যে তাল লয়কারি বন্দিশ ভরার কায়দা যা ঘরানাদার গাইয়েদের কাছে পাওয়া যেত, সেদিকে ওঁর তবিয়ৎ বড় একটা যেত না। নিবৃত্তি বুয়া সরনায়েক, যিনি বেশ কয়েক বছর কলকাতার সংগীত রিসার্চ আকাডেমীতে ছিলেন, প্রথম শোনেন আবদুল করিমকে যখন ওঁর নিজের বয়স সতেরো-আঠারো হবে। পেছনে তানপুরা ধরেন নিবৃত্তিবুয়ার কাকা শঙ্কররাও ও আবদুল করিম খাঁর প্রধান শিষ্য, এবং ভীমসেন, গঙ্গুবাই হঙ্গল, ফিরোজ দস্তুরদের গুরু সওয়াই গন্ধর্ব। গানের শেষে উনি দুজনকেই প্রশ্ন করেন ওঁরা খাঁ সাহেবের সঙ্গে গলা দিচ্ছিলেন না কেন। সওয়াই গন্ধর্ব জবাবে বলেন 'যতই আমরা সুরে গাই না কেন খাঁ সাহেবের পাশে সবই বেসুরো শোনায়।'

মৌজুদ্দিন খাঁ সম্পর্কে গর্গ সাহেবের মন্তব্য—ওঁর পরে কোনো উস্তাদ আসরে বসতে সাহস করত না, এমনই প্রভাব গুণ ছিল মৌজুদ্দিনের গানের। আমাদের সংগীত নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্গত। মৌজুদ্দিন খাঁর ঠুংরিতে ড্রামা ছিল, মেলোড্রামা নয়। অসাধারণ তাঁর কাকুপ্রয়োগ আর এককথায় যাকে বলে অসম্ভব রঙ। সে এমনই ঠুংরি যে ফৈয়াজ খাঁ তা শুনে আসরে ঠুংরি দাদরা গাইতে শুরু করেন, যা তাঁর ঘরানার পূর্বসুরীদের সময়ে অকল্পনীয় ছিল। ঠুংরি ছিল তবায়েফদের গান। আগ্রা ঘরানার খানদানি উস্তাদরা ঠুংরিকে হেয় জ্ঞান করতেন, ফৈয়াজ খাঁই প্রথম তাকে জাতে তুললেন। ফৈয়াজ খাঁর শ্বশুর মেহবুব খাঁ (দরস পিয়া) অনেক ঠুংরির বন্দিশ রচনা করেছিলেন, শিষ্যা জোহ্‌রা বাইকেও শিখিয়েছিলেন। ওঁর রচনা কাফি রাগে 'দাদুরবা বোলে মোর শোর' জোহ্‌রা বাই বহুকাল আগে রেকর্ড করেছিলেন। তবে দরস পিয়া আসরে কখনও ঠুংরি গাননি। ফৈয়াজ খাঁর ১৯২৫ সালে লখনউএর গ্র্যাণ্ড কন্‌ফারেন্‌সে ভৈরবীর ঠুংরি ও দাদরা ম্যহ্‌ফিলের পর দিলীপকুমার রায় এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে ওঁর বই 'ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকায়' সম্ভবত আবদুল করিম খাঁকে মনে রেখেই লিখেছিলেন যে, ফৈয়াজ খাঁর সমতুল্য খেয়ালিয়া হয়তো দেশে আছে কিন্তু ওঁর মত ঠুংরি গাইয়ে হিন্দুস্থানে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যাঁর ঠুংরি শুনে ফৈয়াজ খাঁ ঠুংরি দাদরা ধরলেন তাঁর শৈলীর সঙ্গে ফৈয়াজ খাঁর ঠুংরির গায়কির প্রচুর তফাত। এ বিষয়ে দেবপ্রসাদ আমার সঙ্গে সহমত ছিলেন। মৌজুদ্দিনের বেশ কিছু খেয়াল ও ঠুংরির রেকর্ড গ্র্যামোফোন কোম্পানি বার করেছিল ১৯১০ ও ১৯২০ সালের মধ্যে। এগুলির মধ্যে কিছু 'চেয়ারম্যান্‌স চয়েস' নাম দিয়ে এইচ. এম. ভি বছর কয়েক আগে আবার বার করেছে। মহৎকর্ম। এগুলি শুনলেই উপরোক্ত উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে। সেই সঙ্গে অবশ্য মনে রাখতে হবে ওই প্রাগৈতিহাসিক যুগের রেকর্ডিং থেকে মৌজুদ্দিনের গায়কির

তথাকথিত ঔজ্জ্বল্যের ছিটেফোঁটা মাত্র আন্দাজ পাওয়া যায়।

মৌজুদ্দিনকে অবিস্মরণীয় করে গেছেন অমিয়নাথ সান্যাল তাঁর 'স্মৃতির অতলে' পুস্তকে। ওঁর লেখার মধ্যে যে স্বাদগন্ধ আছে তা আমার অপটু কলম মারফত পাঠকের কাছে পৌঁছোনো সম্ভব নয় বলে উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

বাবুজী [শ্যামলাল ক্ষেত্রী] ও তাঁর গুরু গণপৎ রাও ভাইয়া সাহেব সে বার দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গব্রত উদ্‌যাপন ক'রে কাশীতে ভাইয়াসাহেবের গঙ্গামহল নিবাসে এসে উঠেছেন। সঙ্গে মথুরানিবাসী চৌবেজী, মাধোজী প্রভৃতিও ছিলেন। বাবুজীর গুরুভাই কামাখ্যাপ্রসাদ মৈমুরগঞ্জে তাঁর বাগানবাড়িতে মাইফেলের আয়োজন করেছেন। এ ছাড়া কাশীর সঙ্গীত বিশারদ পাঠকজী রাজেশ্বরী হুস্‌নাবাই প্রভৃতি তথাকার সেরা গুণী ও রসিক ব্যক্তিরা সমবেত হয়েছেন। চৌবেজীর ধ্রুপদ ধামার ও পাঠকজীর সঙ্গত হওয়ার পর রাজেশ্বরী ও হুস্‌না খেয়াল গান শেষ করে ঠুম্‌রী ধরবেন। আসর জগ্‌মগ্‌ করছে। বাবুজী ও বশীর হার্মোনিয়ম নিয়েছেন।...

...এমন সময় কামাখ্যাপ্রসাদের এক বন্ধু একটি ছোকরাকে ভাইয়া সাহেবের সামনে নিয়ে এসে বললেন 'ওস্তাদ, এর নাম মৌজ্‌দিন। ভারি মিঠা গলা; অনুগ্রহ করে যদি এর গান একটু শুনেন? এ গাইতে চায়।' ভাইয়াসাহেব অত্যন্ত উদার প্রকৃতির লোক। তিনি বললেন, 'তাই হোক্, মৌজ্‌দিন গান করুক।' একজন সারেঙ্গীয়া নূতন করে সুর বেঁধে নিল। বশীর ও বাবুজী মৌজ্‌দিনের সঙ্গে বাজাবেন...

...শ্যামলালজীর ভাষায়—মৌজ্‌দিন গান ধরতেই বুঝলাম, সে কতখানি বেপরোয়া ও সপ্রতিভ। রাজেশ্বরী বা হুস্‌না মনে নেই, ললিতের একটি আস্থায়ী 'হম্ সে অবধ্‌বদ' গানটি গেয়েছিল। মৌজ্‌দিন সেই গানটি নূতন করে আরম্ভ করল। ওস্তাদ কিছু বললেন না, ফলে আমরাও ঐ অশিষ্টতার আপত্তি করতে সাহস করলাম না। শুধু কি তাই! সেই মিঠা গলায় সুর বিস্তার করতে করতে এমন একটু নিরালা ও চমৎকার তান করে মুখে ফিরে এলো যে, আমাদের হাতের বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। ওস্তাদ 'সাবাশ্‌ বেটা! সাবাশ্‌!' বলে চীৎকার করে উঠলেন ও মৌজ্‌দিনকে বললেন, 'ফের ঐ তানটি করো।' মৌজ্‌দিন নূতন রকমের বিস্তার করতে করতে ফের যখন ঐ তানটি করে মুখে ফিরে এল, তখন ওস্তাদ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারিফের হুল্লোড় লেগে গেল। চন্দন, রাজেশ্বরী, হুস্‌না বাঈদের সুরের রং জ্বলে খাক্ হয়ে গিয়েছে। রাজেশ্বরী ও হুস্‌না হাঁ করে গালে হাত দিয়ে ব'সে শুধু ছোকরার দিকে তাকিয়ে।

গান শুরু হল। এবার মৌজ্দিন আমার দিকে তাকিয়ে এমন কয়েকটি বিচিত্র ফিরৎ আরম্ভ করল যে, আমার মাথা গেল ঘুরে এবং মাইফেল শুদ্ধ লোক জেনে গেল—আমি অপ্রস্তুত হয়েছি। পরেই বশীরের দিকে নজর দিয়ে এমন তান-কর্তব জুড়ে দিল যে, বশীর নাকে চোখে ডোবে আর কি! তবুও বশীর হার্মোনিয়াম ছাড়েনি, বলিহারি তার জেদ। আমি বাজানো ছেড়ে দিলাম। সারেঙ্গীরাও লবেদম হয়েছে, কিন্তু ওরা কখনও গানের মধ্যে সারেঙ্গী ছেড়ে দেয় না। যাই হ'ক, ব্যাপার দেখে ওস্তাদ আমার হার্মোনিয়মটি টেনে নিলেন। এবার যেন কি হয় না হয়, মাইকেল যেন শ্বাস বন্ধ করে প্রতীক্ষা করছে।

ওস্তাদ তো ওস্তাদই। ওঁর উপর ছিল বিশ্বনাথজীর আশীর্বাদ। তিনি মৌজ্দিনের সঙ্গে যেন অন্তর্যামী হয়ে বাজাতে লাগলেন। মৌজ্দিন কিছুতেই তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারল না। মানুষের গলায় যতরকম ফান্দা ও পেঁচ হতে পারে, মৌজ্দিন সেগুলি একে একে শেষ করতে লাগল। এমন সময়ে ওস্তাদ এমন একটি তান নিলেন, যা তিনি ছাড়া আর কেউ পারত না এবং যার মর্ম আমি বুঝতাম। মৌজ্দিন একটু দম্ মেরে থাকল। ওস্তাদ তানটি শেষ করেই মৌজ্দিনকে বললেন, 'বেটা, তুমহারা গলেকা কাম্ তো হম্ করকে দিখায়া অব হমারা বাজাকা কাম্ভি তো কুছ গলেমে দেখলাও।' মৌজ্দিন হাত জোড় করে বলল, 'ওস্তাদ, আর একবার করে দেখান।' এ কথা সে বলতেই পারে; কারণ ওস্তাদই তাকে ও রকম পরীক্ষা করেছিলেন। ওস্তাদ অবিকল সেই তানটি করে দেখিয়ে দিলেন। শেষ হতে না হতেই মৌজ্দিন ধরে নিয়েছে। নিখুঁতভাবে সে যখন তানটি শেষ করে নিয়ে এল, তখন বাহবার চোটে যেন ছাদ ভেঙ্গে পড়ে। ওস্তাদ মৌজ্দিনকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলতে লাগলেন এবং অস্পষ্ট বিড়বিড় করে কি যেন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। কোলাহল থেমে গেলে ওস্তাদ সকলকে উদ্দেশ করে বললেন—'ভাইসব শুনে রাখো, ঐ তান গলায় করতে পারতেন একমাত্র আহ্মদ খাঁ খেয়ালী, আর কেউ নয়। আর আজ এই মৌজ্দিন ঐ তানটি কমাল করল। এর পর আজ কিছু হবে না। আজকের মত খতম।...

...ওস্তাদ মৌজ্দিনকে সোজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেটা! যাবে তুমি আমাদের সঙ্গে, শ্যামলালের সঙ্গে?' সে তৎক্ষণাৎ বলল 'সেটা আপনার অনুগ্রহ, আমি প্রস্তুত।' চলল সে আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে। পরে জানলাম, তার বাপ মা আত্মীয় বলতে কেউ নেই। ডালকামণ্ডীর তয়ফাওয়ালীরা তাকে গান গাইয়ে নেয়, সকালে জিলাবী ও দু'বেলা লুচি হালুয়া খেতে দেয়। যাই হোক্—সে রাত্রিতে আমাদের ওখানে খুব করে মিঠাই রাবড়ি খেল, আমি আর চন্দন

দাঁড়িয়ে থেকে তার খাওয়ার তদারক করলাম।...ওস্তাদ পরের দিন সকালে মৌজ্‌দিনকে ডেকে এ কথা সে কথার পর জিজ্ঞাসা করলেন 'কাল যে তুমি ললতের মধ্যে ললতের তান করলে, এ তুমি শিখলে কার কাছে?' মৌজ্‌দিন চেয়েই থাকল, কথার উত্তর দিল না। আমি তাকে আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বললাম 'ওস্তাদ একটি তান করেছিলেন, শেষের তানটি। ললত্‌ রাগের মধ্যে মধ্যমকে নূতন করে সুর করে সেখান থেকে ললতের চক্কর ঘুরে এসে প'ল মুখে। তুমিও সেই তান করলে। ওস্তাদ জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি ঐ কাজটি কার কাছে শিখেছ?' সে তখন বলল 'আমি কারুর কাছে শিখিনি, খোদা জানেন।' আমরা সকলে অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম 'ললতের গানটি পেলে কার কাছে?' সে সরল উত্তর দিল 'কারুর কাছে পায়নি, সত্য বলছি। হুস্‌না ঐ গানটি করলেন, আমার খুবই ভাল লেগেছিল, তাঁর কথা ও সুর নকল করে গেয়েছিলাম।' ছোক্‌রা বলে কি! হয় সে ভূত, নয় তো মিথ্যাবাদী। দেখলাম ওস্তাদ গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে গড়্‌গড়ার নলটি মুখে করলেন। তার মেজাজের রকম দেখে আমরা মৌজ্‌দিনকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলাম।...

...শ্যামলালজী শেষে বললেন—'মৌজ্‌দিনের সঙ্গে আলাপ করে দেখো। সে না জানে রাগ কাকে বলে, না জানে তাল, অথচ রাগ ও তালে গান করে। মাত্র একবার শুনেই গোটা গান আয়ত্ত করে ফেলে। লজ্জার কথা বাইরে প্রকাশ করব কি! মৌজ্‌দিন রেখাবগান্ধার জানে না। ওকে কখনও সারগম করতে শুনবে না।'

বাবুজীর মুখে এই বিনা সাধনায় অদ্ভুত সিদ্ধির কথা শুনে আমার হৃদয় শ্রদ্ধা বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল...সকাল-বিকেলে যখনই সুবিধা পেয়েছি, ঐ সরল শিশুর মত ব্যক্তির সঙ্গে গল্পগুজব করে বুঝতে পারলাম, বাবুজী যা বলেছিলেন, তাই ঠিক। মৌজ্‌দিন রাগ তাল জানেন না, শিক্ষাও করেননি, সারগমও সাধেননি। ঠিক যেমন হাঁসের বাচ্চাকে জলে ছেড়ে দিলে সে আপনি সাঁতার কাটে, খেলা করে, মৌজ্‌দিনও সেরকম গান করেন, রাগে ও তালে। পূর্বজন্মের সংসিদ্ধি ছাড়া এর আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে?...

'মৌজ্‌দিন ঠুংরি গাইতেন অসাধারণ, গজল্‌-দাদ্‌রা গাইতেন অল্প; কিন্তু যা গাইতেন, সেগুলি হ'ত মারাত্মক। এর মধ্যে একখানি 'নদীয়া নারে হিরায় আই কঙ্গনা' গানটির সঙ্গে এমন একটি ঘটনা মনে পড়ছে যার মধ্যে মৌজ্‌দিনের হঠকারিতা ও বাঈজী-বিদ্বেষ প্রকট হয়েছিল।...

...আগ্রাওয়ালী মালকার মত অমন নম্র নিরহঙ্কার বাঈজী খুব কমই দেখেছি। ইনি একদিন বাবুজীর অন্তরঙ্গগোষ্ঠী[কে] নিমন্ত্রণ করলেন তাঁর বাড়িতে সুগ্‌গন বাঈজীর গান উপলক্ষে। সুগগন নূতন এসেছেন কলকাতায়, সম্প্রতি মাল্‌কার

অতিথি। এঁর গান পরেও অনেক বার শুনেছি; এঁর মত দাদ্‌রা গানের শিল্পী আমি আর দেখিনি। শ্যামলালজী, মৌজ্‌দিন, বশীর প্রভৃতি আমরা উপস্থিত। সুগ্‌গন কোনও রকমে একখানা খেয়াল ও তেরানা সেরে নিয়েই পর পর তিন খানি দাদ্‌রা গাইলেন। দাদ্‌রার এমন কিছু বিশিষ্ট গড়ন আর কারিগরী আছে, যা না হ'লে দাদ্‌রা বলা চলে না। কেবল ছমাত্রার ছন্দ আর দোলা দিয়ে গান খালাস করলেই দাদ্‌রা হয় না—তাঁর গান শুনে বুঝতে পারলাম। সভাশুদ্ধ লোক তারিফ করল মৌজ্‌দিন বাদে। সুগ্‌গন একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন পান জরদা সেবনের ছলে। এমন সময়ে মৌজ্‌দিনের একখানা দাদ্‌রা হ'ক বলে রব উঠল। মালকা একটু অস্বস্তি বোধ করলেও সকলের মতে সায় দিতে হ'ল। মাত্র হার্মোনিয়মের সঙ্গতেই মৌজ্‌দিন গান ধরলেন। কিন্তু আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম তাঁর অশিষ্টতা দেখে। সুগ্‌গন পূর্বে 'নদীয়া নারে' [হিরায়ে আই কঙ্গনা] গানটি করেছেন; মৌজ্‌দিন সেই গানটিই ধরলেন। শুধু তাই নয়, সেই গানের ওপর চারগুণ রং চড়িয়ে দিয়ে। কোথায় ভেসে গেল বেচারী সুগ্‌গনের নদীয়ার কিনারা। তিনি অপমানে রাগ করে উঠে পাশের ঘরে বস্‌লেন। মাল্‌কা প্রায় কাঁদকাঁদ হয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গেলেন। আসর নিবে গেল।

ঐ অশিষ্টতা নিয়ে শ্যামলালজীর সঙ্গে যখন পরে অমিয়নাথ আলোচনা করেন এবং অনুযোগ করেন যে উনি তো ইচ্ছা করলেই মৌজ্‌দিনকে বারণ করতে পারেন—তার উত্তরে বাবুজী একটি সাংঘাতিক কথা বলেন। বললেন 'ওস্তাদ আমাকে বলেছিলেন খবরদার, "মৌজ্‌দিন গান করতে চাইলে ওঁকে নিষেধ করো না। নয়ত ও পাগল হয়ে যাবে রহমৎ খাঁর মত।" বাদল খাঁ বলেছিলেন, মৌজদিনের গানের সময় মুসিদের সঙ্গীতের সৈয়দ (কল্যাণকামী আত্মা) ভর করেন।

হদ্দু খাঁর বড় ছেলে রহমৎ খাঁ। এঁর পরিচয় আমার 'কুদ্‌রত্‌ রঙ্গিবিরঙ্গী'তে পাবেন। এঁর চেয়ে বড় গায়ক পণ্ডিত দিলীপচন্দ্র বেদীর মতে গোয়ালিয়রে হয়নি। এঁর স্বরপ্রয়োগ আবদুল করিম খাঁ নকল করতেন আর ভাস্কর বুয়া এঁর তানের। এমনকি আল্লাদিয়া খাঁর বড় ছেলে মন্‌জি খাঁ ও উল্লাস কশলকরের দাদাগুরু অনন্তমনোহর যোশীর ওপরও এঁর প্রভাব পড়েছিল। ইনি হদ্দু খাঁর প্রিয় শিষ্য সার্কাস ম্যানেজার বিষ্ণুপন্থ ছত্রের আশ্রয়ে থাকতেন। ছত্রের সার্কাসে ইন্টারভালের সময়ে খাঁ সাহেবের গান হত এবং গান গাইতে না চাইলে তাঁর আফিমের গুলি বন্ধ করে দেওয়া হত।

রহমৎ খাঁর মাথায়ও দস্তুরমত গোলমাল ছিল এ তাঁর রেকর্ড শুনলেও বোঝা যায়। তাঁর 'যমুনা কি তীর' আবদুল করিমের ঐ ঠুংরির পূর্বসূরী। তবে ওঁর ভূপালীতে উনি মধ্যমের আভাস দিয়েছেন, ইমনে কোমল নিখাদের কণ্ এবং মালকোশে রেখাব। এ সবই ওঁর মাথা বিগড়োনর পরের রেকর্ডিং। কিন্তু কী সুর!

আর তানে কি সাচ্চাই।

উনি মৌজ্‌দিনের গান শোনবার জন্য হঠাৎ একদিন কাশীতে এসে উপস্থিত। পৌঁছেই বললেন 'শুনলাম একটি ছেলে খুব ভাল গাইছে, নাম মৌজ্‌দিন, তার গান শুনতে চাই।'—ভাইয়া সাহেব বললেন, 'এ বেশি কথা কি? আপনাকে শোনানো তো ওর জন্মজন্মান্তরের পুণ্যের ফল। আপনি মুখ হাত ধুয়ে বিশ্রাম করুন, নাশতা করুন। বিকেলে আমরা মৌজ্‌দিনের আসরের ব্যবস্থা করব।' রহমৎ খাঁ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'না আমি এখনই শুনতে চাই তার গান।' হদ্দু খাঁ সাহেবের ছেলে, নিজে গোয়ালিয়র ঘরানার বিরাট ওস্তাদ, তাঁর কথা তো ফ্যালা যায় না, অতএব মৌজ্‌দিনকে বসানো হল। সে দিনদুপুরে ধরল একটা মালকোশের মামুলি আস্থায়ী, তবে মৌজ্‌দিনের গলায় সে আর মামুলি থাকল না। রহমৎ খাঁ শুনে খুব খুশি, তারিফ করে বললেন, 'সাবাশ্‌ বেটা, অব এক ঠুম্‌রী সুনাও।' মৌজ্‌দিন ধরলেন তাঁর পেটেন্ট ভৈরবীতে 'বাজু বন্ধ খুল খুল যায়।' হার্মোনিয়মেতে ভাইয়া সাহেব। এবার গানের মাঝখানেই তারিফ শুরু হল, আর সে তারিফ থামে না। মৌজ্‌দিনের গান শেষ হয়ে গেছে। খাঁ সাহেব তারিফ করছেন আর কাঁদছেন 'হায় আল্লা তুমি মৌজ্‌দিনের মত গলা ও তাসীর আমায় দিলে না কেন? আজ যে গান শুনলাম এর পর আমি আর গান জীবনে গাইব না।' সে চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা, লোকজন খাঁ সাহেবের পাগলামিতে অস্থির। শেষমেশ ভাইয়া সাহেব বললেন মৌজ্‌দিনকে 'তুই ব্যাটা ওঁর পায়ে পড় আর বল্‌ খাঁ সাহেব আপনার সামনে তো আমি বাচ্ছা, আমার গান তো কুড়দের শোনাবার গান, আপনি নিজে গান করুন তবে বুঝতে পারবেন আপনার গানের কাছে আমার এ টুটাফুটা গান রূপেয়াতে এক দামড়িও নয়।' কী আশ্চর্য! মেজাজ না থাকলে যিনি রাজা মহারাজাদের ফরমাসেও তানপুরো ধরেন না, মৌজ্‌দিনের এক কথায় বিরাট একটি হলক তান দিয়ে তোড়ি ধরলেন খালি গলায়ই। সে এমনই লরজদার তান, এমনই সুরেলা আর তার প্রতিটি দানার ওজন অন্তত পোয়াটাক হবে। সকলের মনে হল জানালা দরজাগুলো পর্যন্ত দুলে উঠল আর এক ডাকে তোড়ি রাগিণী যেন চক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল। মৌজ্‌দিন সে রকম তান জীবনে শোনেনি, বিস্মিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে তারিফ করে উঠল, আর সবাই বিশেষ করে ভাইয়া সাহেব তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তখন রহমৎ খাঁ বললেন 'তুমি ঠিক বলছ মৌজ্‌দিন, আমি ভাল গান করি?' তারপর কথঞ্চিৎ সামলে বললেন 'তুমি ঠিকই বলেছ আমি নিশ্চয়ই ভাল গান করি, ঠিক ঠিক, ঠিক্‌ই বলেছ।' এই কথা বিড়বিড় করতে করতে উনি কাশী ছেড়ে চলে যান।

·

অমিয়নাথ বড়ই ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। উনি একাধারে বদল খাঁ সাহেব,

শ্যামলাল ক্ষেত্রী, মৌজ্‌দিন এবং তাঁর গুরু গণপৎরাও ভাইয়া সাহেবের সান্নিধ্য পেয়েছেন, প্রাণভরে গহর মালকা থেকে শুরু করে নামী দামী সব তবায়েফদের গান দিনের পর দিন শুনেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ বলতেন অমিয়র 'বাজু বন্ধ খুল্‌ খুল্‌ যায়', মৌজ্‌দিন আর ফৈয়াজের পরেই নম্বরে আসে। আর ওঁর এস্‌রাজের হাত এতই মিঠে ছিল যে আমজাদ আলি খাঁর পিতা বিখ্যাত সরোদিয়া ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ একবার অমিয়নাথকে বলেছিলেন, 'আপনার হাতটা কিছুদিনের জন্য ধার দেবেন আমাকে পাঁচুবাবু', এ ছাড়া উনি বীণও বাজাতেন খুবই ভাল। এ হেন ব্যক্তির সযত্নে সঞ্চিত মালমশলা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন অমিয়নাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা রেবা মুহুরী। অমিয়নাথের মতে মৌজ্‌দিনের লাচাও ঠুংরির স্থির লাবণ্য সঞ্চিত হয়েছিল বড়ী মোতি বাইয়ের কণ্ঠে। পিতার কাছে ছাড়া এই বড়ী মোতি বাইয়ের কাছে তালিমও পেয়েছেন রেবা মুহুরী। এঁর গান আমি সত্যজিৎ রায়কে ডেকে এক সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে শোনাই 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি'তে হাত দেওয়ার আগে। কিয়ৎকাল ঐ ফিল্মটির দৌলতে রেবা সাধারণ শ্রোতার জগতে পরিচিত হন। কিন্তু এঁর বিরাট ঠুংরি, দাদরা, চৈতি, কাজরি ইত্যাদির খাজানার সামান্যতম অংশও নেবার উৎসাহ কেউ দেখাননি, না এঁর বড় আসরে কলকাতা শহরে প্রোগ্রাম বিশেষ হয়েছে। এখনকার কন্‌ফারেন্‌সের উদ্যোক্তারা সম্ভবত ওঁর অস্তিত্ব সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল নন।

শ্যামলাল ক্ষেত্রী, মৌজ্‌দিন খাঁ, বশীর খাঁ ইত্যাদির গুরু ভাইয়া সাহেব গণপৎ রাও সম্পর্কে দেবপ্রসাদ গর্গ বলেছিলেন উনি নাকি চন্দ্রভাগা নামক এক বাঈজির গর্ভে গোয়ালিয়রের মহারাজা দৌলতরাও সিন্ধিয়ার ঔরসজাত সন্তান। অমিয়নাথ সান্যালের 'স্মৃতির অতলে' ছাড়াও একটি লেখা 'গুরুজীর বৈঠকে' পড়েছিলাম বহু যুগ আগে, এটি ওঁর পুস্তকে স্থান পায়নি। যেটুকু মনে আছে লিখছি। তখনকার দিনে কালোয়াতি গানের ম্যহ্‌ফিলে সারেঙ্গি আজকালকার মত অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যায়নি। এটি সাতিশয় দুঃখের বিষয় যে কোনো নামকরা গাইয়েই সারেঙ্গি নিতে চান না কারণ আমাদের মার্গ সংগীত যে তিনটি কারণে অনন্য অর্থাৎ বিদেশীয় সংগীতের চেয়ে পৃথক তা হলো মিড় ও শ্রুতি। এক কোমল গান্ধারই চার পাঁচ প্রকারের গমক আছে, কোমল রেখাব তিন প্রকার। ভীমপলশ্রীতে আরোহণে গান্ধার নিখাদ চড়ে যায় অবরোহণে নামে। তীব্র মধ্যমের সম্বাদে ইমন ও মুলতানির নিখাদের শ্রুতি চড়া, অড়ানা ও দরবারির কোমল নিখাদ আরোহণে চড়া কোমল নিখাদ। এসব হার্মোনিয়ামে বলা বাহুল্য পাওয়া যায় না, সেই সঙ্গে মিড়ও এ যন্ত্রের এখতিয়ারের বাইরে। সেকালের আসরে সারেঙ্গি তো থাকতই, কখনও কখনও নাম করা তবায়েফদের আসরে দু দুজন সারেঙ্গিয়া, উপরন্তু কোনো নাম করা হার্মোনিয়াম বাজিয়ে থাকলে তো সোনায় সোহাগা। ফৈয়াজ খাঁও

সারেঙ্গি ছাড়া নিতেন ওঁর ছোটো মাসতুতো ভাই গুলাম রসুল খাঁকে। তার প্রধান কারণ অবশ্য গুলাম রসুল খাঁ সাহেব সে কালের ম্যাট্রিক পাশ। 'আংরেজি'নবিশ ছিলেন বলে ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কাছে তাঁর ভিন্নপ্রকারের খাতির ছিল। গয়ার সোনি, শ্যামলাল ক্ষেত্রী, বশীর খাঁ এঁরা সবাই দুর্দান্ত সঙ্গত করতেন, কিন্তু ভাইয়া সাহেবের স্থান ছিল অনন্য। ওঁর হার্মোনিয়াম থেকে কখনও পাওয়া যেত বাঁশির আওয়াজ, সারেঙ্গির ছড়ের টান, কখনও বা তারের যন্ত্রের জম্‌জমার কাজ।

অমিয়নাথ বলতেন ভাইয়া সাহেব কলকাতায় বছরে দুবার অন্তত আসতেন, প্রতিবারই পক্ষাধিক কাল থাকতেন, ওঁর এক শিষ্য দুলীচাঁদবাবুর বাগানবাড়িতে জলসায় অংশগ্রহণ করতেন, থাকতেন বড়বাজারে শ্যামলাল ক্ষেত্রীর কোঠায়। এক নম্বরের কুসংস্কারের ডিপো, এই ভাইয়া সাহেব মালতীর আতরে অভিষিক্ত শয্যাত্যাগ করতেন শীতের দিনে বেলা নটায়। তার কিছুক্ষণ আগে কোনো পরিচারক, অভাবে বশীর বা মৌজ্‌দিন ওঁর পদসেবা করতেন মিনিট দশ পনেরো। আর একজন একটি আয়না, চিরুনি আর পরিষ্কার একটি তোয়ালে বিছানার পাশে রেখে যেত। এর পর গোলাপী বালাপোশ নড়ে উঠত, মৃদুস্বরে একটি আওয়াজ শোনা যেত 'আরে শ্যামলাল!' 'জী ওস্তাদ', বলে শ্যামলালজী ওঁর মাথার কাছে এসে বসতেন। তখন বালাপোশের মধ্যে থেকে একটি পাকানো গোঁফজোড়া শুদ্ধ মুখমণ্ডলের আবির্ভাব হত। চোখ দুটি মেলে শ্যামলালজীর দিকে তাকালে এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হত। ব্যাপারটা খুবই সহজ এবং সোজা। ঘুম ভেঙে সর্বপ্রথম শ্যামলালজীর মুখ দেখা চাই। হঠাৎ অন্য কোনো ব্যক্তির মুখ যদি ওঁর দৃষ্টিগোচর হয় তো সারাদিনের যত প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা যেমন মুখ ধুতে গিয়ে দাঁতনের খোঁচা জিভে লাগা, ঐ বিরাট পাকানো গোঁফ যার ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন ঘটেছে দুই গালপাট্টার সঙ্গে তার বেবন্দোবস্ত হয়ে যাওয়া, মঘেই পানে মশলা কম বেশি হওয়া, আসরে ন্যাটা আব্‌দুলের বেএক্তিয়ার ধাতিনাড়া ধাতিনাড়া 'লগ্‌গী' বাজানো এ সবই সেই মনহুস অর্থাৎ অপয়ার মুখদর্শনের ফল।

শ্যামলাল ক্ষেত্রী জাতে পাঞ্জাবী হলেও উত্তর প্রদেশের আত্‌রৌলীর বাসিন্দা ছিলেন। ফৈয়াজ খাঁর শ্বশুর মেহবুব খাঁর (দরস পিয়া) সঙ্গে ওঁর হৃদ্যতা ছিল এবং ফৈয়াজ খাঁর বিয়েতে উনি উপস্থিত ছিলেন। সেই সুবাদে ফৈয়াজ খাঁ যখনই জোয়ান বয়সে শ্যামলালবাবুর শিষ্যা আগ্রার মালকাজানের টানে কলকাতায় আসতেন, তখনই শ্যামলাল ক্ষেত্রী ওখানে উপস্থিত হতেন। এখানেই অমিয়নাথ সান্যালের সঙ্গে খাঁ সাহেবের ঐতিহাসিক পহলি মুলাকাতের বর্ণনা ওঁর 'স্মৃতির অতলে'তে আছে, আমার 'কুদ্‌রত্‌ রঙ্গিবিরঙ্গী'তেও তার উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে। ফৈয়াজ খাঁকে কলকাতা চিনল ভূপেন ঘোষের অল বেঙ্গলের দৌলতে। সেটি ১৯৩৪ সালে, তখন খাঁ সাহেবের চুয়ান্ন বছর বয়স। ওঁর গান শুনে জ্ঞান গোঁসাই

বলেছিলেন, 'এই নেড়েই আসল নেড়ে, শিখতে হয় তো এরই কাছে শিখব।' ফৈয়াজ খাঁ সম্পর্কে দেবপ্রসাদ গর্গ যদু ভট্টর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলতেন 'এমনটি হয়নি, আর হবেও না।' অমিয়নাথ সান্যাল ফৈয়াজ খাঁকে শুনে লিখলেন :

> সুরের গায়কী, রাগের গায়কী বলতে ফৈয়াজ খাঁর কথাই মনে পড়ে। রাগ আলাপ করতে করতে তিনি যখনই যে সুরে সমাহিত হয়েছেন, মনে হয়েছে সেই সুরটিই যেন সেই রাগের চরম সুর। এবং সে কথা একমাত্র ফৈয়াজ খাঁ সাহেবেরই কথা। খেয়ালের অপূর্ব ভঙ্গির মধ্যে তিনি মাত্র লীলাচ্ছলে যে ঠোক আর লড়ির তানের বিচিত্র সিল্‌সিলা দিয়ে রাগকে কবলিত করে আমাদের সামনে পরিবেশন করে গিয়েছেন, সে কথা আজও ভুলতে পারি না। কারণ সে কথা ফৈয়াজ খাঁ সাহেবেরই কথা, অন্যের নয়। মাইফেলের ফৈয়াজ ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তা।

ফৈয়াজ খাঁ ও আগ্রা ঘরানা সম্পর্কে আমার অন্যান্য পুস্তকে অনেক কিছুই লিখেছি, তবে দেবপ্রসাদ গর্গ ওঁর প্রচুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছেন বলে ওঁর কাছে কিছু শোনা গল্প লিখছি। উনি আট বছর মুজফ্‌ফর খাঁর কাছে শেখার পর ফৈয়াজ খাঁ ও তাঁর শ্যালক ও প্রধান শিষ্য আতা হুসেন খাঁর কাছে শিখতে শুরু করেন। আতা হুসেন খাঁ আমার তিন নম্বর গুরু এবং সহজ করে গান তুলিয়ে দিতে ওঁর মত আর কোনো উস্তাদকে আমি দেখিনি। আমাকে শেখানোর সময়ে প্রায়ই তবলা থাকত না। তবুও গানের প্রতিটি অংশ এমন নির্ভুলভাবে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তুলিয়ে অংশগুলি জুড়ে দিতেন, যে পরে ঠেকার সঙ্গে বসলে আপনাআপনি গান তালের সঙ্গে মাত্রায় মাত্রায় বসে যেত। রাগের বর্তাও আমাকে বড় একটা শেখাতেন না। একবার গারা কানাড়ার তালিম হচ্ছে। মধ্যবিলম্বিত খেয়াল 'বারংবার' গলায় বসিয়ে দেওয়ার পর আমি বললাম 'খাঁ সাহেব, একটু রাগের রাস্তা দেখিয়ে দিন।' উনি জবাবে বললেন 'আপ আস্থায়ীকো লেকে চলিয়ে, রাস্তা আপকো আপহি আপ মিল জায়গা। আপতো গাতে হেঁ।' এই হল প্রাচীন আগ্রা ঘরানার তালিম। বন্দিশের মধ্যেই রাগের ফ্রেজগুলি প্যাক করে দেওয়া আছে, অতএব 'বন্দিশকো চিপক্‌কে রাগ বর্তাও—এ উপদেশ পুরুষানুক্রমে উস্তাদরা দিয়ে আসছেন। ইদানীং এ অঞ্চলে যে ঢিলে বাঁধুনির খেয়াল শুনতে পাচ্ছি তা উপরোক্ত ধারার ঠিক বিপরীত।

দেবপ্রসাদ বলতেন ফৈয়াজ খাঁ সাহেব প্রতিটি রাগের অন্তত একটি করে ধ্রুপদ ও ধামার শেখার ওপর বিশেষ জোর দিতেন। শরাফৎ হুসেনও আমাকে বলেছিলেন, ছেলেছোকরারা তান করলেই উনি বিষম চটে যেতেন বলতেন 'এই! অভি ইসি উমরমে তান করতা, বেসুরা হো যায়গা, ধ্রুপদ ইয়াদ কর্‌।' তবে

শরাফৎ অত্যন্ত প্রতিভাবান ছিল—ওর বেলায় ব্যতিক্রম হত। কন্‌ফারেন্‌সে খাঁ সাহেবকে তেরো চোদ্দ বছর বয়সের শরাফৎকে নিয়ে বসতে দেখেছি এবং সেটা শরাফ্‌তের গলা ভাঙার পূর্বাবস্থা, স্বচ্ছন্দে তখন তিন সপ্তকের তান মারত।

আতা হুসেন খাঁ কলকাতায় আসার পর চর্চার অভাবে বহু ধ্রুপদ ধামার নাকি ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু দেবপ্রসাদ বলতেন ফৈয়াজ খাঁর কোনো খাতাই ছিল না, আতা হুসেন খাঁকে উনি ট্রাঙ্ক থেকে খাতা বের করে শেখাতে বা নতুন করে লিখতে দেখেছেন, ফৈয়াজ খাঁর কোনো খাতাপত্রর বালাই ছিল না অথচ অজস্র ধ্রুপদ ধামার ও খেয়ালের বন্দিশ বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত মুখস্থ ছিল। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের কাছে ছোট খেয়াল শেখার সময়ে উনি ছোট ছোট করে গানের কথা কেটে কেটে ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে দিতেন, যেমন 'প্যারী নবল লাডলি লাড করো' গানটি উঠছে ছ মাত্রার পর থেকে। উনি শম্‌ থেকে 'নবল লাডলি' কথাটি ছ মাত্রায় উচ্চারণ করে সাত মাত্রা থেকে 'প্যারী নওল' বলে গানের মুখড়া ধরাতেন। এগুলি অতি সরল বোল বানানোর টেকনিক। ফৈয়াজ খাঁর মত বোল বানানো ওঁর বন্ধু উস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ সাহেব আমায় বলেছিলেন উনি জীবনে আর কোনো আগ্রা ঘরানার উস্তাদের কাছে শোনেননি। ফৈয়াজ খাঁ সাহেব মহিষাদলের রাজকুমার দেবপ্রসাদকে তালিম দেওয়ার ব্যাপারে যত মেহনত ও ধৈর্যের প্রমাণ দিয়েছিলেন এরকম ইতিপূর্বে শোনা যায়নি, কারণ উনি আর্টিস্ট ছিলেন, শিক্ষক ছিলেন না। অন্যদের শেখানোর ব্যাপারে অল্পেই ওঁর ধৈর্যচ্যুতি হত। কিন্তু দেবপ্রসাদকে নিজের সঙ্গে গাইয়ে অনেক হরকৎ শেখাতেন, চড়ার দিকে 'ফুট' বা গলা ভেঙে নেবার রেয়াজ, কতরকমের 'বিরহাকি পুকার' ও বিবিধ অলংকারের পৃথক পৃথক রূপ দেখিয়ে গলায় তুলিয়ে দিতেন। তা ছাড়া আলাপের পকড়ে কোন কোন সুরের ওপর জোর দিতে হবে, এক একটি সাংগীতিক বাক্য কীভাবে তৈরি করতে হবে এবং শেষ করে কী ভাবে ষড়জে ফিরে আসতে হবে, এ সব বড়ই যত্নের সঙ্গে ওঁকে তালিম দিয়েছিলেন। দেবপ্রসাদ বলতেন ওঁর গলা দিয়ে গমক বার করানোর জন্য এক সপ্তাহ খেটেছিলেন এবং যতক্ষণ দিনরাত রেয়াজ করিয়ে ওঁর পছন্দমত গমক বের হয়নি ততক্ষণ ছাড়েননি। ফৈয়াজ খাঁ যে বড় খেয়াল গাইতেন ও শিখিয়েছিলেন তা মধ্য বিলম্বিত লয়ে যা বড়ে গুলাম আলি খাঁ সেদিন পর্যন্ত গেয়ে গেছেন। আবদুল করিমই প্রথম অতি বিলম্বিত লয়ে খেয়াল গাওয়া চালু করেন। চৌতালের ধ্রুপদে স্থায়ী ও অন্তরা তিন চার বা পাঁচ আবর্তনে বাঁধা থাকে কিন্তু কখনোই এক আবর্তনে স্থায়ী অংশ শেষ হয় না। তাই খেয়াল গানেও অতি বিলম্বিত এক আবর্তনে স্থায়ী শেষ করা ওঁর কাছে অশাস্ত্রীয় ব্যাপার ছিল। আতা হুসেন খাঁও ঠিক এই ভাবেই আমায় আস্থাই শিখিয়েছেন যেখানে বন্দিশ এমন সুন্দর বাঁধা লয়ে চলত যে তবলা ছাড়াই

শম্‌এ আসতে কোন অসুবিধে হত না। জানি না এ ফৈয়াজ খাঁর দেওয়া তালিম কিনা। আতা হুসেন মেহবুব খাঁর (দরস পিয়া) সন্তান হলেও ভগ্নীপতি ফৈয়াজ খাঁর গাণ্ডাবন্ধ শাগীর্দ এবং দীর্ঘকাল উনি এবং ওঁর ভাই বান্দা হুসেন বড় খাঁ সাহেবের পেছনে তানপুরো ধরেছেন। আর একটি বহুমূল্য তালিম ফৈয়াজ খাঁ দিয়েছিলেন কাছের লোকেদের, তা হল জেনেশুনে কি করে রাগভ্রষ্ট হওয়া যায়, কিন্তু সেটা রাগের রূপ ফোটাবার জন্য, এবং ঐ ভ্রষ্ট হবার পদ্ধতিকে বলা হত 'সুম্'। রাগের মধ্যে কি ভাবে অন্যান্য রাগের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় এর হেডমাস্টার ছিলেন খাঁ সাহেবের প্রখ্যাত শাগীর্দ এবং ভাতখণ্ডেজীর প্রধান শিষ্য, শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর।

খাঁ সাহেবের প্রিয় রাগ ছিল ললিত, রামকেলি, তোড়ি, লচারি-তোড়ি, জৌনপুরি, খট, গৌড় সারঙ্গ, ভীমপলশ্রী, মূলতানি, ইমন-কল্যাণ, পূরিয়া, পূরবী, গৌরী, শ্রী, পরজ, বেহাগ, নট বেহাগ, কেদারা, কামোদ, ছায়ানট, জয়জয়ন্তী, বাগেশ্রী, বারোয়া, দরবারি কানাড়া, ইদানীং গারা কানাড়া এবং অবশ্যই ভৈরবী। এগুলিই উনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতেন। এর বাইরে রামগৌরী, কাপর গৌরী, মালাগৌরী, ভীম, টঙ্কশ্রী, প্রদীপকি, বাহাদুরি তোড়ি, লছমী তোড়ি, খেম কল্যাণ, হেম খেম, কামোদ নট, শুদ্ধ নট, বিভিন্ন কানাড়া যথা সুঘরই, হুসেনি, সুহা রইসা ইত্যাদি যাঁরা বহু দিন ওঁর সঙ্গ করেছিলেন তাঁরা শুনেছেন। আম পাবলিক শোনবার সুযোগ পায়নি কারণ খাঁ সাহেব বলতেন সাধারণ শ্রোতা পরিচিত রাগ শুনতেই ভালবাসে। 'অছোপ রাগ' ম্যাহ্‌ফিলের জন্য নয়। বড়ে গুলাম আলির ফিলজফিও ওই একই। আল্লাদিয়া খাঁ সাহেবের ঠিক উলটো। সাধারণ রাগের মধ্যে ফৈয়াজ খাঁর প্রিয় ছিল সকালে ললিত রামকেলি তোড়ি, সন্ধ্যায় পুরিয়া ইমন, রাত্রে বাগেশ্রী জয়জয়ন্তী নটবেহাগ ও দরবারি। এদের মধ্যে আবার সবচেয়ে ফেভারিট জয়জয়ন্তী ও দরবারি কানাড়া, আগ্রা ঘরানার রাতের ডার্লিং রাগ। মৌসুমী রাগের মধ্যে পড়ত মিঞা মলহার, সুরদাসী মলহার, গৌড় মলহার, মেঘ, বসন্ত, হিন্দোল, হোরি কাফি ইত্যাদি। জয়জয়ন্তী খাঁ সাহেব দেশ ও বাগেশ্রী অথবা খাম্বাজ অঙ্গে গাইতেন এবং বলতেন এ রাগ ঠাকুর হরিদাসের সৃষ্ট। আগ্রা ঘরানার প্রবর্তক অলখ দাসের ঠাকুর হরিদাসের সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা ছিল কিনা জিজ্ঞেস করায় দেবপ্রসাদ গর্গকে মুচকি হেসে ফৈয়াজ খাঁ বলেছিলেন তার আগে খোঁজ কর সি আর (চিত্তরঞ্জন) দাশের ওঁরা কেউ হতেন কিনা।

একবার ফৈয়াজ খাঁর মহিষাদলে থাকাকালীন এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। বড়ে গুলাম আলি খাঁও রয়েছেন পাশের ঘরে এবং দিবারাত্র তান মারছেন সুরমণ্ডল কোলে নিয়ে। হঠাৎ একদিন তাঁর শখ হলো প্রাসাদের গায়ে যে বিরাট পুকুর তাতে স্নান করবেন। ঐ বিরাট গোলাকার আকৃতি, মিশকালো রঙ আর পাকানো

গোঁফওয়ালা একজন মানুষ খালিগায়ে পুকুরে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে গলা সাধছে দেখে অদূরে রেলিং-এর ওপারে গ্রামের ছেলেছোক্‌রাদের ভিড় জমে গেল, এক আধটা ঢিলও পড়েছিল। জবাবে গুলাম আলি তৎক্ষণাৎ গোটা দুয়েক সপ্তকের তান মেরে দিলেন। ছোঁড়াগুলো চেঁচিয়ে উল্লাসে নৃত্য করছে আর উনিও সপাটে তান মারছেন এই কোলাহলের মাঝখানে আতা হুসেন খাঁ ফৈয়াজ খাঁকে খবর দিলেন 'শীগ্‌গীর আসুন ভাই সাহেব, দেখুন দীঘির পাড়ে কী কাণ্ড হচ্ছে।' ফৈয়াজ খাঁ তখন চশমা পরে যথারীতি নিজের শার্ট ও পাজামার কাপড় কাঁচি দিয়ে কাটতে ও সেলাই করতে ব্যস্ত। গ্রাম্ভারী মানুষ, বেরিয়ে এসে এ সব দেখে উনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। গুলাম আলি ফিরতেই প্রচণ্ড এক ধমক। বড়ে গুলাম আলি তো অবাক্ 'হমনে কেয়া কিয়া চাচা, মেরা কসুর তো কহিয়ে, আমাকে দেখে বাচ্চারা মজা পাচ্ছিল, তাই আমিও ওদের হাসির একটু খোরাক যোগালাম দু চারটে তান মেরে, আপনি যদি নারাজ হয়ে থাকেন তো আমি মাফি চাইছি।' ফৈয়াজ খাঁ হেসে ফেলে আতা হুসেনকে বললেন 'ও এখনও নিজেই আট দশ বরসকা বাচ্চা রয়ে গেছে। যাও নাশতা করে নিতে বল।' মুনব্বর আলি এ গল্প আমার মুখে শুনে অসম্ভব চটে গিয়ে ঘোরতর প্রতিবাদ করেছিল 'গুলাম আলি খাঁ ঔর পানি! উনি জীবনে পুকুর পাড়ে যাননি। যত সব বাজে কথা মিথ্যে কথা।' দেবপ্রসাদ বানিয়ে গল্প বলার লোক নন। এই মজার ঘটনাটির আরও সাক্ষী রাজবাড়িতে ছিল এবং হয়তো এখনও আছে।

দেবপ্রসাদ গর্গর সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত একটি চিঠি দিয়ে। উনি লিখেছিলেন ৭৫ সালের অগস্ট মাসে রেডিওয় আমার প্রথম ন্যাশনাল প্রোগ্রামে জয়জয়ন্তী, গৌড়মলহার ও দেশ শুনে। প্রথম আলাপে উনি মানতেই চাননি যে আমি ফৈয়াজ খাঁর তালিমপ্রাপ্ত শাগীর্দ নই। তখনও আমি আতা হুসেন খাঁ সাহেবের কাছে শিখছি। প্রথম যেবার ওঁর জন্মদিন উপলক্ষে মহিষাদলে আমি সন্ধ্যার আসরে মলুহাকেদারা ও দেশ গেয়েছিলাম, খুব একটা ওঁর দিলখোলা তারিফ পাইনি। পেয়েছিলাম পরের দিন সকালের আসরে দেশি তোড়ি গেয়ে। সঙ্গত করছিলেন যোগ সাহেব, বেহালায়। খুব কম সংখ্যক শ্রোতা সে দিন ওঁর হলঘরে। যাঁরা ছিলেন তাঁরা ওঁরই শিষ্য-শিষ্যা। গানের শেষ দিকে দেখলাম ওঁর চক্ষে জল। শুধু বললেন, 'এ গান, এ গায়কি আপনি কোথা থেকে পেলেন ভাই? জানেন যেখানে বসে আপনি গান করছেন ঐ খানেই শেষ আমাকে আলাপ করে দেশিয় ধামারের তালিম দিচ্ছিলেন ফৈয়াজ খাঁ সাহেব। হঠাৎ কাশতে কাশতে উনি বাথরুমে উঠে গেলেন। বেসিনে দেখা গেল বেশ খানিকটা রক্ত। যক্ষ্মা! এটা বোধহয় ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারিতে হবে। সেই দিনই বিকেলের তুফান এক্‌সপ্রেসে ওঁকে দিল্লি হয়ে বরোদা পাঠানোর ব্যবস্থা করি। দিল্লিতে গিয়ে শরীর

আরও খারাপ হয় এবং হাসপাতালে ভর্তি হন। এপ্রিল মাসের গোড়ায় কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে বরোদা যান এবং শুনেছিলাম ভালই আছেন, চিকিৎসা চলছে। সুনীল বসুর কৃপায় ওঁর শেষ বয়সের অসুস্থ অবস্থার গান ওয়্যার রেকর্ডিং করে রাখা হল বরোদা রেডিও স্টেশনে বেশ কয়েক ঘণ্টা। এই সময়েই সে টাকায় ওঁর চিকিৎসার কিছুটা খরচা উঠল। সেই মরা হাজা গানই এখন এইচ.এম.ভির দৌলতে আমরা শুনছি। ৩০ অক্টোবর অজ্ঞান হয়ে যান ৫ নভেম্বর সব শেষ। আজ সবচেয়ে বেশি তাঁর কথা মনে পড়ে চোখে জল আসছে।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শুনতে পাই কেউ কেউ অনুযোগ করছেন যে আমি নাকি মুসলমান গাইয়ে বাজিয়েদের সম্পর্কেই লিখে থাকি, তাদের প্রশংসায়ই পঞ্চমুখ, হিন্দুরা আমার বইয়ে শিরোপা পান না। অযোধ্যা কাণ্ডের পর কেন্দ্রে রামরাজ্য এবং বঙ্গে বি.জে.পি-র অনুপ্রবেশের পর এ প্রকার টিপ্পনির সম্মুখীন হতে হবে এতে আশ্চর্য বোধ করছি না।* তবে তথ্যের দিক দিয়ে এ ধরনের অভিযোগ চার ঠ্যাঙে দাঁড়ায় না। বাঙালি সংগীতানুরাগী পাঠকদের আমার কলমের মাধ্যমেই ভাস্কর বুয়ার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। কিরানার গঙ্গুবাই, হীরাবাই, ভীমসেন, জয়পুর ঘরানার মল্লিকার্জুন মনসুর, কেসর বাই, মোঘুবাই, আগ্রা ঘরানার সোহন সিং, গোয়ালিয়রের রাজাভইয়া পুছওয়ালে, পণ্ডিত পরিবার, কলকাতার জ্ঞান গোস্বামী, ভীষ্মদেব, তারাপদ চক্রবর্তী, চিন্ময় লাহিড়ী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ—সকলের সম্পর্কেই দু দশ কথা আমার 'কুদ্‌রত্ রঙ্গিবিরঙ্গী' ও 'মজলিস'-এ পাওয়া যাবে। এ ছাড়া বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে ও শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরের ওপর একটি আলাদা পরিচ্ছেদ আমার বইয়ে আছে। আর লেখার সময়ে আমার মাথায় হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদ কখনও উদয় হয়নি। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসও বলে যে এ প্রভেদ কখনই ছিল না এবং সংগীতের ক্ষেত্রে এই দুই গোষ্ঠীর সংস্কৃতির একীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছিল। মুসলমানরাই পুরুষানুক্রমে আমাদের গানবাজনার হাল ধরেছেন, তাঁদের বহু হিন্দু শিষ্যশিষ্যা তাঁদের ঘরানার নাম রওশন্ করেছেন, এ ঐতিহাসিক তথ্য সর্বজনগৃহীত এবং একে যদি কেউ না মানতে চান তো আমি নাচার। কেউ কেউ আরও বলেছেন যে বাংলায় ধ্রুপদ ধামারিরা তো হিন্দু ছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে আমি লিখি না কেন? জবাবে বলতে হয় আমি নিছক পাঠ্যপুস্তক মার্কা ঐতিহাসিক নই, আমার লেখায় গালগপ্পর রাংতার মোড়কে কিছু প্রয়োজনীয় ঘরানাদার গায়কির বিশ্লেষণ ও সৃজনীশক্তির ইতিহাসও থাকে। আর পাঁচটা গোলা লোকের তুলনায় আমার ধ্রুপদ ধামারের জ্ঞানের পরিধি বৃহত্তর হতে পারে, কিন্তু আমার স্পেশালাইজেশনের ময়দান উত্তর ভারতের খেয়াল ও ঠুংরি। অতএব

পূর্বাঞ্চলে যাঁরা বেতিয়া ও বিষ্ণুপুর ঘরানার তালিম পেয়েছেন বা শেষোক্ত ঘরানার অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠিত গায়ক ও শিক্ষক যাঁরা এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তাঁদেরই এ কর্ম করা সাজে। আমার ক্ষেত্রে এটা অনধিকার চর্চার পর্যায়ে পড়বে।

মহারাষ্ট্রে চিরকালই হিন্দু গাইয়ে বাজিয়ের ছড়াছড়ি। এব জন্য মূলত দায়ী প্রাচীনতম খেয়াল ঘরানার প্রবাদ পুরুষ গোয়ালিয়রের হদ্দু খাঁ সাহেব। উনি বলতেন মুসলমানদের আমি শেখাব আর ব্যাটারা নাম করবে বাপ চাচার! এর চেয়ে আমি শেখাব হিন্দুদের, আর বেছে বেছে ব্রাহ্মণদের, কারণ বামুনের ব্যাটারা তেজদিমাক্, তাদের বুদ্ধি সবচেয়ে বেশি। সিন্ধিয়া হোলকর ও গাইকোয়াড় মহারাজাদের আমলে গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বরোদায় মারাঠি ব্রাহ্মণদের অভাব ছিল না। এই কারণেই নিজের পরিবার ও আত্মীয়ের বাইরে হদ্দু খাঁর নামকরা শিষ্যদের মধ্যে পড়তেন সার্কাস ম্যানেজার গায়ক বিষ্ণুপন্থ ছত্রে, বাবা দীক্ষিত, অন্ধ বালকৃষ্ণবুয়া সিনিয়র, বাসুদেব রাও জোশী, দেবজী বুয়া ইত্যাদি। বিষ্ণু পণ্ডিত তাঁর বিখ্যাত পুত্র কৃষ্ণরাও শঙ্কর পণ্ডিত এবং নাতি লক্ষ্মণ পণ্ডিত, এঁরা মারাঠি হলেও গোড়ায় গোয়ালিয়র ও পরে দিল্লির বাসিন্দা। শঙ্কর পণ্ডিতের শিষ্য রাজাভইয়া পুছওয়ালে ভাতখণ্ডেজীর সঙ্গে জুটে গিয়েছিলেন। আর এক বড়ে নিসার হুসেন খাঁর নাম করা শিষ্য রামকৃষ্ণ বুয়া ভাজে মহারাষ্ট্রে গোয়ালিয়র ঘরানার গায়কির প্রসারের জন্য দায়ী। কিন্তু যাঁর বা যাঁদের চেষ্টায় ওই অঞ্চলে এই গায়কি জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁরা হলেন প্রধানত বালকৃষ্ণ বুয়া ইছলকরনজিকর এবং তাঁর শিষ্য বিষ্ণু দিগম্বর। এঁদের শিষ্য প্রশিষ্যদের মধ্যে অনেক নামি দামী গায়ক হয়েছেন, বিষ্ণু দিগম্বরের শিষ্য ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, বিনায়করাও পটবর্ধন, নারায়ণ রাও ব্যাস, বিষ্ণু দিগম্বরের পুত্র ডি.ভি.পলুস্কর। বালকৃষ্ণ বুয়ার শিষ্য অনন্তমনোহর যোশী (অন্তু বুয়া) গুরুর কাছে পর্যাপ্ত তালিম পেয়ে রহমৎ খাঁর পেছনে চার বছর তানপুরো ধরেছিলেন যদিও রহমৎ খাঁ কাউকেই শেখাননি, অন্তু বুয়াকেও নয়। এঁরই পুত্র গজানন রাও যোশী এবং তাঁর শিষ্য আজকালকার উঠতি খ্যাতনামা গায়ক উল্লাস কশলকর, গোয়ালিয়র গায়কির অন্যতম ধারক এবং বাহক। যদিও ইনি গুরুর কাছে জয়পুর ঘরানার তালিম নিয়ে অসাধারণ দক্ষতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সে গায়কিও গাইছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর ভাতখণ্ডেজী ও উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাছে যাওয়ার পূর্বে বেশ কিছুদিন অন্তু বুয়ার পেছনে তানপুরো ধরেছিলেন। রতনজনকর মাথা খাটিয়ে আগ্রা ও গোয়ালিয়রের যে অসাধারণ মিলন ঘটিয়েছেন তাঁর গায়কিতে, উপরোক্ত তালিম তার একটা কারণ। আরও বলতে হয় ফৈয়াজ খাঁ ছাড়াও আমার দু নম্বর গুরু মুশ্‌তাক হুসেন খাঁর প্রভাবও ওঁর ওপর পড়েছিল। মুশ্‌তাক হুসেন খাঁ গোয়ালিয়রই গাইতেন যদিও তাঁর প্রাথমিক তালিম মামা, আগ্রা-আতরৌলি ঘরানার পুত্তন খাঁ

এবং তাঁর বিখ্যাত ভ্রাতা মেহবুব খাঁর (দরস পিয়ার) কাছে হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ অঞ্চলে পণ্ডিত হিসেবেই রতনজনকরকে লোকে অল্পবিস্তর চেনে, বয়সকালের গায়ক শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকরকে শোনবার সৌভাগ্য এদের হয়নি।

উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জীবনীর সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। ভাস্কর বুয়ার সম্পর্কেও আমার বইয়েতে দেখে থাকবেন অসম্ভব দারিদ্র্যের মধ্যে কিভাবে লাথি ঝাঁটা খেয়ে উনি তালিম হাসিল করেন চার গুরুর কাছে এবং কালে সংগীতের জগতে দিক্‌পালের পর্যায়ে পৌঁছন। বালকৃষ্ণবুয়া ইছলকরনজিকরের প্রথম জীবন এঁদের মতই কষ্টের মধ্যে দিয়ে কেটেছিল। মাসে দু আড়াইশ টাকা ধরিয়ে দিয়ে সপ্তাহে একদিন মাস্টারের কাছে গান শিখে যে সব আদুরে ছেলেমেয়েরা বছর দশেক পার হবার আগেই রেডিওতে গান করার উচ্চাশা পোষণ করে ও টি.ভিতে প্রোগ্রাম করার জন্য জান দিতে পারে, তাদের মা-বাপদের জন্যই এই পরিচ্ছেদটির অবতারণা। বালকৃষ্ণর জন্ম এক দেশস্থ ব্রাহ্মণ পরিবারে, কোলহাপুরের কাছে চন্দুর গ্রামে। সে কালে মহারাষ্ট্রের গ্রাম অঞ্চলে ব্রাহ্মণরা প্রধানত ভিক্ষাবৃত্তি করে দিনগুজরান করতেন, পালা পার্বণে পুজোআচ্চা হলে দক্ষিণাও পেতেন। বালকৃষ্ণের ঠাকুরদাদা পেশাদার ভিক্ষুক ছিলেন, ছেলেরাও তাই। বালকৃষ্ণর বাবা রামচন্দ্রর গানের শখ ছিল, তাই তিন ভাইয়ের ওপর সংসার ছেড়ে দিয়ে সাতারায় চলে যান। বালকৃষ্ণর মা চাইতেন ছেলেও বাপ পিতামহর পেশা ধরুক। বাপ চাইতেন ছেলে গাইয়ে হোক। এ নিয়ে মতান্তর চরমে পৌঁছবার পূর্বেই মার মৃত্যু হয়, বালকৃষ্ণ তখন মামার বাড়িতে থেকে স্কুলে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ শিখছে, বানান করে মারাঠিও পড়তে পারে। মামার বাড়িতে জায়গা যখন হলো না তখন বালকৃষ্ণ গেল কাকাদের কাছে ইছলকরনজিতে। গালভরা কিছু শ্লোক মুখস্থ করে পালা পার্বণে দক্ষিণা যোগাড় করা ও ভিক্ষাবৃত্তির অ্যাপ্রেন্টিসশিপ করায় বালকৃষ্ণর ঘোরতর আপত্তি ছিল, এ জন্য কাকাদের কাছে নিয়মিত ঠ্যাঙানি খেতে হত। শেষে উদ্ব্যস্ত হয়ে একদিন বাড়ি থেকে বালকৃষ্ণ একবস্ত্রে পালাল, তখন তার বয়স দশ বছর।

কিয়ৎদূরে মহিসাল নামক একটি ছোট গঞ্জে এক হরিদাস বা কীর্তনীয়ার কাছে বালকৃষ্ণর আশ্রয় জুটল। এঁর নাম বিষ্ণুবুয়া যোগলেকর। বাড়ির কাজকর্ম সব করার ফাঁকে ফাঁকে দু বছর ধরে কীর্তনের তালিম হলো। কিন্তু বালকৃষ্ণর উচ্চাশা কালোয়াতি গান শিখবে। রামচন্দ্র বুয়া 'জাট' শহরে আছেন জানতে পেরে বিষ্ণুবুয়া ছেলেকে বাপের হাতে সমর্পণ করার ব্যবস্থা করলেন। যখন বালকৃষ্ণর বয়স তেরো তখন পিতার কাছে নিয়মিত সংগীত শিক্ষার সুযোগ হলো বটে কিন্তু এমনই তার কপাল, পরের বছরই বাপ দেহ রাখলেন। জাটের রাজা সৌভাগ্যবশত রামচন্দ্রর খোঁজ খবর রাখতেন, তাঁর অকালমৃত্যুর সংবাদ পেয়ে

পনেরো বছরের অনাথ ছেলেটির জন্য দশ টাকার মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন, সেই সঙ্গে নিখরচায় আলিদাত খাঁ নামে এক উস্তাদের কাছে শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা। যতই হেঁজিপেঁজি খাঁ সাহেব হন না কেন, তিনি জাট রিয়াসতের ওস্তাদ, তাঁর বয়ে গেছে এই চালচুলোহীন হিন্দু ছোক্‌রাকে তালিম দিতে। অতএব বছরখানেক বৃথাই ওস্তাদের পা টেপা হুঁকো ভরার পর বালকৃষ্ণ আবার রওনা দিল গুরুর খোঁজে। এবার গন্তব্যস্থান কোলহাপুর। এখানেও ওই একই কাহিনী। ভাউরাও কগওয়াদকরের তখন যথেষ্ট নামডাক। এঁর বাড়িতে বিনি পয়সার চাকরি করতে করতে একদিন হুঁকো হাত থেকে পড়ে ফেটে যাওয়াতে জুতো পেটা খেয়ে প্রস্থান। বিনা টিকিটে এবং হাঁটা পথে ভিক্ষে করতে করতে মিরজ হয়ে পৌঁছল বালকৃষ্ণ হামনাবাদে, সেখানে হুসেন খাতরে নামে এক উস্তাদ ছিলেন তাঁর কাছে তালিম পাবার আশায়। গিয়ে শুনল সম্প্রতি তাঁর স্বর্গবাস হয়েছে। এই শহরে স্বামী মাণিকপ্রভু বাস করতেন, তাঁর ছত্তরে কাঙালিভোজন হত। ইনি বালকৃষ্ণকে আশীর্বাদ করে বলেন 'উত্তর ভারতে যাও, সেখানে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।' বালকৃষ্ণ হাঁটাপথে শোলাপুর হয়ে পুনে পৌঁছল মাসখানেক পরে। উত্তর ভারত তো বহুদূর, তবে পুনে শহরে একাধিক নাটক কোম্পানি আছে, তারা ইন্দোর গোয়ালিয়র ঝাঁসি পর্যন্ত যায়, যদি একটা ছোটখাটো চাকরি জোটে সেই আশায়। সে কালে চোদ্দ পনেরো বছরের বালক, মোটামুটি যার ভাল গলা, নাটক কোম্পানিতে ফিমেল পার্টে লেগে যেত, দু বেলা খাওয়া আর পাঁচ দশ টাকা মাইনেয়। বালকৃষ্ণরও কপালে একটা ছোটখাটো মেয়েদের পার্ট জুটল। মাইনে সাত টাকা, খাওয়া ফ্রি।

কিছুদিন পরে বালকৃষ্ণর নাটক কোম্পানি গেল পুনে থেকে বোম্বাই। সেখানে একদিন গিরগাঁওর কাছে মুগভাট মহল্লায় বেড়াতে বেড়াতে বালকৃষ্ণর কানে গেল এক বাড়ির দোতলা থেকে গানবাজনার আওয়াজ। দোতলায় উঠে দেখে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাঁর শিষ্যবর্গ নিয়ে হৈ হৈ করে তান করছেন। ঘরের এক কোণে উপবিষ্ট বালকৃষ্ণকে গানের শেষে ভদ্রলোক পরিচয় জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলেন সে রামচন্দ্রবুয়ার ছেলে। গৃহস্বামীর নাম বামনবুয়া, স্বর্গত রামচন্দ্রবুয়ার বন্ধু, তিনি বালকৃষ্ণ নাটক কোম্পানিতে চাকরি করছে শুনে মোটেই খুশি হলেন না। তিনি নিজে শেখাতে প্রস্তুত ছিলেন, তবে বামনবুয়া থাকেন ইন্দোরের কাছে 'ধার' নামক এক ছোট নেটিভ স্টেটে। সেখানে তিনি ধারের রাজবাড়ির পুরোহিতের কাজ করেন। ওঁর বক্তব্য যদি ধার যেতেই হয় সেখানে হদ্দু হস্‌সু খাঁ সাহেবের তালিমপ্রাপ্ত নামকরা শিষ্য দেবজীবুয়া আছেন, তাঁর কাছে শেখাই উচিত। সে ব্যবস্থা তিনি করবেন।

ইতিমধ্যে বামনবুয়া খবর পেলেন বালকৃষ্ণর মামা তার বিয়ের সব ঠিক করে

ফেলেছেন ওঁর মেয়ের সঙ্গে এবং নাটক কোম্পানিতে বালকৃষ্ণর খোঁজে দূত এসেছে। দক্ষিণ ভারতে যেমন মামা অত্যন্ত সুপাত্র বলে বিবেচিত হয়, সে কালে মহারাষ্ট্রর বিয়ের আসরে মামাতো ভাই বোন রূপগুণ থাকলে পাতে পড়তে পেত না। কারণ তারা ভিন্ন গোত্রের অতএব কোনো সামাজিক বাধা তো নেই, উলটে তা নাকি রাজযোটক। আমার মারাঠি ও অন্ধ্রপ্রদেশের বন্ধুরা বলেন আগের তুলনায় মামাতো পিস্‌তুতো ভাই বোনে বিবাহ অনেক কমে গেলেও গ্রামাঞ্চলে এ প্রথা এখনও চালু আছে। সে যাক, মামার পয়সায় ট্রেনে করে হবু বর বেদাগে পৌঁছে শাকচুন্নির মত মামাতো বোনের চেহারা দেখে সেই রাতেই কেটে পড়ল। এবার রওনা হাঁটা পথে ইন্দোর হয়ে ধার, আবার গুরুর খোঁজে।

অবশেষে বামনবুয়ার সুপারিশে দেবজীবুয়া বালকৃষ্ণকে গান শেখাতে রাজি হলেন। তিনি যে সে মানুষ নন, তাঁর মামা ছিলেন দ্বিতীয় বাজীরাওর সভাগায়ক, ধ্রুপদ শিখেছেন তিনি চিন্তামণি মিশ্রর কাছে, টপ্‌পা এবং খেয়াল হদ্দু হস্‌সু খাঁর কাছে, সর্বসাকুল্যে তাঁর তালিম ছত্রিশ বছরের। আগে তিনি গোয়ালিয়রে জানকীরাও সিন্ধের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন, ওঁর মৃত্যুর পর উনি ধারের রাজা যশবন্তরাও পাওয়ারের সভাগায়ক। অত্যন্ত সৌম্য চেহারা, মানুষটি সাধু প্রকৃতির ; তাই তাঁর পিতৃদত্ত নাম রামকৃষ্ণ প্যারান্‌জপে কেউ মনে রাখে না, সবাই তাঁকে দেবজীবুয়া বলেই সম্বোধন করে।

বালকৃষ্ণ এতকাল পর মনের মত গুরু পেল যিনি একাধারে বিরাট গায়ক, অসাধারণ গুরু এবং অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। কিন্তু বালকৃষ্ণর কপালে গুরুমা জুটলেন অতীব এক দজ্জাল খাণ্ডারণী মহিলা। ছোকরা শিষ্যকে তৎক্ষণাৎ লাগালেন বাড়ির কাজে, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কুয়ো থেকে জল তোলা, কাপড় কাচা বাসন মাজা থেকে পুরোদস্তুর রাঁধুনির কাজ যাতে সে গান শেখবার বিন্দুমাত্রও সময় না পায়। রেয়াজে বসলেই ছুটে এসে হাত থেকে তানপুরো কেড়ে নিতেন। এতৎসত্ত্বেও কিছুটা তালিম হচ্ছিল। সন্ধ্যাবেলা গুরুর সঙ্গে মন্দিরে যেতেন। পথে হাঁটতে হাঁটতে রোজ নতুন কোন বন্দিশ দেবজীবুয়া শিখিয়ে দিতেন। এইভাবে সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে আধপেটা খেয়ে চার বছরে তিন চারশো চীজ্‌ বালকৃষ্ণর আয়ত্তে এল। কিন্তু দেবজীবুয়ার স্ত্রী গোড়া থেকেই এই ছোকরা শিষ্যকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না, পান থেকে চুন খসলে অত্যাচারের মাত্রা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যেত। শেষে একদিন কী কারণে খেপে গিয়ে প্রজ্বলিত চ্যালা কাঠ নিয়ে তাড়া করতে করতে দেবজীবুয়াকে চিৎকার করে বললেন 'এ ছোঁড়াকে এক্ষুনি বিদেয় কর, তা না হলে আমি বাড়ির চালে আগুন ধরিয়ে দেব।'

বেচারি বালকৃষ্ণ। এতদিন পরে যেমন তেমন একটা আশ্রয় জুটেছিল এবং লুকিয়ে চুরিয়ে তালিমও হচ্ছিল। বিনে মাইনেয় চার বছর কাজ করে তার রেলের

টিকিট কাটার সামর্থ্য পর্যন্ত নেই, কাপড় চোপড়ের হালও দেখবার মত। এবার বিনা টিকিটে সে গেল কাশী, সেখানে মণিকর্নিকার ঘাটে এক সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন 'যদি গান শিখতে চাও তো গোয়ালিয়রে চল আমার সঙ্গে। গোয়ালিয়রই সংগীতের পীঠস্থান, সেখানে বহু বড় উস্তাদ বাস করেন, তুমি বাসুদেবরাও যোশীর কাছে যাও, আমি তাঁকে অনুরোধ করব তোমাকে শেখাতে।' সেখানে আবার এক নতুন ফ্যাঁকড়া। সাধুর কথায় বাসুদেব যোশী রাজি হলেন বটে কিন্তু যখন শুনলেন বালকৃষ্ণ দেবজীবুয়ার কাছে তালিম পেয়েছেন, তৎক্ষণাৎ তাকে তাড়িয়ে দিলেন। 'দেবজীবুয়ার কোনো শাকরেদের আমার বাড়িতে জায়গা হবে না।' এই বলে তিনি পাড়া প্রতিবেশীদেরও বলে দিলেন বালকৃষ্ণকে বাড়িতে ঠাঁই দেওয়া তো দূরের কথা একবেলার দাল চাপাটিও যেন না দেওয়া হয়।

বালকৃষ্ণ কাশী ফিরে গেলেন এই ভেবে যে, এই তীর্থে বড় একটা কোনো ভিখিরি অভুক্ত থাকে না, আর মরতেই যদি হয় তো গঙ্গাতীরে মরাই ভাল। যেমনই আর্থিক অবস্থা হোক যে ছেলের গান অন্ত প্রাণ, সে আধপেটা খেয়েও গান করবে। গঙ্গাতীরে ভোর বেলায় তার গলা সাধা শুনে কিছু গুণগ্রাহী শ্রোতা জুটল। বিজয়নগরের মহারাজা তখন কাশীতে ছিলেন। তিনি মাসমাইনে ৩০ টাকা করে দিলেন। কিন্তু সে আর কদিন! মহারাজার সঙ্গে বালকৃষ্ণ দক্ষিণ বিজয়নগর যেতে রাজি হলেন না, অতএব সে রোজগারও বন্ধ হয়ে গেল। গঙ্গাতীরে বসে ভজন গাইলে কিছু সিকি দুয়ানি প্রণামী পড়ে, অতএব বালকৃষ্ণ এবার গেরুয়া ধারণ করে ভস্ম মেখে বসতে শুরু করলেন, যাতে দুবেলা অন্নসংস্থানের সমস্যা মেটে। কিছু ভণ্ড সাধুদের সঙ্গে এ সময়ে বালকৃষ্ণর দোস্তি হয়, তারাও দেখল এ ছোকরাকে দলভুক্ত করলে রোজগার বাড়বে বই কমবে না, গানের গলা যখন এতই ভাল। এদের পাল্লায় পড়ে প্রায় ছ-সাত মাস নানা তীর্থ ভ্রমণ করলেন বালকৃষ্ণ। সে যুগে অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে রেলে সাধুদের টিকিট লাগত না। তাঁরাও কোম্পানির গাড়ি নিজেদের পৈতৃক যানবাহন বলে বিবেচনা করতেন। এমনকি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান টিকিট চেকার গার্ডরাও সাধু দেখলে হাত জোড় করত।

ঘুরতে ঘুরতে এই ভণ্ড সাধুর দল পৌঁছল বিহারের মুঙ্গের শহরে। বালকৃষ্ণর সংগীতশিক্ষার অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্য তখন এমনই চরম অবস্থায় পৌঁছেছে যে, তিনি স্থির করলেন কাছেই কালীমন্দিরে হত্যা দিয়ে থাকবেন, হয় মায়ের দয়া হবে, না হয় অনশনে প্রাণবিসর্জন। চার সপ্তাহ ওঁর খাদ্য ছিল মন্দিরের সংলগ্ন একটি বেলগাছের পাতা এবং মাটিতে পড়া বেলফল। আটাশ দিনের মাথায় ওঁর দুর্বল মস্তিষ্কে যে স্বপ্ন দেখা দিল একরাত্রে, তা বড়ই আশ্চর্যের। প্রথমে মা কালী দেখা দিলেন, তার পরমুহূর্তে উনি দেবজীবুয়ার খাণ্ডারণী অর্ধাঙ্গিনীর রূপ ধরে প্রশ্ন করলেন 'বল্ বেটা, তুই কেন উপোস করে মরতে বসেছিস,

সব নষ্টের মূল। তুমি আমায় গান শিখতে দাওনি, আধপেটা খাইয়ে দিনের পর দিন চাকরেরও অধম ব্যবহার করেছ। তুমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর আমি যোশীবুয়ার কাছে গোয়ালিয়রে যাই, তিনিও আমাকে দূর দূর করে খেদিয়ে দিলেন। আমার এ জীবনে কোনো প্রয়োজন নেই, আমি এই বেলতলাতেই মরব স্থির করেছি।' দেবজীবুয়ার স্ত্রী হেসে বালকৃষ্ণর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'যা, তুই আবার বাসুদেব যোশীর কাছে ফিরে যা, তোর মনষ্কামনা পূর্ণ হবে। তুই বহুকাল সংগীতের সেবা করবি এবং অগ্‌লা সাত পিড়ির লোক তোকে এক ডাকে চিনবে।'

ভোরবেলা বালকৃষ্ণ ধুঁকছেন, একদল ভক্ত এসে চাল ডাল দিয়ে গেল। আর একজন ভদ্রলোক কৌতূহলবশত ওঁর অবস্থা দেখে সব কিছু শুনে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দু দিন রাখলেন, তারপর পেট পুরে খাইয়ে হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে স্টেশনে কাশীর গাড়িতে তুলে দিয়ে গেলেন। কাশীতেও এক ভদ্রলোক অযাচিত ভাবে কিছু নতুন কাপড় ও ওঁকে গোয়ালিয়র যাবার জন্য টাকা পাঁচেক ভাড়া হাতে গুঁজে দিলেন। শুধু তাই নয় সেইদিনই বালকৃষ্ণ জানতে পারলেন যে বাসুদেবরাও যোশীও কাশীতে বেড়াতে এসেছেন এবং কাছেই আংগ্রে ম্যানসনে আছেন।

দুরু দুরু বক্ষে যখন বালকৃষ্ণ আংগ্রে ম্যানসনে যোশীবুয়ার ঘরে পৌঁছলেন তখন দুপুর সাড়ে তিনটে, উনি দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা থেকে উঠে আড়ামোড়া ভাঙছেন। বালকৃষ্ণকে দেখে বাসুদেবরাও একটুও আশ্চর্য হলেন না শুধু তাকের ওপর একটা কাগজের মোড়ক ও ছোট একটি শিল নোড়া দেখালেন। ভাঙের গোলা বেটে দুধের সঙ্গে খাইয়ে হাতজোড় করে বালকৃষ্ণ বুয়া প্রশ্ন করলেন 'গুরুজী আমার শিক্ষা তো অসমাপ্ত থেকে গেছে, আমি মনস্থির করেছি আপনি না শেখালে আমি আত্মহত্যা করব, আপনি ভিন্ন আমার কোনো গুরু নেই, এখন আমায় আজ্ঞা করুন, আমার কি করণীয়।' উত্তরে বাসুদেব বললেন 'অতীতকে ভুলে যা বালকৃষ্ণ, আমি স্বপ্নে মায়ের আদেশ পেয়েছি, তোকে আমি বিদ্যাদান করব। আমার সেরা শিষ্য বানাব, তুই আমার সঙ্গে গোয়ালিয়র চল্। তুইই হদ্দু হস্‌সু খাঁর ঘরের মান রাখবি।'

বালকৃষ্ণর তালিম শুরু হত ভোর চারটে থেকে আটটা। এরপর গুরু স্নানে গেলে অন্যান্য ছাত্রদের কিছুটা শেখানোর ভার ছিল ওঁর ওপর। সে সব সেরে উনি বের হতেন চাল ডাল ভিক্ষা করতে। গোয়ালিয়রের রাজপ্রাসাদ থেকেও বন্দোবস্ত ছিল ব্রাহ্মণদের সিধে দেওয়ার, কখনও কখনও ব্রাহ্মণ রাঁধুনির হাতে পাকানো ড্বাল রুটি সবজি। প্রায়ই মহারাজা জিয়াজীরাও পরিদর্শন করতে আসতেন। একদিন তাড়াহুড়ো করে মহারাজা বের হচ্ছেন। বালকৃষ্ণর সঙ্গে ওঁর ধাক্কা লেগে গেল। অনুতপ্ত স্বরে জিয়াজীরাও বললেন 'আমি কি আপনাকে ছুঁয়ে ফেললাম?

ছি ছি আপনার হাতের অন্ন ফেলা গেল, আপনি ব্রাহ্মণ সন্তান।' উত্তরে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বালকৃষ্ণ বললেন 'মহারাজ, ওকথা বলবেন না। আপনি আমার অন্নদাতা। আপনি ছুঁলে অন্ন ফেলা যায় না।* মহারাজ খুশি হয়ে বললেন, 'আজ আপনি আমার সঙ্গে বসে খাবেন। আপনার সংগ্রহ করা খাওয়াই আমরা সবাই মিলে খাব।' বালকৃষ্ণর সংগীতের প্রতি অদম্য অনুরাগ ও তার অসীম কষ্ট সহ্য করে শিক্ষা নেবার আগ্রহের কথা শুনে মহারাজা সভাগায়ক স্বয়ং উস্তাদ হদ্দু খাঁ সাহেবের কাছে তালিম নেওয়ার কথা পাড়লে বালকৃষ্ণ বলেন 'আমার গুরুর কাছে শিক্ষা সম্পূর্ণ হোক, তারপর যদি তিনি নিজেই আমাকে তাঁর উস্তাদদের অর্থাৎ হদ্দু হস্‌সু খাঁ সাহেবদের কাছে পাঠান তবেই আমি তালিম নিতে পারি, নচেৎ নয়।'

এই প্রকার মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে বাড়ির সব কাজকর্ম সেরে বুয়ার ছোটোখাটো শাকরেদদের পড়িয়ে ছ বছর তালিমের পর বালকৃষ্ণর দু চারটে আসর হল এবং তারিফও পেলেন। হদ্দু খাঁ সাহেবের দ্বিতীয় বিবাহের সন্তানের সঙ্গে বন্দে আলি খাঁ বীণকারের বিবাহ এই সময়েই ঘটা করে সম্পন্ন হয়। সাত দিন সাত রাত ধরে গানবাজনা চলেছিল। এই আসরে হদ্দু খাঁর বড় ছেলে ছোটে মহম্মদ খাঁর পেছনে বালকৃষ্ণ বুয়ার বসার সুযোগ ঘটে। অন্য তানপুরোয় ছিলেন হদ্দু খাঁর সার্কাস ম্যানেজার শাগীর্দ বিষ্ণুপন্থ ছত্রে। বালকৃষ্ণ বুয়ার গান ও সাথ সঙ্গত এতই ভাল হয়েছিল যে হদ্দু খাঁ উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যে দুজনকে আমার ছেলে মহম্মদ খাঁর সঙ্গে গান গাইতে শুনলেন এঁরা দুজনই আমার ঘরানার বাছা বাছা শাগীর্দ। ছত্রে আমার শিষ্য আর বালকৃষ্ণ আমার নাতি। সভায় কে একজন উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল 'ঠিক হ্যায়, কিন্তু আপনার নাতি একা গেয়ে আসর জমাবার কাবিল হয়েছে কি?' বালকৃষ্ণ হদ্দু খাঁ সাহেবের আদেশে সে রাত্রে মহম্মদ খাঁ সাহেবের ইজাজৎ অর্থাৎ অনুমতি নিয়ে এমনই জমালেন যে সকলেই উচ্ছ্বসিত, বিশেষ করে মহম্মদ খাঁ। সকলেই বলতে লাগল 'এ ছোকরাকে শুনলে ভ্রম হয় যে বাসুদেব যোশীই গাইছেন। সাবাশ! এ গোয়ালিয়র ঘরানার মান রাখবে।'

এর পর গুরুর আদেশে বিবাহ করে সংসার পাতার উদ্দেশ্যে ঢোলপুর হয়ে বোম্বাইয়ের পথে রওনা হলেন বালকৃষ্ণ। বোম্বাইয়ে পৌঁছে শুনলেন বিদ্যারামভাই ওয়াডিতে মহম্মদ খাঁর গান হবে। সন্ধ্যা ছটায় আসরের এক কোণে বসে বালকৃষ্ণ। এদিনে মহম্মদ খাঁর মাত্রাটা সেদিন এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে তানপুরো বেঁধে

বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজে' লিখেছেন ছাতুবাবু লাটুবাবুরাও বলতেন 'তোরা জাত জাত কি করিস রে, জাত তো আমার সিন্ধুকের চাবিতে।' লেখক।

আসরে বসে সা লাগাতে গিয়ে মাথা তাঁর জাজিমের সঙ্গে ঠেকে গেল। দেড় দুশো মারাঠি শ্রোতার হল্লার মাঝে উদ্যোক্তারা ঘোষণা করলেন আজ মহম্মদ খাঁর গান হবে না, উনি অসুস্থ, উপস্থিত একজন পাড়ার গাইয়ের গান হবে। বালকৃষ্ণ বুয়া এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন, এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন 'এ আসর আমার গুরু বাসুদেব রাও যোশীর খলিফা মহম্মদ খাঁর। আজ উনি অসুস্থ, গান করতে পারছেন না বলে যে কেউ এক হেঁজিপেঁজি গাইয়েকে ওঁর জায়গায় বসানো হদ্দু হস্‌সু খাঁর ঘরানার অপমান।' শ্রোতারা খেপে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল 'এ আবার কোন হাটের মাল, বলে কি? হদ্দু হস্‌সু খাঁর ঘরের উস্তাদ মাতলামি করবে আর আমাদের গাঁটের পয়সা জলে যাবে, ভেবেছে কি? আজকের আসর ক্যানসেল করা চলবে না।' ওদের মধ্যে দু তিনজন দাঁড়িয়ে উঠে বলল 'ওহে ছোক্‌রা! তুমি তো বলছ তুমি যোশীবুয়ার শিষ্য, তুমি গান করতে পার?' জবাবে বালকৃষ্ণ বললেন 'খাঁ সাহেবের ইজাজৎ পেলেই পারব, ঘরানার মান রক্ষার জন্য আমি আমার দুই গুরু দেবজী বুয়া ও যোশী বুয়ার তালিম আপনাদের শোনাতে প্রস্তুত।' হৈ হল্লা থামতে, তানপুরো আবার বেঁধে মহম্মদ খাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বালকৃষ্ণ বুয়া এমনই আসর জমালেন যে শ্রোতারা মুগ্ধ। সবচেয়ে খুশি হলেন মহম্মদ খাঁ। উনি বললেন 'বেটা! তুই আমার ঘরানার ইজ্জৎ রেখেছিস, এই দৌরে আমার যতগুলো প্রোগ্রাম আছে, সবগুলোয় তুই আমার সঙ্গে তানপুরো ধরবি।' বালকৃষ্ণর সহবত ও তমিজ কী প্রকারের ছিল এ তাঁর কথাতেই বোঝা গেল। তিনি বললেন 'উস্তাদ! আপনি আমার গুরুর খলিফা, আপনার সঙ্গে আসরে সুর লাগানো তো আমার খুশ নসিব, পরম সৌভাগ্য, তবে দয়া করে একটা পোস্টকার্ড ফেলে আমার গুরুকে জানিয়ে দিন, তাঁর ইজাজতের প্রয়োজন।'

নানান জায়গা ঘুরে মহম্মদ খাঁ বরোদায় এসে বছর খানেক রইলেন। এখানে ভানু মহারাজ শিরগাঁওকরের বাড়িতে বালকৃষ্ণ বুয়ার স্থান হল এবং ভানু মহারাজ ওঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। ভোরে উঠে স্নানাদি প্রার্থনা সেরে উনি মহম্মদ খাঁর কাছে তালিমের জন্য যেতেন। বলা বাহুল্য মহম্মদ খাঁর নিজের তালিম বাপ চাচার কাছ থেকে পাওয়া, অকৃপণ ভাবে তা উনি বালকৃষ্ণকে শিখিয়েছিলেন। প্রত্যেক আসরে মহম্মদ খাঁর সঙ্গে গলা দিতেন, এবং কোনো কোনো আসরে খাঁ সাহেবের আগে ওঁর গান হত। এতে বেশ কিছু মহম্মদ খাঁর কাছের লোকেদের চোখ টাটাচ্ছে দেখে বালকৃষ্ণ পুনেয় যাবার জন্য খাঁ সাহেবের অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

অতঃপর পুনে, সাত্তারা, ভোর, কোলহাপুর ইত্যাদিতে বালকৃষ্ণবুয়ার নাম ছড়িয়ে পড়ল, সাত্তারার রাজা ওঁর গান শুনে ওঁকে সভাগায়কের স্থান দিলেন। এখানেই হায়দ্রাবাদ নিবাসী বলবন্তরাও নিধানকরের সঙ্গে ওঁর আলাপ হয় এবং ওঁর ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তখন ওঁর বয়স আঠাশ, সে কালের মহারাষ্ট্র সমাজে

তখন উনি বুড়ো বর।

ইতিমধ্যে যোশীবুয়া সাত্তারার কাছেই তাঁর গ্রাম নগভে পৌঁছে শিষ্যকে খবর পাঠালেন। কী ভাবে জানা যায় না, তাঁর নাকি হাজার পাঁচেক টাকা বাজারে ধার হয়ে গেছে। বালকৃষ্ণ সাত্তারার রাজার অনুমতি নিয়ে গুরুর আসরের ব্যবস্থা করলেন সারা মহারাষ্ট্রর শহরে শহরে। করহদ, কুরুন্দাড়, ইছলকরনজি, কোল্‌হাপুর, মিরজ, সাংলি সর্বত্র ওঁর প্রোগ্রাম হলো, পেছনে তানপুরো ধরে গলা দিতেন যোশীবুয়ার ছেলে ভইয়াসাহেব এবং বালকৃষ্ণ নিজে। মহারাষ্ট্র থেকে আড়াই হাজার টাকার সংস্থান হলো খরচা বাদ দিয়ে। এর পর ওঁরা ধার ও ইন্দোর হয়ে গেলেন গোয়ালিয়র। সেখানে দিন দশেক বিশ্রাম করে কলকাতা হয়ে নেপাল। পথে পড়ল দ্বারভাঙ্গা, গিধরা, বেতিয়া—সবজায়গাতেই প্রোগ্রাম হলো যোশীবুয়ার। নেপালে মাস চারেকের ওপর ওঁরা ছিলেন। ওখানের শীত সহ্য না করতে পেরে যোশীবুয়া গোয়ালিয়রে ফিরে আসেন ঘোরতর আমাশয় রোগ নিয়ে। এই রোগেই মাস ছয়েকের মধ্যে ওঁর মৃত্যু হয়। শেষদিন পর্যন্ত সব কাজ ছেড়ে বালকৃষ্ণ বুয়া গুরুর নিরলস সেবা করেছিলেন, মায় শেষের দিকে ময়লা পরিষ্কার করা, রুগির কাপড় নিয়মিত কাচা পর্যন্ত। মরার সময়ে গুরু আশীর্বাদ করে বলেছিলেন 'তোর কোনো দিন আসরে গান খারাপ হবে না। সকলের প্রশংসা পাবি এবং মহারাষ্ট্রের কোণে কোণে তোকে গুণীরা আচার্যের সম্মান দেবে।' এ আশীর্বাদ শুধু সফল হয়েছিল বললে যথেষ্ট বলা হয় না, নাট্যসংগীতের জায়গায় মারাঠিদের মধ্যে শাস্ত্রীয় সংগীতের বহুল প্রসারের জন্য প্রধানত দায়ী গায়নাচার্য বালকৃষ্ণবুয়া ইছলকরনজিকর এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য বিষ্ণু দিগম্বর। ওঁর অজস্র শিষ্যদের মধ্যে নাম করেন পণ্ডিত মনোহর পণ্ডিত, বামনবুয়া চাফেকর, মল্লিকার্জুন মনসুরের প্রথম গুরু নীলকণ্ঠবুয়া, আউন্ধের গুণ্ডোবুয়া, মিরাশিবুয়া, দত্তোপন্থকালে, নিজের সন্তান আন্নাবুয়া এবং অবশ্যই পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পলুস্কর। শিষ্যদের তালিম দেওয়ার ব্যাপারে বালকৃষ্ণবুয়ার পরিশ্রম ও উৎসাহ গল্পকথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একবার মিরজে প্লেগের মহামারি হয়। শহরের বহু বাসিন্দা ঘরদোরে তালাচাবি লাগিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। ফলে রাতবিরেতে চুরি-চামারিও খুব বেড়ে যায়। বালকৃষ্ণবুয়া শিষ্যদের দিনে ঘুমিয়ে সাধারণত আলো জ্বালিয়ে রাতে রেয়াজ ও তালিমের ব্যবস্থা করলেন। চারমাস এই প্রকার শিক্ষাদান চালু ছিল। নীলকণ্ঠবুয়া প্রোফেসর দেওধরকে বলেন 'চার মাসের শেষে যখন প্লেগের প্রকোপ গেল কমে এবং মিরজের বাসিন্দারা ফিরে আসতে লাগল, চুরিচামারিও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল তখন সবচেয়ে দুঃখ পেলাম আমরা, অর্থাৎ বালকৃষ্ণবুয়ার শিষ্য শিষ্যারা, কারণ এতক্ষণ ধরে তালিম ও রেয়াজের আনন্দ জীবনে পূর্বে ও পরে কখনও উপভোগ করিনি।' পাঠকরা শুনে আশ্চর্য হবেন যে যদিও মহারাষ্ট্রে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় স্ত্রীস্বাধীনতা অনেক

বেশি ছিল, রাতের ক্লাসে ওঁর একাধিক শিষ্যারাও নিয়মিত আসত। জানি না বালকৃষ্ণবুয়া উৎকট 'মেল শভিনিস্ট' ছিলেন কিনা, পুরুষ ছাত্ররা দু পাঁচ টাকা যা পারে দিত, মেয়েদের টিউশন ফী ধার্য ছিল মাসে ৩০ টাকা, যখন ওই টাকায় একটা আস্ত পরিবারের ভরণপোষণ হয়ে যেত। নীলকণ্ঠবুয়ার টাকাকড়ি দেবার সামর্থ্য ছিল না, উনি বাড়ির খুচরো কাজ করে দিতেন, প্রধানত গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেওয়ার কাজ। এই কারণে ওঁকে বহুদিন পর্যন্ত নীলকণ্ঠ শেনাইয়া বলে লোকে ডাকত। 'শেনাইয়া' মারাঠিতে সম্ভবত ঘুঁটে কুড়ুনির পুংলিঙ্গ। বালকৃষ্ণবুয়াই প্রথম মারাঠা গায়ক যিনি গানের স্কুল স্থাপন করেন। পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন বড় বড় লোকেদের, যথা ডাঃ আর. জি. ভাণ্ডারকর, এম. সি. আপ্তে, আর. আর. কুণ্ডে এবং জাস্টিস কে. টি. তিলং। এ ছাড়াও সংগীতবিষয়ক মাসিক পত্রিকা বার করার কৃতিত্ব ওঁরই, নাম দিয়েছিলেন 'সংগীতদর্পণ'। কোল্‌হাপুরের বিখ্যাত দেবল ক্লাব, যেখানে এ অধমও এককালে গান করে এসেছে, ওঁরই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। এ সব ঘটেছে বিষ্ণু দিগম্বর ও বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডের কীর্তিকলাপের বহু পূর্বে।

১৯২৫ সালে ওর নিজের মৃত্যুর এক বছর পূর্বে ওঁর প্রিয় পুত্র আন্নাবুয়া মারা যান। ততদিন পর্যন্ত পণ্ডিত বালকৃষ্ণবুয়ার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। মিরাজ ছেড়ে উনি ইছলকরনজির রাজার আশ্রয়ে সুখে বসবাস করছিলেন। নাম অর্থ যশ কিছুরই অভাব ছিল না। অর্থের প্রতি ওঁর উদাসীনতা সর্বজনবিদিত ছিল। দেবল ক্লাব একবার তিন সন্ধ্যা গানের জন্য ওঁকে ৬০ টাকা দেয়। উনি মনে করেন ওরা প্রয়োজনাতিরিক্ত পয়সা ওঁর গানের জন্য খরচ করছে এবং অর্ধেক টাকা তৎক্ষণাৎ ফেরত দিয়ে দেন। আবার অনেক ছেলেমানুষির গল্পও আছে ওঁর সম্পর্কে। একবার সাংলির এক কন্‌ফারেন্‌সে উদ্যোক্তারা চাঁদির টাকার একটি থলি ধরিয়ে দেয়। টাকাপয়সা সম্পর্কে সাধারণত উদাসীন হলেও অতগুলো চকচকে রূপোর টাকা দেখে ওঁর হঠাৎ গোনবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। তিনবার গুনলেন, কখনও হয় পঞ্চাশ টাকার বেশি, কখনও কম। শেষকালে উনি ওঁর এক শিষ্যকে ডেকে বললেন 'গুনে দেখ, যদি পঞ্চাশের বেশি হয় তো ফেরত দিয়ে এস, আর কম হলে ক্যাশিয়ারকে বল পুরিয়ে দিতে। এ নতুন চাঁদির টাকাগুলো দেখতে খাসা।' বি. আর. দেওধর লিখেছেন ওঁর গুরু বিষ্ণু দিগম্বরের গুরু পণ্ডিত বালকৃষ্ণ বুয়া ইছলকরনজিকরকে সবাই সম্মান করতেন। এমন ওঁর নামডাক আর এমনই ওঁর ব্যক্তিত্ব, মাথায় লাল মারাঠি টুপি, লম্বা কালো বনাতের কোট পরে প্রমাণ সাইজের অতিরিক্ত বিরাট সাদা গোঁফজোড়া ও লাঠি হাতে আসরে উনি ঢুকলে আল্লাদিয়া খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, ভাস্কর বুয়া বাখ্‌লে, রামকৃষ্ণ বুয়া ভাজে সবাই দাঁড়িয়ে উঠতেন। হদ্দু খাঁর ছোট ছেলে সেই আফিংখোর আধপাগল রহমৎ খাঁও

বালকৃষ্ণবুয়ার গানের তারিফ করতেন। আবার যখন বুয়ার বোলবোলাও চরমে তখন কুরুন্দাড়ে একবার রহমৎ খাঁর আসরে উনি তানপুরো ধরেন পর পর দু দিন সকাল সন্ধ্যা। তৃতীয় দিনে রহমৎ খাঁ ফিরে ওঁকেই বলেন 'আচ্ছা বালকিষেণকে দেখতে পাচ্ছি না, সে আমার বড় ভাই মহম্মদ খাঁর গায়কি বড় সুন্দর গায়। তাকে খবর দিতে পার?' অনন্তমনোহর যোশীও বলতেন উনি চার বছর রহমৎ খাঁর পেছনে তানপুরো ধরেছিলেন, খাঁ সাহেব একদিনও জানতে চাননি এ ব্যক্তিটি কে, তালিম দেওয়া তো দূরের কথা।

বালকৃষ্ণবুয়ার গায়কি কী প্রকার ছিল? মিরাশিবুয়ার শিষ্য প্রোফেসর জি. এইচ. রানাডে লিখেছেন বুয়ার কণ্ঠস্বর থেকে মধু ঝরত। খরজ ও তার সপ্তকের স্বরপ্রয়োগে একই আশ পাওয়া যেত। এমন কথাও বলেছেন যে রহমৎ খাঁ ও আবদুল করিম খাঁর গলায়ও সব গুণ ছিল না যেমনটি বালকৃষ্ণ বুয়ার কণ্ঠে ছিল। গায়কি বিশুদ্ধ গোয়ালিয়রের, পার্থক্য শুধু এই—উনি আলাপ বা রাগ বিস্তারের অংশটিকে ঘরের অন্যান্য গায়কদের তুলনায় বেশি প্রাধান্য দিতেন। গলায় অসাধারণ হলক ও গমক তান ছিল এবং তিন সপ্তকের লরজদার তানে একই আওয়াজ থাকত, ফলসেটোর চিহ্নমাত্রও ছিল না। লয় উনি ভাল দেখতেন কিন্তু অসম্ভব কিছু লয়দার ছিলেন না। দম শ্বাস ও অসাধারণ স্টামিনা বা পরিশ্রম করার শক্তি ছিল, সকালে চার ঘণ্টা আসরে গেয়ে সন্ধ্যার আসরে সাড়ে তিন থেকে চার ঘণ্টা গান করেছেন এরকম নজিরও আছে। পরিশেষে প্রোফেসর রানাডে লিখেছেন গায়ক হিসেবে উনি খুবই বড় ছিলেন কিন্তু গোয়ালিয়র থেকে আহৃত সঞ্জীবনী সুধা মহারাষ্ট্রয় বিতরণ করার জন্য এবং সংগীতের প্রসারের জন্য ওঁর এবং ওঁর শিষ্য বিষ্ণু দিগম্বরের নাম চিরকাল সংগীতজগতের লোকেরা মনে রাখবে। উনি নিজেই ছিলেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়।

ওঁর বিখ্যাত শিষ্যদের নাম পূর্বেই দিয়েছি। এঁদের মধ্যে একজনের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই। বামনরাও চাফেকর এমনই একজন গায়ক যাঁর পাথরচাপা কপালে সামান্যতম জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও বিধাতা লেখেননি। ১৯০৮ সালে দেওধর তখন সাত আট বছরের বালক—এঁর কাছে গান শিখতে গিয়েছিলেন। ওঁর ফি ধার্য করা হয়েছিল মাসে আট আনা, শেখাতে হবে প্রতিদিন সকালে অন্তত ঘণ্টাখানেক। দিন চারেক পরে বুয়ার বড় বিধবা বোন এসে দেওধরের বাবা মাকে বলেন, আট আনা মাসিকে তিরিশ দিন সংগীত শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে বড়ই কম, নিদেনপক্ষে একটা টাকা দিতে হবে। দেওধরের পিতামাতা মনে করলেন ছেলের গান শেখার জন্য এত খরচ করার কোন মানে হয় না, অতএব বামনবুয়ার টিউশানের সেইখানে ইতি।

বহুকাল পরে দেওধরের সঙ্গে একদিন বামনবুয়ার দেখা। দেওধর জিজ্ঞেস

করলেন এখন কোথায় উনি টিউশানি করছেন এবং কত রোজগার ওঁর। জানা গেল বামনবুয়া একটি মেয়েকে শেখান, তাদের বাড়ি থেকে ওঁর প্রাপ্য ঘণ্টায় এক আনা অর্থাৎ এখনকার হিশেবে ছ সাত পয়সা। আর এক বাড়িতে উনি গান শেখান, তারা কিছু দেয় না, বলেছে বটে বছরের শেষে কিছু জামাকাপড় কিনে দেবে। তবে তারা নিয়মিত এক কাপ চা খাওয়ায়, মাঝে মাঝে চায়ের সঙ্গে এক আধটা মিষ্টিও দেয়। কিছুদিন বাদে আবার রাস্তায় দেখা বামনবুয়ার সঙ্গে, হাতে তাঁর একটা বাণ্ডিল। খুলে দেখা গেল দুটো পুরোনো শার্ট এবং একটি গেঞ্জি। এই তাঁর গান শেখানোর ফি। দেওধর ওঁকে বাজারে নিয়ে গিয়ে এক প্রস্থ জামাকাপড় টুপি ও ছাতা কিনে দেন।

বামনবুয়া সুপুরুষ এবং সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। ওঁর গায়কি বালকৃষ্ণবুয়া ইছলকরনজিকরের মতই বিশুদ্ধ গোয়ালিয়র ছিল, তবে ওঁর গুরুর আলাপ বা বিস্তারের মেজাজ উনি এতৎসত্ত্বেও পাননি। ওঁর বৈশিষ্ট্য ছিল রাগ জমাবার ক্ষমতা। ১৯৩৪-৩৫ সালে মিরজের রাজা বালাসাহেব মিরজকরের রাজত্বের গোল্ডেন জুবিলি খুব ঘটা করে সম্পন্ন হয়েছিল। আবদুল করিম খাঁ মিরজেই বাড়ি করেন যদিও বেশিরভাগ সময়ে ওঁকে পুনে ও বোম্বাইয়ে কাটাতে হত। সে সময়ে করিম খাঁর বিরাট নামডাক। ওঁর জন্য এক সন্ধ্যায় স্পেশাল আসরের ব্যবস্থা হয়েছিল। আগে ঘণ্টাখানেক গাইবেন বামনবুয়া চাফেকর তারপর সারা সন্ধ্যা আবদুল করিম খাঁ। বামনবুয়া এমনই সুর জমিয়ে মূলতানি গাইলেন যে করিম খাঁ অভিভূত। যথারীতি অনেকক্ষণ ধরে উনি তানপুরা মেলালেন, তারপর ধরলেন ইমনকল্যাণ। সাধারণত করিম খাঁ সুর লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে মজে যেতেন, শ্রোতারাও সম্মোহিত হয়ে শুনত। এ দিন আর ওঁর মেজাজ লাগল না। পনেরো কুড়ি মিনিট পরে দুই তানপুরোর ওপর হাত রেখে উনি বললেন 'মহারাজ! আপনার সভাগায়ক বামনবুয়া চাফেকরজীর অসাধারণ মূলতানির রেশ এখনও আমার মাথার মধ্যে ঘুরছে, আজ আমাকে মাফ করুন, অন্য যে কোনোদিন আমার প্রোগ্রাম রাখুন, আমি হুজুরের তাঁবেদার, আজ্ঞা করলেই এসে গেয়ে যাব।

এ হেন গায়ক সারাটা জীবন অসম্ভব দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে পঁচাশি বছর বয়সে দেহ রাখেন। এর প্রধান কারণ উনি কোথাও চাকরি রাখতে পারতেন না। মাঝে মাঝে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে যেত। মস্তিষ্কের অসুস্থতার কোনো বিশেষ লক্ষণ দেখা দিত না, শুধু উনি চুপচাপ বসে থাকতেন--কথা বলতেন না, গানও করতেন না। কেউ দয়া করে ভাতের থালা ধরে দিলে উনি খেতেন, নচেৎ দিনের পর দিন উপবাস। ওঁর বিধবা দিদি যিনি ওঁকে দেখাশুনো করতেন তিনি যখন মারা যান তখন বামনবুয়ার বয়স পঞ্চাশ, শেষ পঁয়ত্রিশ বছর ওঁর ছন্নছাড়া দারিদ্র্যের জীবন কেটেছে অন্যের দয়ার ওপর নির্ভর করে। মিরজের রিয়াসতের পরিসমাপ্তি

ঘটল স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৭ সালে। তখন রাজানুগ্রহ (মাসিক তিরিশ টাকা) থেকে বামনবুয়া বঞ্চিত হলেন। ওঁর মৃত্যু হয় এরও সতেরো বছর পরে, ১৯৬৪ সালে ঐ মিরজ শহরেই।

বহু বছর আগে লখনউ—বোম্বাইগামী এক ট্রেনের কমপার্টমেন্টে শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর ও ধূর্জটিপ্রসাদকে বিগত দিনের গায়কদের গলার আওয়াজ ও তাসির (প্রভাবগুণ) সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছিলাম। ওঁরা নাম করেছিলেন আল্লাবন্দে খাঁর বড় ভাই জাকিরুদ্দিন, বিষ্ণুদিগম্বর, ফৈয়াজ খাঁ, ভাতখণ্ডেজী এবং বড়ে গুলাম আলি খাঁর। ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের নাম করেননি যদিও তাঁর গায়কি নয়, কণ্ঠের যাদুর প্রশংসা পণ্ডিত দিলীপচন্দ্র বেদী থেকে অনেক বড় বড় লোকেরা করেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদের যখন ছাত্রাবস্থা তখন পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন ঘোষের বাড়িতে বিষ্ণুদিগম্বর এসে ওঠেন। আসরে তখন উনি ভজনই গাইতেন, খেয়াল নয়। ভূপেনবাবু অবশ্য বলেন যে ভোর বেলা উঠে উনি কোনো প্রাতঃকালের রাগালাপ করেন, সে নেহাতই কাকভোরে। ভূপেনবাবুর অনুমতি নিয়ে উনি ভোর চারটেয় উঠে আড়ি পেতে ভৈঁরো রাগের আলাপ শুনেছিলেন, এবং বাকি জীবন সেই পাল্লাদার অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠর ভৈঁরো ভুলতে পারেননি।

বিষ্ণুদিগম্বর হয়তো তাঁর সময়কার মহারাষ্ট্রে একমাত্র ভাগ্যবান গায়ক যাঁকে আর পাঁচজনের মত দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে লাথিঝাঁটা খেয়ে গুরুগৃহে সংগীতশিক্ষা করতে হয়নি। বিষ্ণুদিগম্বর যদিও নিম্নবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, উনি খুব অল্প বয়স থেকেই কুরুন্দাড়ের ছোট তরফের রাজার পৃষ্ঠপোষকতা পান। বিষ্ণুর পিতা ছিলেন কীর্তনীয়া—যাকে মহারাষ্ট্রে হরিদাস বলে এবং কুরুন্দাড়ের রাজার ভাই শ্রীমন্ত দাজিসাহেবের বিশেষ পছন্দসই গায়ক। বিষ্ণুর চেহারা ভাল ছিল, রং ফর্সা ও ব্যবহার অত্যন্ত সুবোধ বালকের মত। দাজিসাহেবের পুত্র নানাসাহেবের খেলার সাথী বিষ্ণুকে রাজপরিবারের সবাই এতটাই পছন্দ করতেন যে এদের দুজনের উপনয়ন একত্র রাজবাড়িতে ঘটা করে হয়েছিল। বিষ্ণু পড়াশুনোয় ভাল ছিলেন কিন্তু ১৮৮৭ সালে খেলা করতে করতে ওঁর চোখে চোট লাগে যার ফলে ওঁর জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। মিরজে চোখের চিকিৎসা করাতে নিয়ে যান বিষ্ণুর বাবা, সেখানে সাহেব ডাক্তারের পরামর্শে লেখাপড়া বিষ্ণুকে একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়। এ ঘটনা না ঘটলে বিষ্ণু সংগীতশিক্ষার দিকে ঝুঁকতেন না, অল্পবিস্তর লেখাপড়া করে রাজানুগ্রহে ওঁর মোটামুটি একটা ভাল চাকরি জুটে যেত।

ছোটবেলা থেকেই বিষ্ণুদিগম্বরের গলা ছিল দরাজ, কিঞ্চিৎ রুক্ষ এবং নমনীয়তার অভাব ছিল। তবে উনি কঠোর পরিশ্রমী, ধীরে ধীরে ওঁর গলার

আওয়াজে এতটাই পরিবর্তন আসে যে বালকৃষ্ণবুয়া ইছলকরনজিকরের গোয়ালিয়র গায়কির মিড় সুত ও বহ্‌লাওয়া খুব তাড়াতাড়িই গলায় বসাতে সমর্থ হন। বাল্যকাল থেকেই ওঁর দৃঢ় উদ্দেশ্য বড় গায়ক হবার, এর জন্য ওঁর বয়সী আর পাঁচটা ছেলেদের মত খেলাধুলো আড্‌ডায় সময় না ব্যয় করে উনি একমনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাধনা করতেন। বছর নয়েক বালকৃষ্ণবুয়ার কাছে কঠোর তালিমের পর মিরজে ও কুরুন্দাড়ে লোকে ওঁকে একজন পরিণত গায়ক হিসেবে মেনে নিল। উনিও ভাবলেন যে সংগীতের পীঠস্থান, সে কালের টপ্‌পা ও খেয়ালের মক্কা গোয়ালিয়র শহরে যাবেন, পথে রাজপরিবারের সুপারিশ দেওয়া চিঠি নিয়ে অন্যান্য রিয়াসতেও যাবেন। মিরজ ও কুরুন্দাড়ের রাজপরিবারের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ওঁর আদব কায়দা ভালই রপ্ত হয়েছিল এবং ওঁর সবচেয়ে বড় মূলধন ওঁর আত্মবিশ্বাস যা শেষ জীবন পর্যন্ত সংগীতের প্রচারে অনেক দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হয়েও ওঁকে সফলতার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। বরোদার মহারানী যমুনাবাই ওঁর গান শুনে মুগ্ধ হন এবং একাধিক পত্র দেন কাথিয়াবাড় ও রাজস্থানের রাজাদের নামে। বিষ্ণুদিগম্বর যদি চাইতেন তো যে কোনো রাজোয়াড়ার সম্মানিত সভাগায়কের পদে আরামে কাটাতে পারতেন। কিন্তু ওঁর জীবনের উদ্দেশ্য তখন ভিন্ন। উনি দেখেছিলেন দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলেদের পক্ষে সংগীতশিক্ষা কী প্রকার দুরূহ ব্যাপার। ট্যাঁকে পয়সা না থাকলে কোনো শাগীর্দকেই সাধারণত গাইয়ে বাজিয়েরা পাত্তা দিতে চাইতেন না, তা সে হিন্দু বুয়াই হোন আর মুসলমান উস্তাদই হোন। খুব উচ্চদরের গায়ক না হলে রাজোয়াড়ার চাকরি জুটত না, অতএব বেশির ভাগ গাইয়ে বাজিয়েকে তবায়েফদের তালিম দিয়ে তাদের আর্থিক অনুগ্রহে জীবন কাটাতে হত। সমাজে প্রধানত এই কারণে উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পীদের স্থান সে সময়ে ছিল অত্যন্ত নীচুতে। আর ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে সে সমাজের চেহারা তখন এমনই পালটে গেছে যে কোলকাতা বোম্বাইয়ের উচ্চ মধ্যবিত্ত ও পয়সাওয়ালা চাকুরে ও বণিক সম্প্রদায় তাদের প্রভু ইংরেজদের মতই গানবাজনাকে খুব সুনজরে দেখত না। ভদ্রঘরের সন্তানদের এটিকে পেশা করা তখন অকল্পনীয় ছিল। মহারাষ্ট্রে বিষ্ণু দিগম্বর, বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ও বাংলায় রবীন্দ্রনাথ না জন্মালে মধ্যবিত্ত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আদৌ ঘটত কিনা সন্দেহ। সেই সঙ্গে বলতে হবে বহু রাজপুত জমিদার, রাজারাজড়া ও ছত্রপতি শিবাজীর সাঙ্গপাঙ্গদের বংশধর ছোট ছোট অগুনতি রিয়াসতের মালিকরা যেমন উচ্চাঙ্গ সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তার সিকির সিকিভাগও বাংলায় হয়নি, যদিও এ রাজ্যেই 'পার্মানেন্ট সেট্‌লমেন্ট' বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের আসন কায়েম করে দেয়। যুক্তপ্রদেশে বা বর্তমানে যাকে উত্তরপ্রদেশ বলা হয়, প্রতি ত্রিশ বছর অন্তর জমিদারী নীলামে চড়ত, অথচ সব বড় বড় ঘরানার জন্ম এখানেই হয়েছিল, যথা আগ্রা, সহসওয়ান,

কিরানা লখনউ (শুধু ঠুংরি নয়, কাওয়াল বাচ্চাদের খেয়ালও) কাশী ইত্যাদি। আর সব ঘরানা যার পেট থেকে বের হয়েছে সেই গোয়ালিয়র তো আগ্রার পরের স্টেশন। সাথে সাথে মথুরা বৃন্দাবন দিয়েছে ব্রজভাষায় খেয়াল ও ধামার। আর পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান শর্কীর আমলে জৌনপুর ছিল খেয়াল ও চুটকলার হেড কোয়ার্টার। বাংলায় কালোয়াতি গান বাজনার পৃষ্ঠপোষক জমিদারদের হাতে গোনা যায়, মৈমনসিং-এর মুক্তাগাছা, ঢাকার নবাব, গৌরীপুর, মহিষাদল, রাজশাহীতে রাধিকামোহন মৈত্রদের পরিবার ও কলকাতার দুই ঠাকুরবাড়ি [জোড়াসাঁকো পাথুরেঘাটা]।

বিষ্ণুদিগম্বরের সবচেয়ে বড় অবদান গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়। আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রথমটির স্থাপনা হয় ১৯০১ সালে সুদূর লাহোরে, গিরনারের এক সাধুর পরামর্শে। এই বিদ্যালয়ের সংগীত শিক্ষাদানের জন্য প্রথম ভারতবর্ষে ভাতখণ্ডেজীর বহু পূর্বে বন্দিশ ও স্বরলিপির বই লিখে চালু করেন বিষ্ণুদিগম্বর। ওঁর নিজের স্বরলিপিজ্ঞান ছিল না, যোধপুরে এক ব্যাণ্ড লীডার জেম্‌সের কাছে উনি বিলিতি স্টাফ নোটেশন শিক্ষা করেন এবং সেই থেকেই স্বরলিপির আইডিয়া ওঁর মাথায় আসে। যদিও স্বরলিপিতে উনি বরাবরই খুব কাঁচা ছিলেন। ওঁর দ্বিতীয় গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় বোম্বাইয়ের ১৯০৮ সালে। এই বিদ্যালয়টি মারাঠি সমাজে এতই জনপ্রিয় হয় যে বর্তমান কংগ্রেস হাউসের সংলগ্ন তিনখানি ছোট ছোট বাড়ি ভাড়া করতে হয়েছিল। ১৯১৩ সালে বাধ্য হয়ে বিষ্ণুদিগম্বর বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শে স্যান্ডহার্স্ট রোডে ৪৮,০০০ টাকা দিয়ে একটি জমি কেনেন এবং ওঁর 'সংগীতামৃত প্রবাহ' নামে পত্রিকা মহারাষ্ট্রে সংগীত সমাজে বিশেষ আদৃত হয়। এ ছাড়া ১৯১৮ এবং ১৯২২এর মধ্যে উনি পাঁচটি মিউজিক কন্‌ফারেন্‌সের আয়োজন করেন। ভাতখণ্ডেজীর প্রথম গ্র্যান্ড কন্‌ফারেন্‌স হয় বরোদায় ১৯২০তে। ম্যারিস কলেজের স্থাপন হয় ওঁর উদ্যোগে ১৯২৫-২৬-এ। অতএব দেখা যাচ্ছে একাধিক ব্যাপারে ভাতখণ্ডে বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্করের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

১৯১৭-১৮ সাল নাগাদ উনি গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের ব্যাপারে এত জড়িয়ে পড়েন যে ধীরে ধীরে ওঁর গানের আসর কমতে থাকে। এর কারণ শুধু এ নয় যে ওঁর রেয়াজ কমে গিয়েছিল, উনি তুলসীদাসের রামচরিতমানস পড়তে-পড়তে ক্রমশঃই প্রচণ্ড রামভক্ত হয়ে পড়েন এবং খেয়াল ছেড়ে ভজনই গাইতেন। ১৯২২ সাল থেকে উনি গেরুয়া ধারণ করেন। সম্ভবত এই সময়ে বা এর কিয়ৎকাল পূর্বে উনি কলকাতায় আসেন ও ভূপেন ঘোষের আতিথ্য গ্রহণ করেন, যে সময়ে ওঁর ভোরবেলায় ভৈঁরোর রেয়াজ শোনবার সুযোগ হয় ধূর্জটিপ্রসাদের। বাইরে ওঁর আসর ক্রমশ কমে যাওয়ার আর একটি কারণ ওঁর ফি ছিল নগদ ৫০০ টাকা, যখন বেশির ভাগ উস্তাদ এমনকি ওঁর গুরু বালকৃষ্ণবুয়া ইছলকরনজিকর গাইতেন পঞ্চাশ

ষাট টাকায়। এটা ওঁর অর্থলোলুপতার পরিচায়ক নয়, ওঁর রোজগারের বেশির ভাগটাই যেত গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের খাতে। এ ছাড়া উনি মনে করতেন গায়কের স্থান সমাজে ডাক্তার ব্যারিস্টারের সমতুল্য। জানি না ১৭-১৮ সালে উকিল ব্যারিস্টার বা কোনো ধন্বন্তরী চিকিৎসক পাঁচ পাঁচশ টাকা ফি পেতেন কিনা। একবার ওঁর পরিচিত এক সলিসিটর এসে ওঁকে বলেন, 'জানেন আল্লাদিয়া খাঁ সাহেব নাটক কোম্পানির মালিক শঙ্কররাও সরনায়েকের গাণ্ডা বাঁধতে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিল!' উত্তরে বিষ্ণুদিগম্বর বললেন 'আপনাদের সলিসিটর ফার্মে এল এল বি ডিগ্রি নিয়ে যারা কাজ শিখতে আসে তাদের কাছ থেকে আপনারা কত টাকা ডিপজিট নেন?' সলিসিটার ভদ্রলোক জানালেন পাঁচ হাজার টাকা। শুনে বিষ্ণুদিগম্বর পুনরায় প্রশ্ন করলেন 'আপনি সে বেচারি আর্টিক্‌লড ক্লার্কের ওপর কত সময় ব্যয় করেন? ঘণ্টা দু'তিন? মনে রাখবেন আল্লাদিয়া খাঁ সাহেবকে তার চেয়ে অনেক বেশি খাটতে হয়, অনেক বেশি সময় দিতে হয়, প্রথমে শিষ্যের গলা তৈরি করতে এবং তারপর বন্দিশ তোলাতে, রাগের রাস্তা দেখিয়ে গায়কির তালিম দিতে। খাঁ সাহেব একজন সলিসিটারের তুলনায় কিছু ফ্যালনা নন।'

আল্লাদিয়া খাঁর শঙ্কররাওর গাণ্ডা বাঁধার ঘটনাটা আসলে এই রকম ঘটেছিল। শঙ্কররাও সরনায়েকের ভাইপো নিবৃত্তিবুয়ার কাছে শোনা। স্টক এক্সচেঞ্জে বিরাট লোকসান খাওয়ার পর আল্লাদিয়া খাঁ সাহেবের অবস্থা শোচনীয় তখন। কোল্‌হাপুরে শঙ্কররাওয়ের এক ড্রামা পার্টি ছিল। বোম্বাইয়ে বড় বাড়ি ভাড়া করে তিনি নাটক কোম্পানির লোকজনের ভরণপোষণ করতেন। ভাইপো নিবৃত্তির তখন তেরো চোদ্দ বছর বয়স হবে, পড়াশুনোয় মন নেই, দিবারাত্র তবলা বাজায়। টাকাপয়সার অভাব নেই, কাকার ড্রামা পার্টির রোজগার মাসে পনেরো বিশ হাজার টাকা। সুযোগ বুঝে খাঁ সাহেব আড়াই হাজার টাকা নজরানা ও মাসে পাঁচশ টাকা দক্ষিণা চেয়ে বসলেন। শঙ্কররাও চিঠি বিলি করে শতখানেক শহরের গণ্যমান্য লোককে নেমন্তন্ন করে বসলেন, গাণ্ডা বাঁধা হবে সেই উপলক্ষ্যে। সকলের সামনে উস্তাদের পা ছুঁয়ে টাকার বাণ্ডিল রাখলেন মিঠাইয়ের থালাতে। খাঁ সাহেব টাকা গুনতে বসলেন—আড়াই তিন, চার, ছয়, গোনা আর শেষ হয় না—মোট দশ হাজার টাকা। 'ক্যা বাৎ হ্যায় শঙ্কররাও?' উত্তরে বিনীতভাবে রাওসাহেব বললেন 'শুনলাম উস্তাদের তক্‌লিফ যাচ্ছে, টাকার প্রয়োজন, তাই আপনার সেবায় সামান্য কিছু দক্ষিণার ব্যবস্থা করেছি। আশা করি আপনি আমার এ নজরানা কবুল করে আমায় কৃতার্থ করবেন।' গাণ্ডা তো বাঁধা হল, কিন্তু শঙ্কর রাও ব্যস্ত মানুষ, তাঁর শেখবার সময় কোথায়? ড্রামা পার্টির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আল্লাদিয়া খাঁ বেড়ান কিন্তু গাণ্ডাবন্ধ শাগীর্দ শেখেন না। শেষ কালে চোদ্দ বছরের নিবৃত্তিকে পাকড়াও করলেন খাঁ সাহেব, 'নে ব্যাটা, তুইই শেখ্, তোর কাকা যখন

বসবে না। আমি তোদের এহসানমন্দ্ হয়েছি, ঋণী হয়ে গেছি, সে ঋণ আমাকে শোধ করতে হবে।' এই হল নিবৃত্তিবুয়ার তালিমের প্রারম্ভের ইতিহাস। পরে উনি কিরানা ঘরানার রজব আলি খাঁ সাহেবের কাছে শেখেন। শেষোক্ত এই রঙিন ব্যক্তিটির খবর বিস্তারিত ভাবে 'কুদ্‌রত্ রঙ্গিবিরঙ্গী'তে পাওয়া যাবে।

এই রজব আলি খাঁ সাহেবকে একবার এক মামলার সম্মুখীন হতে হয়। কেনেডি ব্রিজের কাছে বাসা নিয়ে এক নামকরা তবায়েফ থাকতেন, তাঁর বোনঝির গাণ্ডা বাঁধেন রজব আলি খাঁ, পনেরশ টাকা নিয়ে। এর অব্যবহিত পরেই খাঁ সাহেব দেওয়াসের রাজার ডাকে বোম্বাই ছেড়ে চলে যান। কিছু কাল পরে ওঁর কাছে এক উকিলের চিঠি পৌঁছল, উনি মোটা ফি নিয়েছেন, অথচ গান শেখাচ্ছেন না, এই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। খাঁ সাহেবের দামী আতরের শখ ছিল, সন্ধ্যাবেলা পানাহারের খরচাও কম নয় কারণ ওঁর ভক্ত এবং দোস্ত ইয়ারদের সংখ্যাও প্রচুর, সে টাকা কবে হজম হয়ে গেছে। ওই মামলায় কিন্তু জিৎ হয় খাঁ সাহেবেরই, উকিলের আর্গুমেন্ট ছিল এই প্রকার। গাণ্ডা বন্ধনের টাকাটা ফি নয়, সেটি গুরুদক্ষিণা এবং শ্রদ্ধাসহকারে শাগীর্দ উস্তাদকে যে নজরানা দিয়েছে সে ফেরত চাওয়া যায় না, তার পরিবর্তে গুরুকে যে খেটে দিতে হবে তাও আইনে কোথাও বলে না। উকিলটি কে ছিলেন শুনলে পাঠক চমৎকৃত হবেন, তাঁর নাম বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে বি. এ. এল. এল. বি! মামলার ফলাফল শুনে বিষ্ণুদিগম্বর বিশেষ খুশি হয়ে দুজনকেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

বিষ্ণুদিগম্বরের শেষ জীবন কাটে ভজন কীর্তনে নাসিকে তাঁর নিজের 'রাম আধার' আশ্রমে। ওঁর প্রিয় ভজনগুলি ওঁর পুত্র ডি. ভি. পলুস্করের রেকর্ডে অনেকেই শুনেছিলেন যথা 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' 'ঠুমক চলত রামচন্দ্র' 'চলো মন গঙ্গাযমুনা তীর' ইত্যাদি। পুত্রের প্রারম্ভিক শিক্ষা পিতার কাছে হলেও আসল তালিম হয় পুনার গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ে বিনায়ক রাও পটবর্দ্ধনের হাতে। পুত্র বাপের পাল্লাদার সুরেলা আওয়াজ পাননি বটে কিন্তু ইনিও অসাধারণ সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন।

আনুমানিক ১৮৮৫-৮৬ সাল হবে। গোয়ালিয়র শহরে বছর তেরো চোদ্দর একটি সুশ্রী মারাঠি বালক ছেঁড়া কাপড় পরে দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়ায়, একাধিক ওস্তাদ পণ্ডিতদের হুঁকো ভরে এবং পা টেপে কিছু তালিমের আশায়। তখন গোয়ালিয়রে গন্ধর্বের মেলা, ঘরে ঘরে কালোয়াতি গানের চর্চা। কেউই এই কপর্দকশূন্য মারাঠি ছেলেটিকে শেখাতে রাজি নয়। শহরের বাইরে থেকে কোনো উস্তাদ এলে, আগ বাড়িয়ে ছেলেটি গিয়ে ফাইফরমাস খেটে দেয়। প্রতিটি আসরের এক কোণে বসে গান শোনে। লোকে হাসি ঠাট্টা করে। কেউ দয়া করে এক বেলা খেতে দেয়, কেউ অযাচিত উপদেশ দেয় দেশে ফিরে যেতে। তার ওপরে

বয়ঃসন্ধির কারণে গলা তার ভাঙা। মুসলমান গাইয়েরা তাকে দেখলেই বলে 'তুই এ দেশে এলি কেন ব্যাটা? তোর গলা নেই, সঙ্গতি নেই, গাইয়ে হবার কোন আশাই নেই, কেটে পড় এখান থেকে।' কিন্তু বালকটির জেদ প্রচণ্ড, অর্ধোলঙ্গ অবস্থায় আধপেটা খেয়ে সে গান শুনে শুনে বেড়ায় আর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গাইয়ে বাজিয়েদের ঘরের কাজ করে দেয়, প্রতিদানে ক্বচিৎ কদাচ ডাল রুটি ছাড়া কিছুই পায় না। বালগুরুজী নামে এক গায়ক তাকে ডেকে উপদেশ দিলেন 'তোর গান হবে না, তবে তোর চেহারা পত্তর ভাল, শহরে কির্লোস্কর নাটক কোম্পানি এসেছে, তুই তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর, কপালে থাকলে একটা ছোটখাটো ফিমেল পার্ট জুটে যাবে, দুবেলা পেট ভরে খেয়ে বাঁচবি।' উত্তরে ছেলেটি বলল 'এ শহরে অন্তত শ খানেক ছেলে গান শিখছে, তার মধ্যে বিশ তিরিশ জন বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ের শাগীর্দ, জেনে রাখবেন আমার নামই শেষ অবধি লোকে মনে রাখবে।' এরপর বালগুরুজী তাকে ম্যহ্‌ফিলে দেখলেই বলতেন 'এসো এসো এ যুগের তানসেন–তুমি সামনে গিয়ে বোস, তোমার ইজাজৎ নিয়ে উস্তাদ গান শুরু করবেন।' সে ছেলেও কম যায় না, বলত 'পেট থেকে পড়ে কেউ গাইয়ে হয় না, আপনিও হন নি, মিঞা তানসেনও নয়। তালিম আর মেহনতই গাওয়াইয়া বানায়। সুযোগ পেলে একদিন আমিও গাইব আর আসরে বসে আপনারা শুনবেন।

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত 'সংগীত কলা-প্রকাশ' নামক পুস্তকের প্রথম অধ্যায়টি রামকৃষ্ণবুয়া ভাজের (Vaze) সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী, তাতে উনি ওঁর কৈশোরের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। এই মানুষটিরই শেষ বয়সের একটি টেপ আমার কাছে আছে, গেয়েছেন মিঞা মলহার। অ্যানাউন্‌সমেন্টে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর তৎকালীন ডিরেকটর জেনারেল জেড্ এ বোখারি স্বয়ং বলছেন 'আমাদের পূর্বপ্রচারিত প্রোগ্রাম ক্যানসেল করা হল কারণ পণ্ডিত রামকৃষ্ণবুয়া ভাজে আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন, এঁর সঙ্গে সঙ্গৎ করছেন আরও দুই প্রসিদ্ধ কলাকার, তবলায় উস্তাদ আল্লারাখ্‌খা ও সারেঙ্গীতে উস্তাদ বুন্দু খাঁ।' দুর্ভাগ্যবশত ফৈয়াজ খাঁর রেডিও রেকর্ডিংএর মত এ একেবারেই শেষ বয়সের মরা হাজা গান, যাঁরা তাঁকে বয়সকালে শুনেছেন তাঁদের মতে এ গান সে তুলনায় টাকায় চার আনা। তবে ওঁর বৃদ্ধবয়সের অনেকগুলি ৭৮ আর.পি.এম-এর রেকর্ড আছে, সেগুলি অনেক সুশ্রাব্য এবং তানের ছকের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। এর একটি রেকর্ডে দ্রুত একতালে ভাটিয়ারের গান 'বল বল বল যাইহো' তারাপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের খুব পছন্দ ছিল এবং গানটি শোনার পর উনি প্রায়ই আসরে গাইতেন। এ ছাড়া বুয়াভাজের রেকর্ডে আছে ভৈরোঁ, বাহার, জৌনপুরি, তোড়ি, খাম্বাজ, বৃন্দাবনী সারঙ্গ, তিলং, খট, বারওয়া, নটবেহাগ, মারবা, মিঞা মলহার, তিলক কামোদ, কাফি কানাড়া ও খম্বাবতী। নজর করে শুনলে বোঝা যায় এঁর গানের আসল

কাঠামোটি গোয়ালিয়রের হলেও, তানের বৈচিত্র্য অনেক বেশি। এর কারণ যদিও উনি বড়ে নিসার হুসেন খাঁর শিষ্য, গোয়ালিয়রে যে কোনো উস্তাদ এলেই রামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে জুটে যেতেন, এবং আসরে আগ বাড়িয়ে এসে তানপুরো ধরতেন। বড়ে নিসার হুসেন খাঁর প্রতি ওঁর শ্রদ্ধা ভক্তি অবিচল ছিল, 'বসুন্ধরা' নামক মারাঠি সাপ্তাহিকে ১৯৩৩ সালে ওঁর যে আত্মচরিত বের হয় তাতে উঁনি লিখেছেন খাঁ সাহেব অত্যন্ত খামখেয়ালি মানুষ ছিলেন, মেজাজও অর্ধেক সময় ঠিক রাখতে পারতেন না, প্রায়ই রামকৃষ্ণকে বলতেন রেগে 'বেরিয়ে যা হারামজাদা আমার বাড়ি থেকে, চাল নেই চুলো নেই, আবার গান শেখবার শখ, আমি কি তোর বাপের চাকর নাকি?' উত্তরে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন 'আমি আপনার পায়ের তলা তখনই ছাড়ব যখন আমার তালিম সম্পূর্ণ হবে, তার আগে নয়।' ঘর ঝাঁট দেওয়া, ভারায় করে জল এনে দেওয়া, বাজার থেকে মাংস কিনে আনা, কোন কাজটা উনি করেননি? কিন্তু বড়ে নিসার হুসেন প্রথম চার বছরে মাত্র আটটি বন্দিশ রামকৃষ্ণকে শিখিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে খাঁ সাহেব যখন বহরমপুরে সর্দার দাদাসাহেব ভুস্‌কুটের আশ্রয়ে দু বছর কাটান, তখন দাদাসাহেবের কথায় বুয়াভাজেকে ভাল করে তালিম দেন এবং তিনশ সাড়ে তিনশ চীজ, গলায় তুলিয়ে দিয়েছিলেন। বন্দিশ জোগাড় করার শখ রামকৃষ্ণবুয়ার আজীবন ছিল। যে কোনো গাইয়ে বাজিয়ে এমনকি সারেঙ্গিয়া তবলা বাদকের কাছ থেকেও উনি নতুন 'চীজ্'-এর সন্ধান পেলে তার সঙ্গে বসে যেতেন। এ সব কারণে ওঁর গায়কিকে ঠিক নিছক গোয়ালিয়র বলা যায় না। পরবর্তীকালেও উনি এক আধজন নয় বহু উস্তাদদের হুঁকো ভরেছেন, তার মধ্যে নাম করা যায় হদ্দু খাঁ সাহেবের জামাই এবং মুশ্‌তাক হুসেন খাঁর গুরুশ্বশুর এনায়েৎ হুসেন খাঁ, রেওয়ার ওস্তাদ দিলাওয়ার খাঁ, লখনউ-এর বড়ে মুন্নে খাঁ, নেপালের সাদত্ আলি খাঁ, জয়পুরের মাহ্‌মুদ আলি, রায়গড়ের দৌলত খাঁ, এবং কাশীর চুন্নে খাঁর কাছে হোরি ও টপ্‌পা। এই জন্যই ওঁর গানকে মহারাষ্ট্রে চৌরঙ্গী গানা বলত। ওঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল একই রাগের ভিন্ন ভিন্ন তালে বন্দিশ শোনানো। ম্যহ্‌ফিলে রঙ্গ জমাবার ক্ষমতা ছিল ওঁর অসাধারণ। একই ম্যহ্‌ফিলে শঙ্কর পণ্ডিত, মিঞা জান এবং ভাস্কর বুয়ার সঙ্গে বসে উনি আসর জমিয়েছেন এরকম ঘটনাও আছে। পরিচিত রাগ উনি খুবই ভাল গাইতেন, তবে অছোপ রাগের ওপরও দখল ওঁর কম ছিল না, যথা পঞ্চকল্যাণ, গৌড়ী, মধ্যমাবতী, মাঝ, গারা-বাগেশ্রী, পরজবাহার, মঞ্জরি, ভৈরোঁ বাহার, তীর্বন গারাকানাড়া, খট, খোকর, বাগেশ্রী কানাড়া, বাসন্তী কেদার, ও ঢক্কা (মূলতানী ঘেঁষা রাগ)।

বড়ে নিসার হুসেন খাঁর আর এক নামকরা শিষ্য কৃষ্ণরাও শঙ্কর পণ্ডিতের বাবা শঙ্কর পণ্ডিত যিনি রাজা ভইয়া পুছওয়ালেকে শিখিয়েছিলেন। কৃষ্ণরাওয়ের

গান শুনে রামকৃষ্ণবুয়া ভাজে বলেছিলেন 'এতো শঙ্কর কাকার গায়কি নয়, তোমার বাবার গায়কি রপ্ত করেছে রাজা ভইয়া।' আমি বাল্যকালে রামকৃষ্ণবুয়া ভাজে এবং রাজা ভইয়া পুছওয়ালে দুজনেরই গান শুনেছি। রাজা ভইয়ার গলা ছিল ঘষা তামার পয়সার মত, গলায় ভারী ভারী গোয়ালিয়রি তান ছিল এবং একটি দ্রুত সপাট তান, কিন্তু বর্তমানকালের আমার প্রিয় গায়ক উল্লাস কশলকরকে আমি বলেছিলাম যে হাম্বীর, শঙ্করা ও ছায়ানট তোমার এত সুর ও তানের ফান্দা সত্ত্বেও রাজা ভইয়ার ঐ তিনটি রাগের স্মৃতির পাশে ম্লান হয়ে যায়। শুধু আস্থায়ী অন্তরা শুনলে মনে হত যেন হাতি চলছে। রাজাভইয়ার দাদাগুরু ও রামকৃষ্ণবুয়া ভাজের উস্তাদ একই লোক, সেই বড়ে নিসার হুসেন খাঁ, কিন্তু দুজনের গায়কির মধ্যে অনেক তফাত ছিল। তান ছাড়াও স্বরসমূহ নিয়ে অলংকরণ করার ক্ষমতা রামকৃষ্ণবুয়ার অসাধারণ ছিল। তানে বৈচিত্র্য থাকলেও, স্পীড বেশি ছিল না কিন্তু জোরকস ছিল এবং প্রত্যেকটি দানা স্পষ্ট। তানের মধ্যে ওঁর জাব্‌ড়া তান, মুখবন্ধী ও মঠ্‌ঠি তান বিখ্যাত ছিল। মলহার ওঁর বিশেষ প্রিয় এবং সকলেই বলত বিশেষ করে মন্‌জি খাঁ, মলহারের প্রকার শুনতে হয় তো একমাত্র রামকৃষ্ণবুয়া ভাজের কাছে।

রামকৃষ্ণবুয়া ভাজের বোকা কথা ও ছেলেমানুষীর অনেক গল্প আছে। ১৯১৮ সালে গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ে বিষ্ণুদিগম্বরের উদ্যোগে প্রথম মিউজিক কন্‌ফারেন্‌স হয় বোম্বাইয়ে। তখনকার কালের সেরা গায়ক উস্তাদ হদ্দু খাঁর পুত্র রহমৎ খাঁর গান শুনে সবাই অভিভূত। পরের দিন সকালে রামকৃষ্ণবুয়ার গান। তানপুরো যারা বাঁধবে অর্থাৎ গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের ছেলেরা বুয়াকে জিজ্ঞেস করল, কোন পিচে উনি গাইবেন। রামকৃষ্ণবুয়া একটু ভেবে প্রশ্ন করলেন 'কাল রহমৎ খাঁ কোন পিচে গেয়েছিলেন?' উদ্যোক্তারা জানালেন তিসরা কালা অর্থাৎ এফ্ শার্প। রামকৃষ্ণবুয়ার উত্তর 'ঠিক হ্যায়, আরও এক পরদা চড়িয়ে পাঁচওয়া সফেদমে তানপুরা বাঁধো।' এই বলে উনি ধরলেন তোড়িতে 'যা যা রে'—বড় খেয়াল। সকালে এমনিতেই গাইয়েদের গলা চড়ে না। আর উনি গাইছেন 'এফ্ শার্পে'রও ওপরে 'জি'তে। কোনোরকমে কষ্টেসৃষ্টে তার সপ্তকের সা-তে দাঁড়াতে পারছেন, ফলে ওঁর সে আসরের বারোটা বেজে গেল অবিলম্বে।

দেওধর সাহেবের স্কুলে ১৯২৭ সালে রামকৃষ্ণবুয়ার গান সন্ধ্যায় রাখা হয়। সকালে রামকৃষ্ণবুয়া আসেন স্কুল পরিদর্শন করতে। ছেলেমেয়েরা কিছু কিছু গান শোনাবার পর দেওধর সাহেব ছাত্রছাত্রীদের দুচার কথা বলবার জন্য ওঁকে অনুরোধ করলেন। দাঁড়িয়ে উঠে রামকৃষ্ণ বললেন, 'দেখ বাছারা, আমি নিতান্তই সাদামাঠা মানুষ, আমি বক্তৃতা করতে পারি না, আমার ভাল জামা-কাপড় পরার অভ্যাসও নেই। আমার একটা কোট আছে, মাঝে মাঝে পরি, দেওধর সাহেব

আপনি কোনো দিন আমার বাড়িতে আসুন, কোটটা আপনাকে দেখাব, দেখবেন কি দারুণ কাপড়টা। তা সে যাই হোক, ভাল কাপড়চোপড় পরলেই কি গান ভাল গাওয়া যায়? তোমরা কি বল?' তারা আর কী বলবে, মেয়েগুলো মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসছে, আর ছেলেরা তো প্রায় গড়াগড়ি খাবার যোগাড়। আর একবার বেলগমে কোরগাওকর নামে এক নাম করা হার্মোনিয়াম বাজিয়ে এবং গায়ক একটি হার্মোনিয়ামের ও গানের স্কুল খোলেন। প্রধান অতিথি রামকৃষ্ণবুয়া ভাজে উদ্বোধনের পর উনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন 'বন্ধুগণ, আপনাদের জন্য আজ এইখানে হার্মোনিয়ামের একটি ক্লাস খোলা হলো। এই যন্ত্রের নাম হার্মোনিয়াম, এ যন্ত্রটি মাউথ অর্গ্যানেরই মত, একে আমি বলি 'ব্যান্ড বাজা'। যারা আজ থেকে ব্যান্ড বাজা শিখতে চায়, তারা নিজের খুশিমত শিখতে পারে।'

মারাঠি নাট্যসংগীতের চেহারা পালটে দেন পণ্ডিত ভাস্করবুয়া বাখ্‌লে ও রামকৃষ্ণবুয়া ভাজে। এঁরাই উচ্চাঙ্গ সংগীতের ভাল ভাল বন্দিশে মারাঠি কথা দিয়ে স্টেজে গান করিয়েছিলেন, যে কারণে ভাস্করবুয়ার প্রধান শিষ্য বালগন্ধর্বর নাম হয় সেখানে। লতার বাবা দীননাথ মঙ্গেশকরও ভাস্করবুয়া ও রামকৃষ্ণবুয়ার রচিত নাট্যসংগীত গেয়ে নাম করেছিলেন। রামকৃষ্ণবুয়ার অনেক গাণ্ডাবন্ধ শাকরেদ ছিল, যথা কেশবরাও ভোঁসলে, বাপুরাও পেন্ধরকর মাস্টার দীননাথ, গুরুরাও দেশপাণ্ডে, ভি. এ. কগলকর, এবং বিনায়করাও পটবর্দ্ধন। এমন কি কেসরবাইও গোড়ার দিকে কিছুদিন ওঁর কাছে তালিম পান। মেজাজ ভাল থাকলে উনি ওঁর বিরাট সংগ্রহ থেকে বন্দিশ দেওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করতেন না, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই উনি উপুড় হস্ত হতেন না। দুজনমাত্র শিষ্যর ওঁর কাছ থেকে অকাতরে শিক্ষা ও তালিম পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। একজন ওঁর পুত্র শিবরামবুয়া ভাজে এবং অন্যজন হরিভাউ ঘঙ্গড়েকর। এঁরা আমার বাল্যকালে নিয়মিত বোম্বাই রেডিও স্টেশন থেকে গাইতেন। রামকৃষ্ণবুয়ার ডায়বিটিস ছিল, তবে মিষ্টির থালা কখনও ওঁর কাছ থেকে ফিরে যেত না। ১৯৪৫ সালের ৫ মে ওঁর মৃত্যু হয়, তার বছর দুএক আগে থেকে উনি গান বন্ধ করে দিয়েছিলেন, রেডিওতে গাইতেন না। নিবৃত্তিবুয়া সরনায়েক বলতেন দুজন গায়ককে উনি শুনেছেন যাঁরা সুরে মজে যেতেন গান করার সময়ে, একজন আবদুল করিম খাঁ, দ্বিতীয় জন রামকৃষ্ণবুয়া ভাজে।

পরিশেষে মনে করিয়ে দিই মারাঠিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গায়ক অবশ্যই ভাস্করবুয়া বাখ্‌লে। আমার এক ফোটোগ্রাফি ও সংগীতজগতের বন্ধু ভাইডু সান্যাল বোম্বাইয়ে থাকাকালীন ফৈয়াজ খাঁর কাছে যেতেন। উনি, শুনেছি বলতেন হিন্দুদের মধ্যে এত বড় গায়ক হয়নি। আবদুল করিম খাঁ বলতেন হদ্দু হস্‌সু খাঁর সময়

থেকে ভাস্করবুয়ার সমতুল্য গায়ক গিনে চুনে অর্থাৎ হাতে গোনা যায়। দিলীপচন্দ্র বেদী প্রথমে ওঁর কাছে এবং পরে ফৈয়াজ খাঁর কাছে তালিম নেন। ওঁর মতে ওঁর সময়কার এঁরাই দুজন শ্রেষ্ঠ গায়ক।

ভাস্করবুয়া সম্পর্কে অন্যত্র আমি অনেক লিখেছি। দুর্ভাগ্যবশত এঁর কোনো রেকর্ড নেই যদিও উনি ১৯২২ সালে দেহ রাখেন, তখন গ্র্যামোফোন কোম্পানির দৌলতে ছোট বড় অনেক গাইয়ে বাজিয়ের রেকর্ডই বেরিয়ে গিয়েছে। শোনা যায় ১৯১৬ সালে ওঁকে গ্র্যামোফোন কোম্পানি রাজি করিয়েছিল কিন্তু যে কারণেই হোক নির্ধারিত দিনে উনি রেকর্ডিংয়ে যাননি। বুয়া কলকাতায় কখনও আসেননি। এঁর দুর্দান্ত নাম হয়েছিল মহারাষ্ট্রে ও পাঞ্জাবে। বিষ্ণুদিগম্বরের সুপারিশে উনি প্রথম পাঞ্জাব যান ১৯০৪ সালে হরবল্লভ সংগীত সম্মিলনীতে মাত্র ৩০০ টাকা ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া নিয়ে। ২৬ ডিসেম্বরের সকালে উনি গেয়েছিলেন ঝাঁপতালে 'নিরঞ্জন কীজে' দেশি তোড়িতে এবং রাত্রে রাগ শঙ্করায় প্রাচীন ধ্রুপদ ভাঙা খেয়াল 'দিনিভর ডর নিবারে হো শাহে জাহাঙ্গীর বলবীর রাজারাম।' সারেঙ্গিতে ছিলেন প্রবীণ ঝাণ্ডে খাঁ যিনি আলিয়া ফত্তু, আল্লাদিয়া মেহরবান, ভাই মোতি ইত্যাদিদের সঙ্গে আজীবন সঙ্গত করেছেন। ভাস্করবুয়ার গান শেষ হতে ঝাণ্ডে খাঁ ওঁর পায়ের ওপর সারেঙ্গি রেখে কুর্তার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'আমার দীর্ঘ ৩৬ বছরের সঙ্গতের অভিজ্ঞতায় এ রকম গান শুনিনি।' উস্তাদ বুটে খাঁ সর্বসমক্ষে বললেন 'ভাস্করবুয়াকা যৈসে সব হী অঙ্গকা গানেবালা সও বরসমে ভি নহী পৈদা হোগা।' উদ্যোক্তারা হাত জোড় করে সবচেয়ে বেশি পরিতোষিক ১০০১ টাকা ওঁকে দিলেন এবং এর পরের সতেরো বছর ওঁকে ছাড়া কোনও কন্‌ফারেন্স হয়নি জলন্ধরে বা লাহোরে। হরবল্লভের তরফ থেকে ওঁকে আড়াই ভরির একটি স্বর্ণপদক সহ 'দেবগন্ধর্ব' উপাধি দেওয়া হয়। সেখানে স্টেজের ওপর বিষ্ণুদিগম্বরও উপস্থিত ছিলেন, বুয়া কিছুতেই সে স্বর্ণপদক নেননি। নিজে হাতে বিষ্ণুদিগম্বরকে তুলে দিয়েছিলেন। সাতাত্তর বছর বয়সে লাহোরের উস্তাদ আলি বখ্‌শ খাঁ ভাস্করবুয়ার গান শুনে পাতিয়ালার মহারাজার সামনে বলেছিলেন 'হুজুর, লোকে বলে বখ্‌স খাঁ বড় অহংকারী, কারও প্রশংসা করে না। সত্যি কথা কি উত্তর ভারতের অনেক উস্তাদকেই তো শুনলাম, কাউকে শুনে মনে হয়নি যে খেয়াল গায়কি হিন্দুস্তানে জিন্দা আছে। আল্লার অশেষ কৃপা এই পনডত এখনও খেয়ালকে বাঁচিয়ে রেখেছে।' অমৃতসর ও জলন্ধরে মুসলমান শ্রোতাদের ফরমাসে উনি গাইতেন 'হজরত খ্বাজা সঙ্গ খেলিয়ে ধামার'—গান শেষ হলে তারা স্তূপাকার ফুল বুয়ার পায়ের ওপর রেখে হাঁটু ধরে কদম বোসি করত। আবার হিন্দুদের অনুরোধে 'গোপাল মেরি করুণা' শেষ হলে তারা উঠে এসে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করত। তখনকার দিনে জলসায় ভদ্রপরিবারের স্ত্রীলোকদের যাওয়ার প্রশ্ন উঠত না, বিশেষ করে

মুসলমান পরিবারের। বিখ্যাত পাখোয়াজি মিএগ্রা মলঙ্গ খাঁর স্ত্রী দসোঙ্গা এবং তাঁর সহেলিরা পাগড়ি বেঁধে কম্বল ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে ভাস্করবুয়ার গান শুনতে যেতেন। গান শেষ হবার পর দসোঙ্গা বিবি বুয়াকে জোড় হস্তে নমস্কার করে বলেছিলেন 'আপনি সাধারণ মানুষ নন, আপনি পীর। আমার বাড়িতে একদিন পায়ের ধুলো দেবেন, আমাদের পরিবারের কল্যাণ হবে।'

মাত্র তিপ্পান্ন বছর বয়সে ১৯২২ সালে লিউকিমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ভাস্করবুয়ার স্বর্গলাভ হয়। ওঁর শিষ্যদের মধ্যে মাস্টার কৃষ্ণ ওঁর গায়কির ছিটেফোঁটা গাইতে পারতেন এবং তাঁর রেকর্ডও কর্তার আমলে শুনেছি। সব শিষ্যদেরই নাড়া উনি নিজে বাঁধেন নি, বাঁধিয়েছিলেন উনি ওঁর গুরু নথ্‌থন খাঁ সাহেবের বা তাঁর পুত্রের কাছে। এঁদের মধ্যে কিছু বিখ্যাত নাম আছে, যথা গোবিন্দরাও টেম্বে, (গায়ক, বিখ্যাত হার্মোনিয়ামে বাজিয়ে এবং অভিনেতা) নানাসাহেব যোগলেকর এবং বালগন্ধর্ব। শেষোক্ত শিষ্য মারাঠি নাট্যসংগীতের জগতের মহারাজা, শাহেনশাহ্‌। উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ যখনই বোম্বাই আসতেন বরোদা থেকে, সন্ধ্যাবেলা নাটক দেখতে যেতেন বালগন্ধর্বকে শোনার জন্য। খাঁ সাহেবের জন্য সামনে সোফা লাগান হত। বেশির ভাগ গানই বালগন্ধর্বর গুরু ভাস্করবুয়ার রচনা বিভিন্ন রাগে। আস্ত একটি নতুন বাড়ি করে দিয়ে যতদিন বেঁচেছিলেন বুয়া ওঁর রোজগারের বৃহদংশ তুলে দিতেন গুরুপত্নীর হাতে। ওঁর সততা ও গুরুভক্তির গল্পকথা শুনলে মনে হয় বোধোদয় কথামালা পড়ছি। আরও মনে হয়—আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালবাসা ভিন্ন গুরুশিষ্য পরম্পরা কায়েম থাকতে পারে না। এই লেনদেনের বাজারে তা প্রত্যাশা করা অন্যায়, ভবিষ্যতে থাকবেও না।

পরিশিষ্ট

বিয়োগপঞ্জী : গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী

গিরিজা চক্রবর্তীর মৃত্যু-সংবাদ জনকয়েক বাঙালীর কাছে পৌঁছেছে, কিন্তু কোনো সম্পাদকীয় মন্তব্য নজরে পড়ল না। তাঁর মৃত্যুতে দেশের, বিশেষত বাংলার, ক্ষতি হল, কারণ তিনি ছিলেন সুগায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ, উচ্চ সঙ্গীতের প্রতিভূ, এবং একাধারে ভারতীয় ঐতিহ্যের জীবনশক্তি ও বাংলার পরীক্ষাশীলতার জ্বলন্ত প্রমাণ। নতুন ভারতের কৃষ্টির সৃষ্টিতত্ত্ব ও পতনোন্মুখ বাংলার উত্থানমন্ত্র হিসাবে এই ঘটনাকে না দেখে আমরা কর্তব্যহীনতার পরিচয় দিলাম। কিন্তু দেশ থেকে মূল্যজ্ঞান এখনও লুপ্ত হয়নি ভেবে গিরিজাবাবুর কৃতিত্ব সম্বন্ধে যৎসামান্য লিখছি। তাঁর বিষয়ে বলবার অধিকার আমার অপেক্ষা অন্যের বেশি আছে, যেমন ডাঃ অমিয় সান্যালের, কিন্তু তাঁরা যখন এখনও নীরব তখন আমাকেই এই নিতান্ত অসম্যক প্রবন্ধ লিখতে হল।

গিরিজাবাবু বহরমপুরের বড়ো ঘরের ছেলে। অল্পবয়সে তিনি সঙ্গীতে আকৃষ্ট হন। তখন রাধিকা গোস্বামী আদি-ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর দরবারে থেকে একটি উচ্চ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান চালাচ্ছেন। গিরিজাবাবু গোঁসাইজীর শিষ্য হলেন। প্রত্যহ তালিম নিতেন, এবং প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রেওয়াজ করতেন ধ্রুপদ-ধামার। এই শিক্ষার্থী অবস্থায় আমি তার প্রথম গান শুনি। যাঁরা ইদানীংকার গিরিজাবাবুর গায়নের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা হয়ত ভাবতে পারবেন না যে তাঁর কণ্ঠ কি অদ্ভুত শক্তিশালী ছিল। ধ্রুপদ শিক্ষার ফলই তাই। তানপুরার অবলম্বন, ধ্রুপদের অলঙ্কারবিহীন ঋজু ও দৃঢ় স্বরাশ্রয় ও সুরপ্রকরণ, তার শুদ্ধতা ও গাম্ভীর্য কণ্ঠস্বরের স্বরাজ স্থাপন করে। গোঁসাইজীর শান্ত ঘন স্বর আর গিরিজা বাবুর সাবলীল সুগম্ভীর কণ্ঠক্ষেপ মৃদঙ্গের গর্জন ছাপিয়ে উঠেছিল। রাগও ছিল কেদারা। ছয় বৎসর গিরিজাবাবু ধ্রুপদ শিক্ষা করলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদিয়ার কাছে।

তার পর গিরিজাবাবু কলকাতা চলে এলেন। আসাটা হঠাৎ হলেও তার মানসিক

ইতিহাস ছিল দীর্ঘ। ধ্রুপদ-ধামারে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন যে ধ্রুপদী সংযম ও সংহতি তাঁর কল্পনার প্রতিকূল। ধ্রুপদের স্মার্ত বিধান তাঁর আধুনিক মনের শ্বাসরোধ করল। তিনি স্থির করলেন যে বাঁধা-ধরা নিয়মের শিকল না ভাঙলে তাঁর প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব। এই রোম্যান্টিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব সেই যুগের একমাত্র বিদ্রোহ-পতাকা ছিল ; অন্য কোনো উপায়ে মানুষ তখন নিজের নিজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারত না। ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে, সর্বক্ষেত্রেই দেখি তাই। অতএব তাঁর ধ্রুপদ পরিত্যাগকে ধর্মচ্যুতি বলে কোনো লাভ নেই, যেটা তখন তাঁর সম্বন্ধে বলা হত। কিন্তু তখনও তিনি ঠিক করতে পারেন নি ত্যাগ ও ভাঙনের পর কি গ্রহণ ও সৃষ্টি করবেন। ব্যাপারটি নাটকীয় হয়ে উঠল যেদিন গিরিজাবাবু প্রথম মৈজুদ্দিন খাঁর ঠুংরী শুনলেন। আর তাঁর দ্বিধা রইল না।

সে আজ পঁয়ত্রিশ বৎসরেরও আগের কথা। তখন সামন্ত রাজ্যগুলি নির্জীব হয়েছে ; সেখানকার সভাগায়করা শহর মুখে ছুটেছেন ; শহরে নতুন ধনী ও চিরস্থায়ী জমিদার তাঁদের পোষণ করছেন, কদর দিচ্ছেন। তখন ধ্রুপদের আসরে দশ-লাখী কলকাতায় হাজার দু' হাজার শ্রোতা জমে, সঙ্গীত-সমাজের সামনে একশো জুড়িগাড়ি রাস্তা জুড়ে থাকে। কিন্তু তখনই সমাজ ও রুচির অন্তরে একটা ফাটল ধরেছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় সমসাময়িক রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রূপান্তরে, থিয়েটারের ও যাত্রার গায়ন পদ্ধতিতে, এবং গিরিজাবাবুর অনুরাগ পরিবর্তনে। বাঙালীরা তখনও ভালো খেয়াল শোনে নি। আলি বক্স্, শ্রীজান ও গহর জান বড় খেয়ালিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু ক'জনই বা তাঁদের গান শুনতে পেতেন। এই সময় গণপৎ রাও গোয়ালিয়র থেকে কলকাতায় এলেন, সঙ্গে আনলেন এক অখ্যাত যুবককে। এই সুদর্শন, অশিক্ষিত প্রতিভার নাম মৈজুদ্দিন খাঁ। এঁদের আসর জমত দুনিচাঁদের বাগানে ও হ্যারিসন রোডের ওপর ওভারটুন হলের প্রায় সামনা-সামনি একটা তেতলা বাড়িতে। সেখানে থাকতেন শ্যামলাল ক্ষেত্রী, আর আসতেন বহু মাড়োয়ারী, যেমন রাজাবাবু (বর্মণ), তিনুবাবু, দুনিবাবু, আর বাঙালীদের মধ্যে গিরিজাবাবু, অমিয় সান্যাল প্রভৃতিরা। বহু গণ্যমান্য বাঙালী ঘরওয়ানার সঙ্গে এঁদের বন্ধুত্ব ছিল বটে, কিন্তু তাঁরা পদধূলি দিতেন না। এবং যাঁরা দিতেন তাঁরা সাধারণত হতচ্ছাড়ার দল, যাদের পেশা ছিল গান শুনে বেড়ানো ও লুকিয়ে লুকিয়ে গান-বাজনা শেখা। এই আড্ডায় গিরিজাবাবুকে আবার দেখলাম। গণপৎ রাও বাজাচ্ছেন হার্মনিয়ম, মৈজুদ্দিন গাইছেন ঠুংরি, আর গিরিজাবাবু তাঁর সমস্ত অঙ্গ দিয়ে সেই অদ্ভুত গান গিলছেন। এই কেন্দ্রটি থেকে আধুনিক লচাও ঠুংরি উৎপন্ন হয়। তার ভাববিকাশ, তার তান-কর্তব, তার মেজাজ লক্ষ্ণৌ ও বেনারসের পূরবী ঠুংরি থেকে ভিন্ন। গহর জান কলকাতায়, এবং লক্ষ্ণৌএ চৌধুরাণী ভগ্নীদ্বয় যখন

এই পদ্ধতি গ্রহণ করলেন তখন ভাবের বন্ধন গেল খুলে। গিরিজাবাবু এই বন্যায় গা ভাসালেন। সত্যই গা ভাসানো, কারণ হঠাৎ একদিন বাড়ির কাউকে না বলে ক'য়ে ছুটতে ছুটতে হাওড়া স্টেশনে এসে তিনি রামপুর-বেরিলির গাড়ি ধরলেন। গণপৎ রাও—তিনি সিন্ধিয়ার ভাই—একটি দল নিয়ে সঙ্গীতের তীর্থযাত্রা করছিলেন, গিরিজাবাবু হলেন তাঁদের সঙ্গী।

এবার সুরু হোলো বড়ো গাইয়ের গান শোনা ও বিশেষ করে খেয়াল শিক্ষা। তখনও ছম্মন সাহেব, এনায়েৎ খাঁ, মজফ্‌ফর খাঁ জীবিত। গণপৎ রাও-এর খাতিরে তাঁরা সাদরে গিরিজাবাবুকে পাক্কা গান শেখান। এঁদের খেয়াল ধ্রুপদাঙ্গের, তাতে গিরিজাবাবুর সুবিধাই হল। পূর্ব শিক্ষার কৃপায় তিনি অতি সহজে পাঁচ ছ'শ খেয়াল গান শিখলেন ও স্বরলিপি টুকে নিলেন। বছর দুই তিন পরে যখন গিরিজাবাবু দেশে ফেরেন তখন তিনি উঠতি খেয়ালিয়া। কিন্তু এই ব্যুৎপত্তিও তিনি ত্যাগ করলেন। কারণ কি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন বাঙালী খেয়াল কেয়ার করে না। আমার মনে হয় তা ছাড়া অন্য কারণ ছিল। মৈজুদ্দিনের প্রভাব তাঁর অন্তরে প্রবেশ করেছিল ; কেবল মৈজুদ্দিন নয়, তাঁর শিষ্য মল্‌কা জানেরও। ইতিমধ্যে তিনি বাদল খাঁর কাছে ছোট খেয়ালের তালিম নিতে আরম্ভ করেছেন। এই বৃদ্ধ, ভূতপূর্ব সারেঙ্গী-বাদক বাদল খাঁ-ও গণপৎ রাও ও শ্যামলাল বাবুর আবিষ্কার। তাঁর কাছে বহু অতি-সুমিষ্ট বন্দেশী ছোট খেয়াল গান ছিল। ক্রমে সেগুলিই হল গিরিজাবাবুর প্রধান অবলম্বন। নিতান্ত কম লোকে গিরিজাবাবুর মুখে রামপুরী ধামার ধ্রুপদ কি খেয়াল গান শুনেছেন। তিনি বাদল খাঁনী খেয়ালই গাইতেন লোকে জানে। কিন্তু সেই রাধিকাবাবুর ধ্রুপদ ও ধ্রুপদাঙ্গের রামপুরী খেয়ালই ছিল তাঁর ভিত্তি ও ভূমিকা এবং ঠিক এই কারণেই তাঁর ঠুংরী অত রসালো। কেবল ঠুংরী নয়, বাংলা গানও। যিনি তাঁর মুখে 'আর তো যাব না সই যমুনার জলে, ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়ন-সলিলে' শুনেছেন তিনিই আমার কথায় সায় দেবেন। যেমন ভীমপলশ্রীর অপূর্ব রাগচ্ছটা, তেমনই ঐ রাগের করুণার সঙ্গে ভাষার মিলন! শুনতে শুনতে এক এক সময় মনে হত যেন গিরিজাবাবুর বাঙালীত্ব তাঁর অর্জিত সমস্ত হিন্দুস্থানী গায়ন-পদ্ধতিকে ধুয়ে মুছে দিল। একটু ভাবলেই বুঝতাম ঐ অর্জিত শিক্ষা না থাকলে গানটি যাত্রার 'ভীমপলাশ'ই হত।

তবু সন্দেহ হয় যে গিরিজাবাবুর ধর্ম, অর্থাৎ প্রধান গুণ ছিল মেজাজ, ওস্তাদী রাগবিস্তার নয়। তিনি বিস্তার ভালোই জানতেন, কিন্তু রাগের চেয়ে গানটিকে বেশি শ্রদ্ধা করতেন বলে তিনি গানের রসকেই ফুটিয়ে তুলতেন। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এই বিশেষের প্রতি শ্রদ্ধা একটি যুগের নিদর্শন। ধ্রুপদের দিক থেকে তাঁর পদ্ধতিকে অধোগতি বলা যায় বটে, কিন্তু সঙ্গীতের ইতিহাসে এই গতিটা অবশ্যম্ভাবী, এবং তাই তার একটি বড় রকমের মূল্য আছে। সেই মূল্যের সঙ্গে সাঙ্গীতিক মূল্য

চমৎকার জুড়ে যেত বলেই গিরিজাবাবুর গান আমাদের চিত্ত হরণ করতে পেরেছিল।

আজ দেশে তাঁর বিস্তর শিষ্য। তিনি শেষ কয়েক বৎসর ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য আসরে গাইতেন না। কয়েক বৎসর আগে একটি বড়ো আসরে আমি তাঁকে ছম্মন সাহেবের ধামার ও খেয়াল গাইতে অনুরোধ করি। অনুরোধ জানাই সকালে, সন্ধ্যায় আসর বসবে, আর থাকবেন সেখানে বহু গুণী। তিনি পুরোনো খাতা খুলে মালিগৌরা ও পূরবা (পূরবী নয়) তৈরি করেছিলেন সারা দিন ধরে। সন্ধ্যায় গাইবার আগে তাঁর নাক দিয়ে ভীষণ রক্তপাত হতে আরম্ভ হল। আমি হাত জোড় করে বললাম, 'গাইবেন না'। তিনি বিরত হলেন না, বললেন, 'ভাই, তুমি বড়ো ভালো গান শুনতে চেয়েছ। বড়ো বেশি কেউ চায় না, আমাকে গাইতেই হবে, মরি আর বাঁচি।' গাইলেন বটে, কিন্তু মাত্র কাঠামোটি। জমল না। বললাম, চমৎকার হয়েছে। তাঁর উত্তর মনে আছে, 'কিছুই হল না জানি, তবু...।' এই বলে তাঁর বড় বড় চোখ জলে ভরে গেল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ল মনে।

গিরিজাবাবুর যুগ গত। নতুন যুগ তবু কৈ? যতদিন না আসে ততদিন একজন শ্রোতা অন্তত তাঁর 'মেজাজের' স্মৃতি বহন করবে। খানদানী হয়ে খানদান থেকে বেরিয়ে আসা, এবং বেরিয়ে এসে অর্জিত জ্ঞান ও সহজাত কল্পনার জোরে আপন গোষ্ঠী স্থাপনা করার মধ্যে অসাধারণ গুণপনা, সাহস ও আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনের সুচারু কলা-বিকাশ, এ অসাধারণত্বের সুন্দরতম নিদর্শনই হোলো 'মেজাজ,' গিরিজাবাবুর গানের মেজাজ।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

['পরিচয়' পত্রিকার ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের 'বৈশাখ-আষাঢ়'-সংখ্যার 'সংস্কৃতি সংবাদ' বিভাগে শোকসংবাদ উপলক্ষে প্রকাশিত লেখাটি হুবহু পুনর্মুদ্রিত হল—প্রাসঙ্গিকতাবোধে।]